শায়খ আবদুল মালিক মুজাহিদ

মুসলিম ইতিহাসের সোনালী বিচার



মুসলিম ইতিহাসের সোনালী বিচার | শায়খ আবদুল মালিক মুজাহিদ

হুদহুদ প্রকাশন

أَلْقَضَايَا أَلذَّهَبِيَّةُ

باللغة البنغالية

'মুসলিম ইতিহাসের সোনালী বিচার' শিরোনামে আমাদের আলোচ্য বইটিতে নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম], সাহাবায়ে কিরাম, প্রসিদ্ধ মুসলমান শাসকবর্গ ও কাজিদের সে-সব ফয়সালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা দুনিয়ায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সোনালি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেগুলো দ্বারা পরবর্তীতে আগত শাসক ও বিচারকগণ মূল্যবান পথ-নির্দেশনা পেয়েছেন।

এসব ঘটনাবলি এজন্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এতে ইসলামি সমাজে আবারও সততা প্রতিষ্ঠা হবে। আর যেসব ইসলামি রাষ্ট্রে লুটতরাজ ও জুলুম-অত্যাচারের মহামারি যেভাবে দেখা দিয়েছে, তা থেকে জাতি মুক্তি পাবে, এবং ইসলামের বরকত দ্বারা যথাযথভাবে উপকৃত হওয়া যাবে।

এই বইটিতে বর্ণনাসূত্রে সত্যায়িত ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ঘটনাবলি সংকলন করা হয়েছে। সাবলীল ভাষায় কথোপকথনের ভঙ্গিমায় উপস্থাপনের কারণে বর্ণিত ঘটনাগুলো পাঠকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে। বেশিরভাগ ঘটনাই নেওয়া হয়েছে নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম], খুলাফায়ে ইসলাম ও মহান শাসকগণের। সূত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

978-984-90511-4-9

হুদহুদ প্রকাশন
বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

design : print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389

মুসলিম ইতিহাসের
সোনালী বিচার

মূল

শায়খ আবদুল মালেক মুজাহিদ
পরিচালক, দারুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর

মাওলানা মাকসুদ আহমাদ
শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া রাজফুলবাড়িয়া
সাভার, ঢাকা

মুসলিম ইতিহাসের

সোনালী বিচার

মূল
শায়খ আবদুল মালেক মুজাহিদ
পরিচালক, দারুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মাওলানা মাকসুদ আহমাদ

প্রকাশনা
৫৬ [ছাপ্পান্ন]

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫
০২৯৫৩৩০৬৯

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৪৫০ টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচি

লেখকের কথা

ইসলাম হল মানুষের স্বভাবধর্ম। যে-সব মৌলিক নিয়মনীতির ওপর মানবসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর একটি হল আদল ও ইনসাফ তথা ন্যায়-পরায়ণতা। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ন্যায়-পরায়ণতা, ইনসাফ-মুতাবিক সাক্ষ্য দেওয়া এবং হক ফয়সালা করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

আর তুমি যদি তাদের মধ্যে ফয়সালা করো, তা হলে তাদের সাথে ইনসাফ মুতাবিক ফয়সালা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۗءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓي اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকো। কোনও সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। ন্যায়বিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, সে-সম্বন্ধে আল্লাহ ﷻ খুব ভালভাবে জ্ঞাত।[২]

ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে সূরা শূরায় এভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

১. সূরা মায়েদায় : ৪২
২. সূরা মায়েদায় : ০৮

﴿وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾

আর বলে দাও! আল্লাহ যে কিতাব পাঠিয়েছেন, তার ওপর আমি ঈমান এনেছি; আর তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে আমি আদিষ্ট হয়েছি।[৩]

ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়তার বন্ধনের নির্দেশ সূরায়ে নাহলে এভাবে দেওয়া হয়েছে–

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۗئِ ذِي الْقُرْبٰى﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের এবং আত্মীয়দের দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন।[৪]

কুরআন মজিদের সূরা ছোয়াদ-এ, যেখানে আল্লাহ ﷻ তার মনোনীত পয়গম্বর দাউদ عليه السلام-কে জমিনের খেলাফত দানের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেখানে তাকে লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [সূরা ছোয়াদ : আয়াত ২৬]

অপর এক জায়গায়, যারা আল্লাহ ﷻ-র নাযিলকৃত হুকুম মুতাবিক ফয়সালা না করে, তাদেরকে কুফর ও অন্যায়-অনাচার করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। [সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪, ৪৫ ও ৪৭]

কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাসক, কাজি বা সালিস–যিনিই বিচার করুন না কেন, তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং সঠিক ফয়সালা করা আবশ্যক। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখা যাবে না। তদ্রূপ রাগান্বিত অবস্থায়ও বিচারকার্য করা যাবে না।

যেমন আবু বাকরা رضي الله عنه সিজিস্তানে অবস্থানরত তার পুত্র আব্দুর রহমানকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে তুমি

৩. সূরা শূরা : ১৫
৪. সূরা নাহল : ৯০

দু'পক্ষের মধ্যে ফয়সালা কোরো না। কারণ, আমি নবীজি [ﷺ]-কে বলতে শুনেছি–

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

কোনও বিচারক [হাকিম বা সালিস] ক্রুদ্ধ থাকা অবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে বিচার করবে না।[৫]

শেষনবী মুহাম্মদ [ﷺ] রাসুল হওয়ার পাশাপাশি শাসকও ছিলেন, এবং বিচারকও ছিলেন। বিভিন্ন সময় তার দরবারে যে ফয়সালা হয়েছে, সেগুলো হক ও ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরপর খুলাফায়ে রাশেদিন এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যেসব ফয়সালা করেছেন, সেগুলোও ছিল পুরোপুরি ন্যায়-বিচারের ওপর। মানবেতিহাসে এ রকম বিচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিশেষকরে উমর رضي الله عنه এবং আলী رضي الله عنه-র বিরল ফয়সালাগুলো তাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। এর পর কাজি শুরাইহ, কাজি আয়াস, খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ, কাজি শরিক, কাজি আবু হাজেম, কাজি আবু ইউসুফ, কাজি মুনযির বিন সাঈদ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিচারকগণ বিচারকের আসনে বসে এমনসব শানদার ফয়সালা করেন, যেগুলো সত্য ও সততার ইতিহাসকে অলঙ্কৃত করেছে। তা ছাড়া, তাদের পরের খলিফা এবং শাসকগণও ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দ্বারা ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন।

'মুসলিম ইতিহাসের সোনালি বিচার' শিরোনামে আমাদের আলোচ্য বইটিতে নবীজি [ﷺ], সাহাবায়ে কিরাম, প্রসিদ্ধ মুসলমান শাসকবর্গ ও কাজিদের সে-সব ফয়সালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা দুনিয়ায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সোনালি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেগুলো দ্বারা পরবর্তীতে আগত শাসক ও বিচারকগণ মূল্যবান পথ-নির্দেশনা পেয়েছেন। এসব ঘটনাবলি এজন্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এতে ইসলামি সমাজে আবারও সততা প্রতিষ্ঠা হবে। আর যেসব

[৫] সহিহ বুখারি : সূরা শূরা : ১৫
[৫] সূরা নাহল : ৯০ হাদিস নং ৭১৫৮

ইসলামি রাষ্ট্রে, বিশেষ করে পাকিস্তানে লুটতরাজ ও জুলুম-অত্যাচারের মহামারি যেভাবে দেখা দিয়েছে, তা থেকে জাতি মুক্তি পাবে, এবং ইসলামের বরকত দ্বারা যথাযথভাবে উপকৃত হওয়া যাবে। এই বইটিতে বর্ণনাসূত্রে সত্যায়িত ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ঘটনাবলি সংকলন করা হয়েছে। সাবলীল ভাষায় কথোপকথনের ভঙ্গিমায় উপস্থাপনের কারণে বর্ণিত ঘটনাগুলো পাঠকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে। বেশিরভাগ ঘটনাই নেওয়া হয়েছে নবীজি [ﷺ], খুলাফায়ে ইসলাম ও মহান শাসকগণের। সূত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দারুস্সালাম, লাহোরের গবেষক মুহসিন ফারানি বইটির সম্পাদনা ও পরিমার্জনার পাশাপাশি ঘটনার শেষে ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যোগ করে দিয়েছেন। যার ফলে বইটির উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনা নেওয়া হয়েছে আরবি কিতাব থেকে। দারুস্সালাম, রিয়াদ-এর ভাই রেজওয়ানুল্লাহ রিয়াজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি পাণ্ডুলিপির বিন্যাস, কয়েকটি উক্তির অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তা ছাড়া আমাদের ইলমি কমিটির জিম্মাদার কারি মুহাম্মদ ইকবাল আব্দুল আজিজও কৃতজ্ঞতার হকদার, যিনি বইটিকে শেষবার দেখে দিয়েছেন। এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা সংযোজন করেছেন। এ ছাড়াও দারুস্সালামের যেসব সাথিরা বইটির কম্পোজ, সংশোধন ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন, তাদের সবার জন্য আল্লাহ ﷻ-র দরবারে দোয়া করছি।

'মুসলিম ইতিহাসের সোনালি বিচার' আমার কয়েক বছরের অধ্যয়নের সারবস্তু। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি আমাদের শাসকশ্রেণি এবং বিচারকগণ সঠিক ফয়সালা করেন এবং নির্ভীকভাবে সত্যের পক্ষে রায় দেন, এবং এর ফলে যদি সমাজ থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর করার ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যায়, এবং ব্যক্তিগতজীবন ও সামাজিকজীবনে ইসলামের ন্যায়বিচারের বরকতে উপকৃত হন, তা হলে মনে করব, আমাদের কষ্ট সফল হয়েছে।

'দারুস্সালাম' একটি দীনি মিশন। এর সবগুলো বই-ই মানুষকে ইসলামি শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে, এবং ব্যক্তি-ও

সমাজজীবনে নেক ও সৎকাজ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ হয়। 'মুসলিম ইতিহাসের সোনালি ফয়সালা' বইটি হল এর সর্বশেষ সংযোজন। আশা রাখি, পাঠকবর্গ ও চিন্তাবিদরা বইটি পাঠ করে নিজের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করবেন। যেন তা তাদের নিজেদের এবং অন্যদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তির উপাদান হতে পারে।

-আব্দুল মালেক মুজাহিদ
রিয়াদ, সৌদি আরব; ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খৃ.

তোমার সাক্ষ্যের ভিত্তি কী

উমারা বিন খুযাইমা رضي الله عنه-র সূত্রে ইমাম যুহরি[৬] رحمه الله-র বর্ণনা। এক গ্রাম্য ব্যক্তি থেকে নবীজি ﷺ একটি ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন। দাম নেওয়ার জন্য তাকে জলদি আসতে বলে তিনি আগে আগে চললেন। ঘোড়াটি নিয়ে সে নবীজির পিছু পিছু আসছিল। পথে পথে লোকজন তার ঘোড়াটা কেনার জন্য দাম বলছিল। তাদের জানা ছিল না, নবীজি ﷺ এটি কিনে নিয়েছেন। তাদের একজনের বলা দাম নবীজির দাম থেকে বেশি ছিল। তাই গ্রাম্যলোকটা সজোরে আওয়াজ করে নবীজিকে বলল–

'ঘোড়া কিনলে কিনে নিন। নচেৎ আরেকজনের কাছে বেচে ফেলব।'

নবীজি ﷺ বললেন–

'তোমার থেকে কি আমি ঘোড়া কিনে নেইনি?'

গ্রাম্যলোকটি বলল–

'না! না! বেচাকেনা তো এখনও পুরো হয়নি।'

---

৬. তার নাম মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ আলআসগর বিন শিহাব। কুরাইশ গোত্রের বনু যাহরার দিকে সম্পর্কিত হয়ে ইবনে শিহাব যুহরি নামে তিনি প্রসিদ্ধ। ৫০ বা ৫১ হিজরিতে তার জন্ম। তার প্রপিতামহ আব্দুল্লাহ আলআসগর ইসলামের শুরুভাগে বিরোধিতা করলেও পরবর্তীতে মুসলমান হন। তাকে হাফেজে হাদিস ও ফকিহদের আকাবের থেকে গণ্য করা হয়। খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাকে কাজির পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি খলিফা হিশামের সন্তানদের আতালিকও [গৃহশিক্ষক] ছিলেন। ১২৪ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [উর্দু দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া : খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা ৫২৪-৫২৫]

এরপর রাসুল ﷺ এবং ওই লোকের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। তা দেখে লোকজন জমা হয়ে গেল।

গ্রাম্যলোকটি বলল–

'আপনার নিকট আমি ঘোড়া বেচে থাকলে সে-ব্যাপারে সাক্ষী আনুন!'

তাদের কথোপকথন যেসব মুসলমান শুনছিলেন, তারা তাকে বললেন–

'ধ্বংস হোক তোমার! জেদ করছ কেন? কেন রাসুল ﷺ -এর সাথে তর্ক করছ? সত্য ছাড়া রাসুল ﷺ কি আর কিছু বলবেন?'

এর মধ্যে খুযাইমা[৭] বিন সাবেত رضي الله عنه সেখানে পৌঁছলেন। রাসুল ﷺ-এর সাথে গ্রাম্য লোকটির তর্কবিতর্ক শুনলেন। তার এ কথা শুনে বললেন–

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি তোমার ঘোড়াটা নবীজির ﷺ নিকট বিক্রয় করেছ।'

এ কথা শুনে নবীজি ﷺ খুযাইমা رضي الله عنه-র দিকে ফিরলেন; জিজ্ঞাসা করলেন–

'কীসের ভিত্তিতে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ?' [কারণ, ঘোড়া বেচাকেনার সময় তো তুমি সেখানে ছিলেই না।]

খুযাইমা রাযি. জবাবে বললেন–

'আপনাকে বিশ্বাস করার ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিচ্ছি।'

তখন থেকে খুযাইমা রাযি.র একার সাক্ষ্যকে নবীজি ﷺ দুই সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দিলেন।

[৭] খুযাইমা বিন সাবেত رضي الله عنه ছিলেন আউস গোত্রের। তিনি বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নেন। মক্কা বিজয়ের সময় আউসের শাখাগোত্র হুতামার পতাকা তিনি বহন করেন। তিনি হযরত আলী رضي الله عنه-র সঙ্গ দেন এবং সিফ্ফিনের যুদ্ধে [৩৭ হি.] শাহাদত লাভ করেন। [উসদুল গাবা : ১৭০/২, আবু দাউদ : হাদিস ৩৬০৭ ; মুসনাদে আহমদ : ২১৫/৫]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, নবীজি ﷺ খুযাইমা رضي الله عنه-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

'কীসের ওপর ভিত্তি করে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ, যখন তুমি আমাদের সাথেই ছিলে না?'

খুযাইমা رضي الله عنه আরজ করলেন–

'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যখন আসমানের সংবাদ বলেন, তখন আমি বিশ্বাস করি। তা হলে কি আপনার এ কথা বিশ্বাস করব না?'[৮]

তার এ কথার অর্থ হল, আরশের মালিক আল্লাহ جل جلاله যখন তার দূত জিবরাঈল عليه السلام-র মাধ্যমে মাটিতে থাকা নবীজি ﷺ -এর নিকট কোনও ওহি পাঠান, যাতে অতীতের কথা এবং ভবিষ্যতের কথা থাকে, তখন সে কথা আমরা সাহাবিরা- কোনও প্রশ্ন না তুলেই নির্দ্বিধায় পুরোপুরি বিশ্বাস করি। তা হলে সামান্য এই বেচাকেনার কথা সত্য বলে না মানার কী কারণ থাকতে পারে?

[৮] আবু দাউদ : হাদিস ৩৬০৭ ; মুসনাদে আহমদ : ২১৫/৫

তৎক্ষণাৎ ফয়সালা

আমিরুল মুমেনিন উমর[১] ﷺ মসজিদে নববীতে বসে আছেন। এ সময়ে তার পাশ দিয়ে একব্যক্তি গেল। যাওয়ার সময় সে বলছিল–

'হে উমর! তোমার জন্য জাহান্নামের ঠিকানা!'

উপস্থিত লোকদের তিনি বললেন,

'এ-লোকটাকে আমার নিকট নিয়ে এসো!'

---

[১] উমর ﷺ ছিলেন কুরাইশের বনি আদি গোত্রের। তার বংশ-পরম্পরা নবীজি ﷺ-এর সাথে অষ্টম পুরুষে গিয়ে কা'ব বিন লুআঈ-র সাথে মিলিত হয়। নবুওয়্যতের ষষ্ঠ বছর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার বয়স তখন ছিল ২৬ বা ২৭ বছর। উম্মুল মুমেনিন হযরত হাফসা ﷺ-র দিকে সম্পর্কিত হয়ে তার উপনাম হল 'আবু হাফস'। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি ইরাক ও শাম-সহ বিভিন্ন দেশে অনেকবার ভ্রমণ করেন। সেখানকার শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত আবু বকর ﷺ তাকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। ১৩ হিজরি থেকে ২৩ হিজরী পর্যন্ত তিনি খেলাফতের দায়িত্ব আদায় করেন। যতটা সুন্দর ও সুচারুরূপে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, পরের কেউ আর ততটা পারেননি। তার শাসনকালেই ইসলামি বাহিনী সাসানি এবং বাজেন্টাইন রাজত্বগুলো জয় করে। এবং ২২ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা ইসলামি শাসনের আওতাভুক্ত করে। ২৩ হিজরির ২৭ যিলহজ্জ মসজিদে নামাযের সময় আবু লুলু ফিরোজ নামক এক ঘাতক বিষমাখা খঞ্জর দ্বারা তাকে আঘাত করে। বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তিনি ২৪ হিজরির ১লা মহররম শাহাদত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন! [আটলাসে সিরতে নববি পৃ. ৩৫৩-৩৫৪]

তাকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–

'তোমার এ কথা বলার কারণ কী?'

সে বলল–

'শাসক নিয়োগ দেওয়ার সময় আপনি তো তাদের থেকে শর্ত মানিয়ে নেন; কিন্তু পরে আর হিসাব নেন না যে, শর্তগুলো তারা পালন করল কি না।'

আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কী?'

সে বলল, 'মিশরে আপনার নিয়োগকৃত শাসক আপনার আরোপিত শর্তগুলো পালন না করে নিষিদ্ধ কাজগুলো করছে।'

এভাবে সে আমিরুল মুমেনিনের নিকট মিশরের শাসকের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলল।

এই অভিযোগ শোনার পর আমিরুল মুমেনিন দুজন আনসারি সাহাবিকে মিশর পাঠালেন–তোমরা দুজন মিশর গিয়ে শাসক সম্বন্ধে খোঁজখবর নাও; লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করো। যদি দেখ, এই ব্যক্তি ভুল তথ্য দিয়েছে, তা হলে আমাকে জানাবে। আর যদি তার তথ্যগুলো সত্য হয় এবং বাস্তবেই দায়িত্ব পালনে শাসক ত্রুটি করে থাকে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

সাহাবি-দুজন মিশরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে লোকজনের নিকট শাসক সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এখানে সেই অভিযোগকারীর কথার সত্যতা পাওয়া গেল। তারা দুজন শাসকের বাড়ি পৌঁছে দরজায় করাঘাত করলেন। ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। জবাবে দারওয়ান বলল–

'শাসকের সাথে আজ সাক্ষাৎ করার অনুমতি পাওয়া যাবে না।'

তারা বললেন–

'শাসককে আমাদের সামনে আসতেই হবে। নচেৎ দরজা পুড়িয়ে ফেলব।'

এ সময় এক আনসারি সাহাবি কোথাও থেকে আগুনের শিখা নিয়ে এলেন।

দারওয়ান ভেতরে গিয়ে বিষয়টি শাসককে জানাল। শাসক বেরিয়ে এলে তারা বললেন–

'আমরা আমিরুল মুমেনিনের পয়গাম নিয়ে এসেছি। তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।'

শাসক বলল, 'আমার একটা দরকারি কাজ আছে। সেটা সেরে এখনই আসছি। একটুখানি সুযোগ দাও।'

তারা বললেন, আমিরুল মুমেনিন আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে যেন এক মুহূর্তও সুযোগ দেওয়া না হয়।

তাকে সাথে নিয়ে তারা দুজন মদিনায় পৌঁছলেন। শাসক গিয়ে আমিরুল মুমেনিনকে সালাম করল। কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। কারণ, আগে থেকে অনেক বদলে গেছে সে। মিশরের শাসক হওয়ার আগে গোধুম বর্ণের ছিল। কিন্তু মিশরের শস্য-শ্যামল পরিবেশ তার জন্য বেশ উপযোগী হল। তার দেহবর্ণ ফর্সা হয়ে গেল এবং দেহ ভারি হয়ে পড়ল। তাই সবিস্ময়ে আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?'

সে বলল, 'আমি হলাম অমুক, যাকে আপনি মিশরের শাসক নিয়োগ করেছিলেন।'

আমিরুল মুমেনিন বললেন–

'ধ্বংস হোক তোমার! যে কাজ থেকে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, সেটাই করতে থাকলে! আর যা করতে বলেছিলাম, তা ভুলে গেলে! আল্লাহর কসম! এর উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই তোমাকে দেব।'

এরপর পশমের একটি ছেঁড়া পোশাক, একটি লাঠি এবং সাদকার তিনশ' বকরি আনিয়ে তাকে বললেন, এই পোশাক পরিধান করো। এর থেকেও পুরোনো পোশাকে আমি তোমার বাবাকে দেখেছি। এই

লাঠিটি উঠিয়ে নাও। এটি তোমার বাবার লাঠি হতে অনেক ভাল। আর অমুক চারণভূমিতে গিয়ে এই বকরিগুলো চরাও।

তখন ছিল প্রচণ্ড গরম কাল। তিনি তাকে আরও বললেন–

'আর পথিকদের বকরির দুধ থেকে বাধা দেবে না। তবে শুধুমাত্র উমরের পরিবারের লোকদের বাধা দেবে। কারণ, উমরের পরিবারের কেউ কখনও সাদকার বকরির দুধ বা গোশত ব্যবহার করেছে কি না তা আমার জানা নেই।'

এরপর আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন,

'আমি যা বলেছি, তা কি তুমি বুঝেছ? না কি বোঝোনি?'

সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটে পড়ে বলল–

'এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। পারলে আমার গরদান উড়িয়ে দিন!'

আমিরুল মুমেনিন বললেন–

'তোমাকে যদি আগের পদে ফিরিয়ে দিই, তা হলে তুমি কেমন হয়ে চলবে?'

সে বলল–

'আল্লাহর কসম! আপনার নিকট সেই রকমই তথ্য আসবে, যা আপনার পছন্দ।'

আমিরুল মুমেনিন তাকে তার আগের পদে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর সে মিশরের একজন আদর্শ শাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করল। ভয়, তাকওয়া ও একনিষ্ঠতার সাথে সে তার দায়িত্ব পালন করতে থাকল।[১০]

---

১০. কাসাসুল আরব খণ্ড ৩, পৃ.১৬-১৭ ; ইবনু আবিল হাদিদ : ৩/৯৮

খলিফার বিরুদ্ধে ফয়সালা

আতাবি ﷺ বলেন, উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালেকের[১১] [১০৫ হি. হতে ১২৫ হি.] কাজির নিকট আমি বসা ছিলাম। এ সময়ে কাজির আদালতে দুই ব্যক্তি এল। একজন ছিলেন ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ বিন তালহা; অপরজন খলিফা হিশামের দরবারি সিপাহি। আদালতে এসে তারা কাজির সামনে বসে পড়ল।

দরবারি সিপাহি বলল, 'কাজি সাহেব! আমিরুল মুমেনিন এবং ইবরাহিমের মধ্যে একটি বিবাদ হয়েছে। তিনি আমাকে তার পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন।'

কাজি সাহেব বললেন, 'তোমাকে যে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন, সে-ব্যাপারে দুজন সাক্ষ্য লাগবে।'

---

১১. খলিফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের চতুর্থ ছেলে ছিলেন খলিফা হিশাম। ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেকের পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার যুগে তুর্কিরা বার-বার বিদ্রোহ করে। নছর বিন সাইয়ারকে হিশাম খোরাসানের শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি নতুন মুসলমানদের থেকে কর নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। ফলে তুর্কিদের মধ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। হিশামের সেনাপ্রধান সাঈদ হিরিশি খিযর এবং আযারবাইজানের তুর্কিদের বার-বার পরাজিত করেন। রোমীদের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকটি বিজয় লাভ করেন। হিশামের শাসনকালে যায়দ বিন আলী বিন যাইনুল আবেদিন কূফায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু ঠিক প্রয়োজনের সময় কূফাবাসীরা তার সঙ্গ ছেড়ে দেয়। তাই তিনি তাদের 'রাফেযি' নামে আখ্যায়িত করেন। শেষ যুদ্ধে তার কপালে তীর বিদ্ধ হলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সাড়ে উনিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১২৫ হিজরি মুতাবিক ৭৪২ ঈসাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [তারিখে ইসলাম : আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদী : ১/৭৮৮-৮০২]

সিপাহি বলল, 'আপনি কি মনে করেন, আমি আমিরুল মুমেনিনের পক্ষে মিথ্যা বলতে পারি? অথচ তার মধ্যে এবং আমার মধ্যে তেমন দূরত্ব নেই। আমি তারই কাছের একজন সিপাহি।'

কাজি বললেন, 'সাক্ষ্য ছাড়া তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও রায় হবে না।'

কাজির স্পষ্ট কথা শোনার পর দরবারি সিপাহি আদালত হতে বেরিয়ে খলিফার নিকট গেল। পুরো বিষয়টি তাকে জানাল। তা শুনে তিনি বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ আদালতের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আদালতের দরজা খুলতেই দরবারি সিপাহি আগে বেড়ে বলল, 'কাজি সাহেব! এই দেখুন! আমিরুল মুমেনিন উপস্থিত।'

খলিফা হিশামকে দেখতে পেয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কাজি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু খলিফা তাকে বসতে বললেন। এরপর কাজি সাহেব একটি মুসাল্লা বিছিয়ে দিলেন। তাতে খলিফা এবং তার প্রতিপক্ষ একসাথে বসে পড়লেন।

আতাবি বর্ণনা করেন, আমরা উপস্থিতরা তাদের আলোচনা স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে কিছু কিছু কথা বোঝা যাচ্ছিল। তারা দুজনে নিজ নিজ প্রমাণ পেশ করল। সবকিছু শোনার পর কাজি সাহেব খলিফার বিপক্ষে রায় দিলেন। নিজের পক্ষে রায় শুনে ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ খলিফাকে কিছু অশালীন কথা শোনালেন। আরও বললেন–

'সকল প্রশংসা সে-সত্তার, যিনি মানুষের সামনে আপনার অত্যাচারের কথা খুলে দিয়েছেন।'

এ কথা শুনে খলিফা ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন–

'ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার ঘাড়ের ওপর তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে আঘাত করি, যেন তোমার হাড় থেকে গোশত খুলে যায়।'

ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ বললেন–

'আল্লাহর কসম! আপনি যদি এমনটা করেন, তা হলে একজন বয়স্ক ও নৈকট্যশীল ব্যক্তির সাথে অসমীচীন আচরণ হবে।'

খলিফা হিশাম বললেন, ইবরাহিম! আমাদের এই বিবাদের ব্যাপারটা গোপনই থাকতে দাও।'

জবাবে ইবরাহিম বললেন–

'আমি যদি এটাকে গোপন রাখি, তা হলে আল্লাহ ﷻ আমার সেই গোনাহ কিয়ামতের দিন গোপন রাখবেন না।' [অর্থাৎ আমি অবশ্যই বলে বেড়াব।]

খলিফা বললেন, 'এটা গোপন রাখার জন্য আমি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেব।'

খলিফার মৃত্যু হলে ইবরাহিম মুহাম্মদের মুখে লোকজন এ কথা শুনতে পেত–

'খলিফার জীবদ্দশায় আমি এই মুকাদ্দমার বিষয়টি তার দেওয়া অর্থের বিনিময়ে গোপন রেখেছি। আর তার মৃত্যুর পর তার একটি চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য বর্ণনা করছি।'[১২]

---

[১২]. কাসাসুল আরব : ৩/৪৭ ; আলইকদুল ফরিদ : ৪/৪৪৭

রায় হল ইয়াহুদির পক্ষে

আলী[১৩] ؓ-র বর্মটি হারিয়ে গিয়েছিল। একদিন তিনি তা এক ইয়াহুদির নিকট দেখতে পেলেন। তাকে বললেন, [তখন তিনি খলিফা ছিলেন।] 'হে ইয়াহুদি! তোমার নিকট যে বর্মটি দেখা যাচ্ছে, সেটা তো আমার!'

ইয়াহুদি বলল, 'আমার হাতে থাকা বর্মের ব্যাপারে আপনি কীভাবে বলছেন যে, এটা আপনার? আমার নিকট থাকা বর্মের ব্যাপারে যদি আপনার দাবি এটাই থাকে, তা হলে সেটার সমাধান হওয়ার একটাই পথ আছে–আমার আর আপনার মধ্যে ফয়সালা করবেন একজন মুসলমান কাজি।'

ফয়সালার জন্য আলী ؓ এবং ইয়াহুদি কাজি শুরাইহ[১৪] ؒ-র আদালতে পৌঁছলেন। আমিরুল মুমেনিনকে দেখতে পেয়ে কাজি

---

[১৩]. আমিরুল মুমেনিন আলী বিন আবু তালেব ؓ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর চাচাত ভাই। ফাতেমা ؓ-কে তার সাথে বিবাহ দিয়ে তিনি তাকে তার জামাতা হওয়ার সম্মান দান করেন। আকিল এবং জাফর ؓ ছিলেন তার দুই সহোদর। তারা বয়সে তার থেকে বড় ছিলেন। তিন ভায়ের প্রত্যেকের পরস্পরের বয়সের তফাত ছিল দশ বছর করে। উম্মে হানি এবং জুমানা নামে তার দুই বোন ছিলেন। এরা সবাই ছিলেন ফাতেমা বিনতে আসাদের ঔরসজাত সন্তান। আলী ؓ ছিলেন চতুর্থ খলিফা। দশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান হন।

[১৪]. আবু উমাইয়া শুরাইহ বিন হারেস বিন জাহম কিন্দি। ইসলামের প্রথম যুগের একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ ও কাজি ছিলেন। তার জন্মভূমি ছিল ইয়ামান। উমর ؓ, হযরত উসমান ؓ, আলী ؓ এবং মুআবিয়া ؓ-র খেলাফতকালে

শুরাইহ رحمه الله দাঁড়াতে গেলেন। আলী رضي الله عنه তাকে বললেন, বসে পড়ুন!। কাজি শুরাইহ বসে পড়লেন।

এরপর বললেন, 'আমার বর্মটি হারিয়ে গিয়েছিল। সেটা আমি এই ইয়াহুদির নিকট দেখতে পেয়েছি।'

কাজি শুরাইহ رحمه الله ইয়াহুদি লোকটাকে বললেন, 'তোমার কি কিছু বলার আছে?'

ইয়াহুদি বলল, 'আমার বর্ম আমার নিকট আছে, এবং আমার মালিকানায় আছে।'

বর্মটি দেখে কাজি শুরাইহ رحمه الله বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমিরুল মুমেনিন! এটা আপনার বর্ম। কিন্তু আইন অনুসারে এটা প্রমাণের জন্য আপনাকে দুজন সাক্ষী পেশ করতে হবে।'

সাক্ষী হিসেবে আলী رضي الله عنه তার গোলাম কুম্বরকে পেশ করলেন। তিনি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। এরপর তিনি আদালতে হাসান ও হুসাইন رضي الله عنهما-কে উপস্থিত করলেন। তারাও তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।

কাজি শুরাইহ رحمه الله বললেন, 'আপনার গোলামের সাক্ষী আমি গ্রহণ করছি। কিন্তু আরেকজন সাক্ষী লাগবে। আপনার দুই পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারছি না।'

আলী رضي الله عنه বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি উমর رضي الله عنه-কে রাসুল ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি–

'হাসান হুসাইন হল জান্নাতি যুবকদের সরদার।'

কাজি শুরাইহ رحمه الله বললেন, 'আল্লাহর কসম! এটা একেবারেই সত্য।'

আলী رضي الله عنه বললেন, 'তা হলে আপনি জান্নাতি যুবকদের সরদারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন না কেন?'

কূফার কাজি ছিলেন। বিচারকার্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, আমানতদার ও দূরদর্শী ব্যক্তি। দীর্ঘ ১০৮ বছর বয়স পেয়ে ৮৭ হিজরিতে তিনি কূফায় মৃত্যুবরণ করেন। [ওফিয়াতুল আ'ঈয়ান : ২/ ৪৬০-৪৬৩]

কাজি শুরাইহ رحمه الله বললেন, 'এরা দুজন আপনার পুত্র। আর পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'

এ কথা বলে কাজি শুরাইহ رحمه الله আলী رضي الله عنه-র বিপক্ষে ইয়াহুদির অনুকূলে রায় দিলেন। বর্মটি ইয়াহুদিকে দিয়ে দিলেন।

বিস্মিত হয়ে ইয়াহুদি বলল, 'মুসলমানদের আমির আমাকে কাজির আদালতে নিয়ে এলেন। কাজি সাহেব আমার পক্ষে রায় দিলেন। আর আমিরুল মুমেনিনও বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিলেন!'

এরপর আমিরুল মুমেনিনের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, 'আমিরুল মুমেনিন! আপনার দাবি সম্পূর্ণ সত্য। এই বর্ম নিশ্চিত আপনারই। অমুক দিন আপনার থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি সেটা কুড়িয়ে পেয়েছি। কাজেই এটার মালিকানা আপনার। আপনি নিয়ে নিন।'

এর পর কালিমায়ে শাহাদত পড়ল–'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।'

আলী رضي الله عنه বললেন, 'আমার এই বর্মও তোমার; আর এই ঘোড়াও তোমার।'[১৫]

---

[১৫]. হিল্‌ইয়াতুল আওলিয়া – ইবনুল জাওযি, কানযুল উম্মাল ১৭৭৯০ বর্ণনায়ও এই ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

আমি কে

মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামি[১৬] ﵁-র বর্ণনা। তিনি বলেন, আমার এক দাসী ছিল। উহুদ এবং জুয়াইনার [মদিনার পাশে একটি জায়গার নাম।] আশেপাশে বকরি চরাত। ঘটনাক্রমে একদিন আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম, নেকড়ে একটি বকরি নিয়ে গেছে। আমিও একজন মানুষ। অন্যান্য আদমসন্তানের মত আমারও রাগ আসার প্রকৃতি আছে। তাই আমি রেগে গেলাম। তাকে সজোরে একটি থাপ্পড় মেরে বসলাম। পরে ঘটনাটি নবীজি ﷺ-কে জানালাম। তার ভাবভঙ্গি দেখে আমার মনে হল, আমার থেকে বিরাট একটি অন্যায় কাজ ঘটে গেছে। তাই তৎক্ষণাৎ বললাম–

'হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি তাকে আজাদ করে দেব না?'

তিনি বললেন– 'তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।'

আমি দাসীটিকে নিয়ে নবীজি ﷺ-র দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'আল্লাহ কোথায়?'

সে বলল– 'আসমানে।'

[১৬]. মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামি ﵁ ছিলেন বনু সুলাইম গোত্রের। তিনি মদিনায় বসবাস করতেন। [বুখারি] ইবনে আব্দুল বারর ﵀ বলেন, ইনি বনু সুলাইম এলাকায় বসবাস করতেন। তবে মদিনায় তার আসা-যাওয়া ছিল। অলুক্ষণে মনে করা এবং গণকের কাজ হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদিস তার থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তার ভাই আলী বিন হাকামও সাহাবি ছিলেন। [আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস্‌সাহাব, ইবনে হজর আসকালানি রহ. : ষষ্ঠ খণ্ড]

রাসুল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন– 'আমি কে?'

সে বলল– 'আপনি আল্লাহর রাসুল।'

মুআবিয়া বিন হাকাম ﵁-র দিকে ফিরে নবীজি ﷺ বললেন–

'তাকে আজাদ করে দাও। সে মুসলমান।'[১৭]

[১৭]. মুসলিম শরিফ : ৫৩৭ ; আবু দাউদ : ৯৩০

আমির হাকামের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান

এক মুকাদ্দমায় কাজি ইবনে বুশাইরের নিকট সাঈদ বিন আব্দুর রহমান দাখেল তার জায়গায় অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন।

সাঈদ বিন আব্দুর রহমানের হাতে একটি লেখা ছিল, যার ওপর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষরকারীদের সবাই মারা যায়। শুধুমাত্র আমিরুল মুমেনিন হাকাম[১৮] এবং অন্য এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি সাঈদ বিন আব্দুর রহমানের লেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি মারা যান। এদিকে লেখা সম্পর্কিত মুকাদ্দমাটি দিন দিন জটিল হতে থাকে।

লেখাটি নিয়ে একদিন তিনি আমির হাকামের নিকট আসেন। সেটার ওপর তার স্বাক্ষর দেখালেন, যা কিনা তিনি খেলাফতের দায়িত্বে আসার আগে তার পিতার খেলাফতের সময় দিয়েছিলেন। স্বাক্ষর দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল, কাজির নিকট গেলে তিনি তা বাতিল না করে যেন কার্যকর করেন।

আমির হাকাম তার চাচা সাঈদ বিন আব্দুর রহমানকে যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন; তার কথা মানতেন। লেখাটি দেখে তিনি বললেন,

---

[১৮].আমির প্রথম হাকাম বিন হিশাম [১৮০ হিজরি-২০৬ হিজরি] ছিলেন উন্দুলুসে উমাইয়্যা বংশের তৃতীয় শাসক। হারুন রশিদ, ফ্রান্সের বাদশাহ শারলিমিন এবং তিনি সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়-পরায়ণ ও সতেজ-মস্তিষ্ক শাসক। জ্ঞান চর্চার প্রতিও তিনি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ২০০ হিজরি থেকে ২০৩ হিজরি পর্যন্ত তার সেনাপ্রধান আব্দুর করিম ফ্রান্সের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত জয় করে নেন। এবং তিন বছর পর বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। [তারিখে ইসলাম : ২/৯৯-১১৪]

'চাচাজান! আমি এখন আর সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত নই। দুনিয়ার প্রতি আমরা কতটা ঝুঁকে গেছি, তা আপনার ভালভাবেই জানা। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কাজির সামনে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হলে, হয়ত সুলতানাত থেকেই হাত ধুয়ে উঠতে হবে। তাই আমার পরামর্শ হল, দয়া করে কাজির ফয়সালা মেনে নিতে ইতস্তবোধ করবেন না। আর এই মুকাদ্দমায় হক আপনাকে যে জায়গায় এনে দাঁড় করায়, আপনি কোনও প্রশ্ন না তুলে তা মেনে নেবেন। হ্যাঁ, এই ফয়সালায় আপনার যা ঘাটতি মনে হবে, সেটা আমরা সানন্দে পূরণ করে দিতে প্রস্তুত।'

সাঈদ বিন আব্দুর রহমান আমির হাকামের কথা মানতে অস্বীকার করলেন। বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! কাজির কী সাহস যে, আপনার সাক্ষ্যের ব্যাপারে কিছু বলতে সাহস করবে? আপনিই তাকে কাজির পদে আসীন করেছেন। এই পদটি তার ওপর আপনার বিরাট অনুগ্রহ। এই লেখা সম্বন্ধে যা-ই আপনি জানেন, কাজির সামনে অবশ্যই বলবেন। সত্য যা, তা মোটেই চুপাবেন না। কারণ, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া এবং তা গোপন করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ রয়েছে। এই ব্যাপারে তিনি ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়েছেন।'

জবাবে আমির বললেন, 'চাচাজান! আপনি যা বলছেন, তা আপনার অধিকার। কিন্তু মামলার ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করতে আমাদের বাধ্য করবেন না। এর থেকে যদি আমাকে অব্যহতি দেন, আমার বেশি ভাল লাগবে। আর যদি বাধ্য করেন, তা হলে আপনার হুকুম পালন করব। আপনার অবাধ্য হওয়ার শক্তি আমার নেই।'

সাঈদ বিন আব্দুর রহমান আমিরকে এ কথা মানাতে চেষ্টা করলেন যে, যেহেতু লেখাটা আমার নিকট আছে, আর তাতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর আছে, তাই মুকাদ্দমার ফয়সালা আমার অনুকূলেই হবে।

চাচার চাপাচাপিতে শেষপর্যন্ত কাজির দরবারে সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেন আমির হাকাম। তিনি দুজন প্রসিদ্ধ ফকিহকে ডেকে পাঠালেন। একটি কাগজের ওপর তার সাক্ষ্যের বক্তব্য লিখে মোহর লাগিয়ে তাদের দিলেন। বললেন, আপনারা দুজন এই লেখা নিয়ে কাজির নিকট যান।

হাকামের হুকুম মুতাবিক তারা দুজন কাজির দরবারে উপস্থিত হলেন। সাক্ষীদের বক্তব্য শোনার জন্য কাজি সাহেব আদালতে উপস্থিত হলে তারা দুজন আমির হাকামের লিখিত বক্তব্যটি পেশ করলেন। এরপর ফকিহরা তাদের বক্তব্য রাখলেন। তাদের বক্তব্য শুনে কাজি সাহেব বললেন,

'আপনাদের দুজনের কথা শুনলাম। এখন আপনারা শান্তি ও নিরাপদে আল্লাহ ﷻ-র নিরাপত্তায় ফিরে যেতে পারেন।'

এই সময় সাঈদ বিন আব্দুর রহমানের প্রতিনিধি উপস্থিত হল। পুরো আস্থা নিয়ে কাজি সাহেবকে লক্ষ করে বলল,

'আপনার নিকট আমিরের সাক্ষ্যও পৌঁছে গেছে। এখন এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?'

কাজি সাহেব প্রতিনিধির হাত থেকে লেখাটি নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে বললেন–

'আমার মতে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও ন্যায়-পরায়ণ ও সৎ ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়ে আসো।'

এই ফয়াসালা শুনে প্রতিনিধি ঘাবড়ে গেল। দ্রুত সাঈদ বিন আব্দুর রহমানের নিকট গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানাল। কাজির ফয়সালা তার কানে আসার সাথে সাথেই মনে হল, তার পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে। তাড়াতাড়ি সওয়ারির ওপর উঠে ভাতিজার নিকট গেলেন; বললেন–

'আমাদের সুলতানাত চলে গেছে। আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে গেছে। এই কাজির এই সাহস হল যে, আপনার সাক্ষ্যও ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দেয়!'

আমিরকে আরও উত্তেজিত করার জন্য সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বললেন,

'আল্লাহ ﷻ আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। তার বান্দাদের আমির হিসেবে আপনাকে মনোনীত করেছেন। মুসলমানদের জান-মালের

পাহারাদার বানিয়েছেন। এই কাজি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার উপযুক্ত নয়।'

এভাবে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে কাজির বিরুদ্ধে আমির হাকামকে উত্তেজিত করতে চেস্টা করতে থাকলেন, যেন কাজিকে এই পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে দেওয়া হয়।
সাঈদের সব কথা শোনার পর আমির হাকাম বললেন–

'চাচাজান! এই মুকাদ্দমায় কি আমি কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেছি? কাজি সাহেব হলেন একজন নেককার ও সৎ ব্যক্তি। কোনও তিরস্কারকারীর তিরস্কার তাকে হক পথ থেকে সরাতে পারবে না। যা তার কর্তব্য, তিনি তা করেছেন। আর সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, যেটার মধ্যে খুব কষ্টেই প্রবেশ করা যায়। আল্লাহ ﷻ কাজি সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দিন।'

এ কথা শুনে সাঈদ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমার ব্যাপারে বলার জন্য আপনার এই কথাটাই বাকি রইল!?'

জবাবে আমির বললেন–

'হ্যাঁ, আমার ওপর আপনার যে অধিকার ছিল, তা আমি আদায় করেছি। আল্লাহর কসম! কাজি সাহেব নিজেকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, সে-ব্যাপারে আমি তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আর এই ধরনের লোকদের [হক থেকে] বাধা দিয়ে মুসলমানদের হক খেয়ানত করব না।'[১৯]

---

১৯. কাসাসুল আরব : ৩/৯৬-৯৬ ; নফহুত্তীব : ১/৩৯১

কিতাবুল্লাহ মুতাবিক ফয়সালা

আবু হুরায়রা[২০] رضي الله عنه এবং যায়দ বিন খালেদ জুহানি[২১] رضي الله عنه-র বর্ণনা–

'আমরা রাসুল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এই সময় দু'ব্যক্তি রাসুল ﷺ -এর নিকট একটি মুকাদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হল। তাদের একজন বলল–

হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের দুজনের মধ্যে কিতাবুল্লাহ মুতাবিক ফয়সালা করে দিন।

অপর ব্যক্তি তার তুলনায় বেশি জ্ঞানী ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফয়সালা করুন। আর আমাকে এ ব্যাপারে বলার অনুমতি দিন।

২০.ইবনে ইসহাকের উক্তি মতে আবু হুরায়রা رضي الله عنه-র নাম ছিল আব্দে শামস। কিন্তু নবীজি ﷺ তা পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন আব্দুর রহমান। বিড়াল পালতেন বলে তাকে 'আবু হুরায়রা' [বিড়ালওয়ালা] বলা হত। খায়বর বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আসহাবে-সুফ্ফার একজন। আটশ'রও বেশি সাহাবি ও তাবে'য়ি তার থেকে হাদিস রেওয়ায়াত করেন। উমর رضي الله عنه তাকে বাইরাইনের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আবার অপসারণ করেন। ৫৭ হিজরিতে আবু হুরায়রা رضي الله عنه মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ৬/৩১৩-৩১৫]

২১. যায়দ বিন খালেদ জুহানি رضي الله عنه মদিনায় বসবাস করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় জুহাইনা গোত্রের পতাকা তিনি বহন করেন। ৭৮ হিজরিতে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ২/৩৫৫]

রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ; তোমার কী বলার, বলো।

সে ব্যক্তি বলল, প্রকৃত ব্যাপারটা হল, আমার ছেলে এর মজদুর ছিল। [তার ঘরে আমার ছেলের আসা-যাওয়া ছিল।] তার স্ত্রীর সাথে আমার ছেলে ব্যভিচার করেছে। বিষয়টি সমাধান করার জন্য আমার ছেলের পক্ষ হতে একশ' বকরি এবং একটি দাসী দিয়েছি। তারপর বিষয়টি আলেমদের জানিয়ে ফতোয়া চাইলে তারা আমাকে শরিয়তের শাস্তি বাতলে বলেছেন যে, আমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারা হবে। এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর এর স্ত্রীকে প্রস্তারাঘাত করে হত্যা করা হবে।

তার কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন–

'শপথ সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! দাসী এবং বকরি তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। তোমার ছেলেকে একশ' দোররা মারা হবে, এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর উনাইস! তুমি এ ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও। সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তা হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করো।'

উনাইস رضي الله عنه গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে-স্ত্রী তা স্বীকার করল। এরপর রাসুল ﷺ-এর নির্দেশে তাকে প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যা করা হল।[২২]

২২. সহিহ বুখারি : হাদিস ৬৮২৮ ; মুসলিম : ১৬৯৭ ; নাসাঈ : ৮/২৪১ ; মুআত্তা : ২/১৬৭

২জন স্ত্রী নিয়ে পারিবারিক সমস্যা প্রসঙ্গে

কাজির বুদ্ধিমত্তা

কাজি আবুল হুসাইন বিন উক্বা বলেন–

আমার চাচাত বোন ছিল খুবই সম্পদশালী ও ধনী। আমি তাকে বিয়ে করলাম। তার সম্পদ ব্যবহার করতাম। টাকাকড়ির বদৌলতে গোপনে আরেকটি বিয়ে করলাম। এদিকে কেউ এসে আমার প্রথম স্ত্রীকে বলে দিল যে, আমি আরেকটি বিয়ে করেছি।

এর পর আর কী! ঘরে তুফান উঠল। আমার স্ত্রী খুবই নাখোশ হল। আমাকে বলল, দেখ! তুমি আমার অর্থকড়ি ব্যয় করতে। আজকের পর আর এমনটা করবে না। আমি তোমার ঘরে থাকতে চাই না। তোমার জন্য একটাই পথ খোলা আছে– হয়ত আমাকে রাখবে, নয় তো দ্বিতীয়জনকে। আমাকে রাখতে চাইলে এক্ষুণই তাকে তালাক দিয়ে দাও। এভাবে ঘরে ঝগড়া চলতে থাকল। আমি আমার স্ত্রীকে বোঝালাম যে, আমার দ্বিতীয় কোনও স্ত্রী নেই। সে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তা হলে বলো, তোমাকে ছাড়া আমি সকল স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছি।

এদিকে আমি যে মেয়েকে বিয়ে করেছি, সুন্দরী হওয়ার পাশাপাশি সে বুদ্ধিমতীও ছিল। আমার অবস্থা একইসময় দুই নৌকার আরোহী হওয়ার মত। প্রথম স্ত্রী হল আমার চাচাত বোন, এবং খুবই সম্পদশালী। তবে তাকে আমার ততটা পছন্দ ছিল না। আর দ্বিতীয়জন গরিব হলেও বুদ্ধিমতী ছিল। ঘরে ঝগড়া হোক, এটা আমি চাইছিলাম না। প্রথম স্ত্রী আমার খরচা বন্ধ করে দিল। এখন সামনে একটাই পথ খোলা ছিল–এমন কোনও পন্থা অবলম্বন করা, যাতে আমার প্রথম স্ত্রীও রাজি হয়ে যায়, এবং সান্ত্বনা পেয়ে যায় যে, আমি অন্য কোনও বিয়ে করিনি। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর তালাক না হয়।

অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট গেলাম। বললাম, প্রতিবেশীদের থেকে সুন্দর ও দামি পোশাক ধার নাও। সেগুলো পরে খুব সেজেগুজে প্রথম স্ত্রীর নিকট যাও, যেন সে মনে করে, তুমি একজন সম্পদশালী মহিলা। সাক্ষাৎ হলে খুব করে কাঁদবে। চোখের পানি ফেলবে। তার জন্য অনেক দোয়া করবে। তোমার কান্নাকাটি দেখে সে যখন প্রভাবিত হবে, তোমাকে অবশ্যই মুশকিল ও পেরেশানির কারণ জিজ্ঞাসা করবে। তখন তাকে বলো যে, আমার এক চাচাত ভায়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। আমাকে না জানিয়ে সে আরেকটি বিয়ে করেছে। অথচ আমার অর্থকড়ি থেকেই সে ব্যয় করে। আর অপর স্ত্রীর জন্যও আমার অর্থ থেকে ব্যয় করে। এখন তোমার সাহায্য চাই। তোমার স্বামী কাজি। তার নিকট আমার মুশকিল ও পেরেশানির কথা বলো। আমার জন্য সুপারিশ করো। আমার সাথে যেন ইনসাফ করা হয়। আদালতে ডেকে আমার স্বামীকে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করে। তোমার কথা শুনে সে তোমাকে আমার নিকট নিয়ে এলে বাকিটা আমি সামলে নেব।

আমার কৌশলটা বেশ কাজে লাগল। পরামর্শমতে আমার নতুন স্ত্রী খুব সুন্দর পোশাক পরিধান করে বেশ সেজেগুজে এক ধনী নারীর রূপ নিয়ে আমাদের ঘর এল। তখন আমি ঘরেই ছিলাম। এসেই জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। আমার পুরাতন স্ত্রী তার চোখের পানি মুছল; কান্না থামাল; তার মনোরঞ্জন করল। জিজ্ঞাসা করল, বোন! তোমার সমস্যাটা কী? কাঁদছ কেন? সে আমার শেখানো কথাটাই বলল। আমার প্রথম স্ত্রী বলল– 'বোন! কাজি তো তোমার স্বামীর থেকেও খারাপ। আমাকে অন্ধকারে রেখে সে-ও বিয়ে করেছে।'

এ কথা বলে সে তার হাত ধরে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার নিকট নিয়ে এল। বলল– 'এই বদনসীব মেয়ের অবস্থাও আমার মত খারাপ। তার কথা শুনে তার সাথে ইনসাফ করো।'

আমি নতুন স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করলাম। বললাম– 'কী ব্যাপার? কী অভিযোগ নিয়ে এসেছ?'

তাকে যা-কিছু শেখানো হয়েছে, সে তা বলল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম– 'তোমার চাচাত ভাই কি তোমার সামনে স্বীকার করেছে যে, সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে?'

সে বলল, 'না। আল্লাহর কসম! সে কি ভয়ে আমার সামনে সে-কথা স্বীকার করবে?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে কখনও দেখেছ? তাকে দেখলে চিনতে পারবে?'

সে বলল, 'না! না!'

এরপর আমি বললাম, 'জনাবা! আল্লাহকে ভয় করো; শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করো না। কারণ, অনেক হিংসুক আছে, যারা স্বামী-স্ত্রীর খুশি সহ্য করতে পারে না। মেয়েলোকদের যারা বিগড়ে দিতে চায়, তাদের নিকট এ ধরনের নাটকের এবং কলা-কৌশলের অভাব নেই। তারা মিথ্যাও অনেক বলে। উদাহরণ হিসেবে আমার স্ত্রীকেই দেখতে পারো। তার কাছেও কুৎসা রটানো হয়েছে যে, তাকে ছাড়াও আমি একটি বিয়ে করেছি। অথচ তার সামনে আমি কসম করে বলছি, এই দরজার বাইরে যদি আমার কোনও স্ত্রী থেকে থাকে, তা হলে তাকে তিন তালাক দিলাম।'

এ কথা শুনতেই আমার চাচাত বোন, মানে আমার প্রথম স্ত্রী উঠে এসে আমার মাথায় চুমো খেল। বলল–

'আমার এখন বিশ্বাস হয়েছে কাজি সাহেব! তোমার ব্যাপারে মিথ্যা বলা হয়েছে।'

এভাবে আমার কার্যোদ্ধার হল। আর যেহেতু এ কথা বলার সময় আমার উভয় স্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত ছিল, তাই আমার কসমও পড়েনি। [কারণ, কসম তো করা হয়েছিল দরজার বাইরে থাকা স্ত্রীর তালাকের।][২৩]

---

২৩. আখবারুল আযকিয়া, ইবনুল জাওযি : ১৬০

বদরি[২৪] সাহাবিকে ক্ষমা

নাম সারা। একজন দাসী। আবু আমর বিন সাইফি বিন হিশাম বিন আব্দে মানাফের দাসী। মক্কা হতে মদিনা এল। নবীজির দরবারে উপস্থিত হল। নবীজি ﷺ তখন মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

তাকে জিজ্ঞাসা করলেন নবীজি, 'সারা! তুমি কি হিজরত করে এসেছ?'

সে বলল, না।

জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমান হয়ে এসেছ?

সে বলল, না।

জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে কেন এসেছ?

সে বলল, আপনাদের পরিবার-পরিজন আছে; খান্দান আছে; দাস-দাসী আছে। আমি প্রচণ্ড অভাবে পড়ে আপনাদের নিকট এসেছি। আশা রাখছি, আপনাদের থেকে কিছু দান-দক্ষিণা পাব; এবং পরিধানের জন্য পোশাক পাব।

নবীজি ﷺ বললেন, মক্কার যুবকরা কি তোমার ব্যথার ঔষধ হতে পারেনি?

এই নারী গায়িকা ছিল, তাই নবীজি ﷺ এই কথা বলেছিলেন।

সে বলল, বদরের যুদ্ধের পর আমাকে দানাপানি দেওয়া হয়নি।

---

২৪. বদর যুদ্ধে যিনি অংশগ্রহণ করেছেন

এরপর নবীজি ﷺ তাকে দান করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সাহাবায়ে কিরাম দান করলেন। পোশাকেরও ব্যবস্থা করে দিলেন।

এরপর হাতেব বিন আবি বালতা'[২৫] رضي الله عنه ওই দাসীর নিকট এলেন। সীমিত-সংখ্যক সাহাবি, যারা নবীজির গোপন কার্যক্রম জানতেন, তিনিও ছিলেন তাদের একজন। দাসীর হাতে মক্কাবাসীর উদ্দেশে একটি চিঠি দিলেন। যথাস্থানে পৌঁছানোর জন্য তাকে দশ দিনার এবং কিছু চাদরও দিলেন।

হাতেব رضي الله عنه-র প্রস্তাব সারা কবুল করে চিঠিটা গ্রহণ করল। চিঠিটা ছিল এই মর্মের :

'হাতেব বিন আবি বালতা'র পক্ষ হতে মক্কাবাসী উদ্দেশ্যে। রাসুল ﷺ তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। তাই [সমব্যথী হিসেবে আমি তোমাদের নিকট এই গোপন চিঠিটি পাঠানোর সাহস করেছি।] তোমরা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নাও।'

চিঠি নিয়ে মক্কার উদ্দেশে দ্রুত রওয়ানা হল সারা। মনে মনে হয়ত কুরাইশদের নিকট হাতেবের رضي الله عنه দেওয়া অর্থ থেকেও বেশি কিছু পাওয়ার আশা করছিল সে। এই সময় জিবরাইল عليه السلام-র মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ হাতেব বিন আবু বালতা' رضي الله عنه-র গোপন বিষয়টি নবীজিকে জানিয়ে দিলেন। সাহাবিদের ডেকে নবীজি ﷺ বললেন–

'সর্বপ্রথম কাজ হল মক্কাবাসীর উদ্দেশে লেখা হাতেবের চিঠিটি হস্তগত করা। এরপর তার জন্য শাস্তি ঠিক করা যাবে। কারণ, সে আল্লাহর রাসুলের গোপন বিষয় প্রকাশ করার অপরাধ করেছে।'

[২৫].হাতেব বিন আবি বালতা' লুখামি رضي الله عنه ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি। তিনি বদরি সাহাবিও। রাসুল ﷺ-এর দূত ছিলেন তিনি। তিনি এতটা পারদর্শী তীরান্দায ছিলেন যে, তার তীরের নিশানা কখনও ভুল হত না। ৬৫ বছর বয়সে উসমান رضي الله عنه-র খেলাফতকালে তার মৃত্যু হয়।

এরপর রাসুল ﷺ আলী رضي الله عنه, আম্মার বিন ইয়াসার رضي الله عنه, যুবাইর বিন আওয়াম رضي الله عنه, তালহা رضي الله عنه, মিকদাদ বিন আসওয়াদ رضي الله عنه এবং আবু মিরসাদ লাইসি رضي الله عنه-কে [সারার পিছনে] রওয়ানা করে দিলেন। এদের সবাই ছিলেন বাহাদুর অশ্বারোহী। নবীজি ﷺ তাদের বললেন–

'যাও! রওজায়ে খাক [মদিনার বাইরে একটি জায়গার নাম।] নামক জায়গায় পৌঁছলে হাওদার ওপর বসা এক নারী পাবে। তার নিকট মুশরিকদের উদ্দেশে লেখা হাতেব বিন আবু বালতা'র চিঠি পাবে। চিঠি নিয়ে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। চিঠি দিতে অস্বীকার করলে তার গরদান কেটে দেবে।'

শাহ-সওয়ারিদের এই বাহিনী ঘোড়া হাঁকিয়ে চড়াই-উতরাই সব পেরিয়ে মহিলাটির নিকট পৌঁছলেন। নবীজির বাতলানো জায়গায়ই তাকে তারা পেলেন। ওই মহিলাকে তারা জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠি কোথায়?

কসম খেয়ে সে বলল, আমার নিকট কোনও চিঠি নেই।

তারা তার জিনিসপত্র তল্লাসী নিলেন। কিন্তু চিঠি পেলেন না। তাই তারা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। আলী رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসুল ﷺ আমাদেরকে মিথ্যা সংবাদ দেননি। এ কথা বলে আলী رضي الله عنه খোপ হতে তলোয়ার বের করে ওই দাসীকে ধমকালেন, চিঠি বের কর। নচেৎ, আল্লাহর কসম!, আমি তোমাকে উদোম করে ছাড়ব, এবং তোর গরদান উড়িয়ে দেব।'

আলী رضي الله عنه-র ক্রোধ দেখে সে বলল, আপনি আমার থেকে দূরেই থাকুন। চিঠি বের করছি।

আলী رضي الله عنه পিছনে সরে গেলেন। সে তার পোশাকের নীচ থেকে বের করে চিঠিটি শাহ-সওয়ারিদের হাতে তুলে দিল। তারা তাকে তার পথে যেতে দিলেন।

এরা নবীজির ﷺ নিকট পৌঁছলে তিনি হাতেব বিন আবু বালতা' رضي الله عنه-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে নবীজি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

'চিঠির ব্যাপারটা কি তোমার জানা আছে?'

হাতেব رضي الله عنه জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, একাজে তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ইসলাম গ্রহণের পর সেটা ছেড়ে দেওয়ার কল্পনাও আমার মধ্যে জাগেনি। আর মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে আসার পর আমার মধ্যে তাদের ভালবাসা জায়গা নিতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, আমি দেখেছি, মুহাজিরদের প্রত্যেকের কেউ না কেউ মক্কায় আছে, যারা তাদের আপনজনদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অপরিচিত। আর আমার পরিবারের লোকজন মুশরিকদের সাথে মক্কায় রয়েছে। আমার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে আমার মধ্যে ভয় জাগল। তাই আমি কুরাইশদের এই সাহায্যটি করতে চেয়েছি [যেন তারা আমার পরিবারের লোকদের রক্ষা করে।] আর এটাও আমার বিশ্বাস আছে, আল্লাহ ﷻ অবশ্যই তাদের ওপর আপনাকে বিজয়ী করবেন। আমার এই চিঠি তাদের কোনও কাজে আসবে না।'

নবীজি ﷺ হাতেব رضي الله عنه-র কথা সত্যায়ন করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

উমর رضي الله عنه বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে ছাড়ুন! এই মুনাফিকের গরদান উড়িয়ে দিই!

রাসুল ﷺ বললেন–

'তুমি কী জানো উমর! হয়ত আল্লাহ ﷻ বদরিদের বলেছেন, তোমরা যা চাও করো। তোমাদের গোনাহ আমি মাফ করে দিয়েছি।'[২৬]

আল্লাহ তায়ালা বদরীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন

[২৬] ফতহুল বারী ; তাফসিরে কুরতবি

গভর্নরের ছেলেকে তার পিতার সামনে প্রহার

উমর رضي الله عنه-র খেলাফতকালে আমর ইবনুল আস[২৭] رضي الله عنه মিশরের গভর্নর ছিলেন। মিশরের একব্যক্তি উমর رضي الله عنه-র নিকট এসে বলল–

'আমিরুল মুমেনিন! জুলুম হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাইছি।'

উমর رضي الله عنه বললেন– 'আশ্রয় দেওয়ার মত ব্যক্তির কাছেই তুমি আশ্রয় চেয়েছ।'

মিশরি ব্যক্তি বলল, আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-র ছেলের সাথে আমি দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলাম। আমি তার আগে যাওয়ার ফলে সে আমাকে কোড়া দিয়ে মারতে থাকে, আর বলতে থাকে–

'আমি হলাম অভিজাত গোত্রের সন্তান।'

এই অভিযোগ শুনে উমর رضي الله عنه মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-কে চিঠি লিখে পাঠালেন, তিনি যেন তার ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হন।

[২৭]. কুরাইশের বনু সাহম গোত্রের ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.। অষ্টম হিজরিতে তিনি ইসলাম কবুল করেন। নবীজি ﷺ তাকে উম্মান পাঠিয়েছিলেন। তার দাওয়াতের ফলে সেখানকার শাসক ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাকপটু, মিষ্টিভাষী, সুবক্তা, সুকৌশলী, রাজনীতিবিদ এবং সিপহসালার। তার থেকে ৩৯-টি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। ৪২ হিজরি নাগাদ তার মৃত্যু হয়। [এটলাসে সীরাতে নববী : ৩৮৫-৩৮৬]

আমর ইবনুল আস رضي الله عنه তার ছেলেকে নিয়ে আমিরুল মুমেনিনের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, মিশরি লোকটা কোথায়?

সে ব্যক্তি সামনে এলে তিনি বললেন–

'কোড়াটা নিয়ে তাকে মারতে থাক।'

আনাস رضي الله عنه বলেন, মিশরি লোকটি আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-র পুত্রকে কোড়া মারতে থাকে। আল্লাহর কসম! মেরেছেও অনেক। আর আমরাও চাচ্ছিলাম তাকে মারা হোক। মিশরি লোকটি তাকে এতটা প্রহার করল যে, আমরা চাইলাম, তাকে আর মারা না হোক।

উমর رضي الله عنه মিশরি লোকটিকে বলল–

'আমরের চান্দি মাথায়ও কোড়া মারো।'

মিশরি বলল, আমিরুল মুমেনিন! তার ছেলে আমাকে মেরেছে। তার থেকে বদলা নিয়েছি।

এরপর উমর رضي الله عنه আমর رضي الله عنه-র দিকে ফিরে বললেন–

'কবে থেকে তোমরা লোকদের দাস বানিয়ে রেখেছ, অথচ তাদের মা তো তাদেরকে আজাদ হিসেবেই জন্ম দিয়েছে?'

আমর ইবনুল আস رضي الله عنه বললেন–

'আমিরুল মুমেনিন! বিষয়টি আমার জানা ছিল না। আর অভিযোগ নিয়ে এই ব্যক্তি আমার নিকট আসেওনি।'[২৮]

---

[২৮]. হায়াতুস্‌সাহাবা : মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী : ২/৩৩৮

কাজি আবু ইউসুফ رحمه الله-র সত্যকথন

ইমাম আবু হানিফা رحمه الله-র শাগরেদ কাজি আবু ইউসুফের নিকট খলিফা হারুনুর রশিদের পক্ষ হতে সাক্ষী হিসেবে ফযল বিন রবি'[২৯] উপস্থিত হলেন। কিন্তু কাজি সাহেব তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না।

খলিফা হারুনুর রশিদ জিজ্ঞাসা করলেন, ফযলের সাক্ষ্য আপনি গ্রহণ করলেন না কেন?

তিনি বললেন, আমি একদিন তাকে আপনার মজলিসে বলতে শুনেছি যে, সে আপনার গোলাম। সে যদি সত্য বলে থাকে, তা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তার উক্তিমতে সে গোলাম। আর যদি মিথ্যা বলে থাকে, তা হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, আপনার মজলিসে মিথ্যা বলতে যখন তার বাধল না, তখন কাজির দরবারেও মিথ্যা বলতে বাধবে না।

এই কথা শুনে খলিফা কাজি আবু ইউসুফ রহ.কে সমর্থন করলেন।

---

[২৯]. ইনি হলেন ফযল বিন রবি' বিন ইউনুস বিন মুহাম্মদ, যিনি হারুন রশিদ এবং মুহাম্মদ আমিনের উজির ছিলেন। তার পিতা ছিলেন মনসুর এবং মাহদির উজির। ১৪০ হিজরিতে তার জন্ম হয় এবং ২০৭ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [তারিখে বাগদাদ : ১২/৩৪৩-৩৪৪]

উমর বিন আব্দুল আজিজের দৃষ্টিতে মজলুমের মূল্য

খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ[৩০] হিমসের বাজারে ঘুরাফেরা করছিলেন। এই সময় একব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হল। তার দেহে কারুকার্য করা চাদর শোভা পাচ্ছিল। সে বলল, আমিরুল মুমেনিন! আপনার নির্দেশ, কেউ যদি অত্যাচারের শিকার হয় তা হলে আপনার নিকট উপস্থিত হবে?

উমর বিন আব্দুল আজিজ বললেন, হ্যাঁ।

সে বলল, তা হলে আপনার নিকট অনেক দূরের এলাকা হতে এক মজলুম এসেছে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ জিজ্ঞাসা করলেন–

---

৩০. উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله ছিলেন খলিফা আব্দুল মালেকের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। তার মাতা উম্মে আসেম ছিলেন উমর رضي الله عنه-র দৌহিত্রী। তার পিতা আব্দুল আজিজ ২১ বছর পর্যন্ত মিসরের গভর্নর ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله-কে ওলিদ মদিনার গভর্নর নিয়োগ করেন। ৯৯ হিজরিতে খলিফা আব্দুল মালেকের মৃত্যুর তার ওসিয়্যত অনুযায়ী উমর বিন আব্দুল আজিজ খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। উমাইয়া শাসকদের হাতে লুণ্ঠিত জায়গির তিনি প্রকৃত পাওনাদারদের ফিরিয়ে দেন। বাইতুল মালের ব্যয়ের খাতও তিনি সংশোধন করেন। আলী رضي الله عنه-র শানে খুতবায় অসমীচীন ও অশালীন শব্দের ব্যবহার বন্ধ করে দেন। ১০১ হিজরিতে উমাইয়া নেতৃবর্গের চক্রান্তে তিনি বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন। [তারিখে ইসলাম, শাহ মুঈনুদ্দিন আহমদ নদভী : ৫২৫-৫৪৬]

তুমি কোন গোত্রের?

সে বলল, আবয়ান [ইয়ামানের একটি প্রদেশ।]

উমর বিন আব্দুল আজিজ বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার গোত্র উমরের গোত্র হতে অনেক দূরের।

এ কথা বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়ারি থেকে নেমে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ওপর কীরকম জুলুম করা হয়েছে?

সে বলল, আমার শস্য উৎপাদনের জমিটি একব্যক্তি অন্যায়ভাবে কব্জা করে রেখেছে। সেখান থেকে আমাকে পুরোপুরি বেদখল করে দিয়েছে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله এই ঘটনা শুনে উরওয়া বিন মুহাম্মদকে লিখে পাঠালেন, সে যেন এই মজলুমের ঘটনা এবং সাক্ষ্য শোনে। তার হক প্রমাণ হলে তাকে যেন তার জমিন ফিরিয়ে দেয়।

চিঠিটি লিখে তিনি মোহর লাগিয়ে দিলেন।

পরদেশি লোকটা ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে গেলে উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله তাকে বললেন–

দাঁড়াও! অনেক দূর থেকে এসেছ তুমি। রাস্তায় তোমার কী পরিমাণ ব্যয় হয়েছে? সওয়ারির ভাড়া কত লেগেছে? কত কাপড় বদল করতে হয়েছে?

সে-সব হিসাব লাগানো হল। পনেরো দিনারের মত হয়েছে। উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله এই অর্থ দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

হত্যামামলার আসামী'র সত্তা প্রসঙ্গে

খুনের আসামী গ্রাম্যব্যক্তির জামানত

আমিরুল মুমেনিন উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه মজলিসে বসা ছিলেন। এ সময় এক গ্রাম্যব্যক্তিকে নিয়ে দুই যুবক তার দরবারে উপস্থিত হল।

আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

তারা বলল, আমিরুল মুমেনিন! এই লোকটা আমাদের পিতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, এদের পিতাকে তুমি কীভাবে হত্যা করলে?

গ্রাম্যলোকটি জবাবে বলল, সে তার উট আমার জমিনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে তা মানতে চাইল না। তাই একটি পাথর ছুড়ে মারলাম। সেটা তার মাথায় লাগল। এতেই সে মারা গেল।

গ্রাম্যলোকটার কথা শুনে উমর رضي الله عنه বললেন, কিসাস! কিসাস! [খুনের বদলা খুন।]

কোনও অঙ্গীকারনামা লেখা হয়নি। বরং ফয়সালা এমন ছিল, যেন কোনও চিন্তাভাবনারও দরকার ছিল না।

উমর رضي الله عنه ওই লোকটার গোত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেননি যে, সে কোন গোত্রের লোক। সে কি কোনও সম্ভ্রান্ত গোত্রের? তার গোত্র কি শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধর? সমাজে তার মর্যাদা কীরূপ? ইত্যাদি কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি তিনি।

এসব বিষয়কে দেখার যোগ্যও মনে করেননি তিনি। তা নিয়ে তার মনে কোনও চিন্তাও জাগেনি। কারণ, আল্লাহ جل جلاله-র দীনের ব্যাপারে তিনি কোনওকিছুর পরওয়াও করতেন না, বা শরিয়তের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে কারও সাথে কোনও নম্র আচরণও করতেন না।

গ্রাম্যলোকটি বলল, আমিরুল মুমেনিন! যে সত্তার নির্দেশে আসমান ও জমিন সৃষ্টি, সে সত্তার উসিলা দিয়ে বলছি, আমাকে শুধু একটি রাতের জন্য ছেড়ে দিন। তা হলে গ্রামে গিয়ে আমার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করে আসতে পারব। তাদের বলে আসতে পারব, আমাকে শীঘ্রই হত্যা করা হবে। তা জানিয়েই আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হব। আল্লাহর কসম! আল্লাহ جل جلاله-র পর আমি ছাড়া আমার সন্তানদের দেখার মত আর কেউ নেই।

আমিরুল মুমেনিন বললেন, গ্রামে গিয়ে তুমি ফিরে আসবে, এর জামানত দেবে কে?

আমিরুল মুমেনিমের কথা শুনে উপস্থিত লোকজন সবাই নীরব হয়ে গেল। কারণ, তাদের কেউ এই গ্রাম্যলোকটার নামও জানত না; গোত্র বা বাড়িও জানত না। এমতাবস্থায় কে তার ফিরে আসার জামানত দিতে যাবে? আর জামানতও যেমন-তেমন নয় যে, দশ বিশ দিনার দিয়ে কিংবা উট-ঘোড়া সহায়-সম্পত্তি দিয়ে মুক্তি পাওয়া যাবে। বরং এটা ছিল গরদানের জামানত–যদি গ্রাম্যলোকটা ফিরে তো ভাল; নচেৎ তলোয়ার দিয়ে জামানতদারে ঘাড় উড়িয়ে দেওয়া হবে।

শরিয়তে ইসলামের কানুন বাস্তবায়ন রহিত করতে কে আসবে উমরের সামনে? হুদুদে ইলাহির সুপারিশ করার সাহস আছে কার? ইবনে খাত্তাবের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে কে?

সকল সাহাবি চুপ হয়ে গেলেন। চারদিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে রইল। মাথা নত করে রইলেন সবাই। আমিরুল মুমেনিনও বেশ ও প্রভাবিত ছিলেন। একটি জটিলতায় ফেঁসে গেছেন তিনি–এখন কী করা? একে হত্যা করে দেবেন, আর তার সন্তানাদি গ্রামে না খেয়ে মারা যাবে? না

কি তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেবেন। সে ক্ষেত্রে সে যদি ফেরত না আসে, তা হলে নিহতের কিসাস অনাদায়ই থেকে যাবে।

পুরো মজলিস নীরব। কিছুক্ষণ মাথা নত রাখলেন আমিরুল মুমেনিন। এরপর মাথা তুলে বললেন–

'তোমরা দুজন কি এই হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে পারো?'

তারা দুজনই বলল, না। আমাদের পিতার হত্যাকারীকে তার কর্মের পরিণতির শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়ে ছাড়ব না, আমিরুল মুমেনিন!

উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে আমিরুল মুমেনিন বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের থেকে কে এই গ্রাম্যলোকটির জামানত দিতে পারে?

লোকসমাগম থেকে একটি আওয়াজ এল, হ্যাঁ আমিরুল মুমেনিন! আমি এর জামানত দিচ্ছি।

এই আওয়াজটি একজন বুযুর্গ ও মুত্তাকির। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি আবু যর গিফারি ﵁।[৩১]

উমর ﵁ বললেন, এটা কতলের জামানত; কতলের!

আবু যর গিফারি ﵁ বললেন, কতলের জামানত হলেও।

উমর ﵁ বললেন, এই গ্রাম্যলোকটিকে কি আপনি আগ থেকেই চেনেন?

তিনি বললেন, এর আগে তার সাথে আমার পরিচয় হয়নি।

---

৩১. আবু যর রাযি. ছিলেন বনু কেনানার শাখাগোত্র বনু গেফারের। তার নাম ছিল জুন্দুব বা বুরাইর বিন জুনাদা। একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন তিনি। ইসলামে চতুর্থ বা পঞ্চম মুসলমান ছিলেন তিনি। নবীজির ﷺ হিজরতের পর তিনি মদিনায় আগমন করেন। ৩১ বা ৩২ হিজরিতে রাবাযায় তার মৃত্যু ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-র তার জানাযার সালাত পড়ান। [উসদুল গাবা : ৬/৯৬]

আমিরুল মুমেনিন বললেন, তা হলে কীসের ওপর ভিত্তি করে আপনি তার জামানত দিচ্ছেন?

আবু যর গিফারি ﵁ বললেন, তার মধ্যে আমি মুমিনের আলামত দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি ধারণা করে নিয়েছি, সে মিথ্যে বলছে না। ইনশা-আল্লাহ, সে অবশ্যই ফিরে আসবে।
আমিরুল মুমেনিন বললেন, আবু যর! আপনি কি এই ধারণা করছেন যে, এই ব্যক্তি ফেরত আসতে যদি তিন দিনের বেশি বিলম্ব করে ফেলে, তা হলে আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে? এবং আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে?

আবু যর গিফারি ﵁ বললেন, আমিরুল মুমেনিন! সাহায্য আল্লাহ ﷻ-র নিকটই চাওয়া হয়।

আমিরুল মুমেনিন উমর ﵁ তাকে তিন দিনের অবকাশ দিলেন। এর মধ্যে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে শেষবারের মত কথাবার্তা বলে আসবে। আর সম্ভব হলে কারও ওপর তাদের দায়িত্ব অর্পণ করবে।

অনুমতি পেয়ে গ্রাম্যলোকটি তার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হল।

তৃতীয় দিন যখন গ্রাম্যব্যক্তি উপস্থিত হল না, তখন আমিরুল মুমেনিন আসরের সালাতের ঘোষণা করালেন।

কিসাসের দাবিদার দুই ভাইও সেখানে উপস্থিত হল। লোকজনের ভীড় লেগে গেল। আবু যর গিফারি ﵁ও এলেন। উমর ﵁-র সামনে বসে গেলেন।

উমর ﵁ জিজ্ঞাসা করলেন, গ্রাম্যলোকটি কোথায়?

আবু যর ﵁ বললেন, আমার জানা নেই।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলেন আবু যর ﵁। দ্রুত ঢলে যাচ্ছে। সাহাবায়ে কিরামও হতভম্ব হয়ে নীরবে মাথা নত করে বসে রইলেন। তাদের মনের অবস্থা কী ছিল, তা একমাত্র আল্লাহ ﷻই জানতেন।
এ কথাও ঠিক, উমর ﵁-র মনে আবু যর গিফারি ﵁-র যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হল শরিয়তের। আল্লাহ ﷻ-র

আইনের ব্যাপার। তা নিয়ে খেলা করা যায় না। বা মানুষের মর্যাদা হিসেবে সেখানে বিভেদও সৃষ্টি করা যায় না। তা হলে শরিয়ত আর শরিয়তের রূপ নিয়ে থাকবে না–বিকৃত হয়ে যাবে। তা ছাড়া পাত্র ও পরিস্থিতি ডিঙ্গিয়ে শাস্তি কার্যকর করা যায় না। একজনের জায়গায় অন্যজনকেও হত্যা করা যায় না।

সূর্য ডুবো ডুবো অবস্থা। তেজ হারানোর ফলে সূর্যের লাল দেহটা খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে। ক্ষণেক পরই অস্ত যাবে। এই সময় দূরে এক আকৃতি দেখা গেল। তা দেখতে পেয়েই উমর ﷺ সজোরে তাকবির বলে উঠলেন। দ্রুত পায়ে মজলিসে এসে উপস্থিত হল গ্রাম্যলোকটি।

উমর ﷺ বললেন–

'হে ব্যক্তি! তুমি যদি তোমার গ্রামেই থেকে যেতে, তা হলে আমরা তোমাকে চিনতাম না। আর তোমার বাড়ি কোথায়, তাও আমরা জানতাম না।'

জবাবে গ্রাম্যলোকটি বলল–

'আল্লাহর কসম! আমার ওপর আপনার কোনও চাপ নেই। আমি তো সেই আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করছি, যিনি সকল গোপন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও জানেন।'

নিহতের দুই পুত্রকে লক্ষ করে আমিরুল মুমেনিন বললেন,

তোমাদের কী মত?

তারা বলল–

হে আমিরুল মুমেনিন! এই গ্রাম্যলোকটার সততার কারণে আমরা তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।

আমিরুল মুমেনিন উঁচু আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

নিজেকে বেঁধে নিলেন মসজিদের খুঁটিতে

বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবীজি ﷺ যখন তাদের অবরোধ করলেন, তখন তাদের সাথে আলোচনা করার জন্য এই ইয়াহুদিদের দুর্গে আবু লুবাবা রিফা'আ বিন আব্দুল মুনযির ﷺ-কে[৩২] পাঠালেন। হয়ত তারা আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবে।

তিনি যখন ভেতরে গেলেন তখন সেখানকার বাচ্চা-বুড়ো-নারী সবাই কাঁদছিল। ইয়াহুদিরা আবু লুবাবা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, রাসুল ﷺ আমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবেন?

তিনি তার গরদানের দিকে ইশারা করলেন। [রাসুল ﷺ তোমাদের কতল করবেন।]

---

৩২. ইবনে হিশামের বর্ণনামতে আবু লুবাবা রিফা'আর নাম ছিল বশির। বাইয়াতে আকাবার সময় নবীজি ﷺ তাকে নকীব নিযুক্ত করেন। বদরের যুদ্ধ এবং সুয়াইকের যুদ্ধের সময় তাকে তিনি মদিনায় তার দায়িত্বে রেখে যান। উহুদ এবং পরবর্তী সবগুলো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু আমর ইবনুল আউফের পতাকা তিনি বহন করেন। তাবুকের যুদ্ধের সময় কয়েকজনের সাথে তিনিও পশ্চাতে থেকে যান। পরবর্তীতে লজ্জিত হয়ে তিনি নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। পরবর্তীতে সূরা তাওবার ১০২ আয়াতে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়। আলী ﷺ-র খেলাফতকালে তার মৃত্যু হয়।

এরপর তিনি দুর্গ হতে বের হওয়ার সাথে সাথে তার মনে জাগল–রাসুল ﷺ-এর গোপন বিষয় আমি ফাঁস করে দিয়েছি। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের সাথে খিয়ানত করেছি। এই কথা তার মনে জাগার সাথে সাথেই তিনি মসজিদে নববীতে এসে একটি খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন, এবং বললেন–

'আল্লাহর কসম! আমি নিজেকে ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না, এবং পানাহারও করব না, যতক্ষণ না আল্লাহ ﷻ আমাকে ক্ষমা করে দেন।'

সাত দিন পর্যন্ত আবু লুবাবা رضي الله عنه কোনওকিছু খানওনি; পানও করেননি। খুঁটির সাথেই বাঁধা রইলেন। সালাতের সময় এবং মানবীয় প্রয়োজনের সময় তার মেয়ে এসে তাকে খুলে দিত।

ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করতে না পেরে একদিন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ ﷻ তার তাওবা কবুল করলেন। লোকজন তাকে তার তাওবা কবুল হওয়ার সংবাদ দিতে এলে তিনি বললেন–

'আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে জিঞ্জির থেকে মুক্ত করব না, যতক্ষণ না রাসুল ﷺ নিজে খুলে দেন।'

রাসুল ﷺ এসে তার জিঞ্জির খুলে দিলেন।[৩৩]

৩৩. দেখুন, উসদুল গাবা : ৬/২৬১ ; তারিখুল ইসলাম : ১/৩৪৩

গুপ্তচরবৃত্তির পরিণতি হল হত্যা

আয়াস বিন সালামা বিন আকওয়া'[৩৪] তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন–

মুশরিকদের এক গুপ্তচর রাসুল ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি এক জায়গায় তাবু ফেলে অবস্থান করছিলেন। সেই গুপ্তচর মুসলমানদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকল এবং [খানা ইত্যাদি খেয়ে] গোপনে সটকে পড়ল।

রাসুল ﷺ বললেন–

'তাকে খোঁজ করে মেরে ফেল।'

রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ শুনেই লোকজন ওই চরের পিছনে ধাওয়া করল। আমার পিতা [সালামা] দৌড়ে গিয়ে সবার আগে গুপ্তচরের উটনীর লাগাম ধরলেন। আর তাকে সেখানেই মেরে ফেললেন। পরে রাসুল ﷺ ওই [গুপ্তচর] লোকটার সকল জিনিসপত্র আমার পিতাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন।[৩৫]

৩৪. বাইয়াতে রেদওয়ানের সময় সালামা বিন আকওয়া' رضي الله عنه দু'বার বাইয়াত হন। যি-কিরাদের যুদ্ধ-সহ তিনি সাতটি যুদ্ধে অংশ নেন। ইবনে ইসহাকের উক্তিমতে, তিনি নেকড়ের সাথে কথোপকথন করেছিলেন। তিনি মদিনায় বসবাস করেন। এবং উসমান رضي الله عنه-র শাহাদতের পর রাবাযায় চলে যান। ৭৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ২/৫১৭]

৩৫. আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি ﷺ ১/২২৫ ; বুখারি : হাদিস ৩০৫১ ; মুসলিম : হাদিস ১৭৫৪

সামান্য মুসলমানও নিরাপত্তা দিতে পারে

মক্কা বিজয়ের কয়েক দিন আগের কথা। রাসুল ﷺ-এর জামাতা আবুল আস[৩৬] বিন রবি' বিন আব্দুল উয্যা ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরাইশদের একটি দলের সাথে শাম গেলেন। তার সাথে কুরাইশদের মালও ছিল। শাম থেকে ফেরার পথে রাসুল ﷺ-এর পাঠানো একটি ছোট সেনাদল আবুল আস এবং তার সঙ্গীদের পথ আগলে দাঁড়াল। এদের আমির ছিলেন যায়দ বিন হারেসা رضي الله عنه। মুসলমানরা কুরাইশদের সমস্ত মাল ছিনিয়ে নিলেন। ব্যবসায়ী দলের কয়েকজনকে বন্দীও করলেন। তবে আবুল আস পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

মাল নেওয়ার জন্য তিনি রাতের বেলায় তার স্ত্রী এবং রাসুল ﷺ-এর কন্যা যয়নব رضي الله عنها-র ঘর পৌঁছলেন এবং তার নিকট আশ্রয় চাইলেন। তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন।

৩৬.আবুল আসের প্রপিতামহ ছিল আব্দে শামস বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাঈ। এ হিসেবে চতুর্থ পুরুষে গিয়ে রাসুল ﷺ-এর সাথে তার বংশ-পরম্পরার মিল হয়ে যায়। তার মা হালা ছিলেন খাদিজা رضي الله عنها-র সহোদরা বোন। নবুওয়্যতলাভের পূর্বেই তার বড় মেয়ে যয়নব رضي الله عنها-কে তার সাথে বিয়ে দেন। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ হয়ে আবুল আস অংশ নেন এবং মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাকে এ শর্তে নবীজি ﷺ মুক্ত করে দেন যে, মক্কা গিয়ে তিনি যয়নব رضي الله عنها-কে মদিনা পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আস তার এ ওয়াদা পূরণ করেন। যয়নব থেকে তার ছেলে আলী رضي الله عنه এবং মেয়ে উমামা رضي الله عنها-র জন্ম হয়। ১২ হিজরিতের আবুল আস رضي الله عنه-র মৃত্যু হয়। এর আগেই যয়নব رضي الله عنها মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ৬/১৮২-১৮৩]

রাসুল ﷺ সালাত শুরুর জন্য 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তখন যয়নব رضي الله عنها মহিলাদের কাতার থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন–

'লোকজন! জেনে রাখ। আমি আবুল আস বিন রবি'কে নিরাপত্তা দিয়েছি।'

সালাত শেষ করে রাসুল ﷺ সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন–

'আমি যা শুনেছি, তোমরাও কি তা শুনেছ?'

সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হ্যাঁ।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করলেন–

'কসম সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! এই ব্যাপারে আমার কিছুই জানা ছিল না। [যে আমার মেয়ে আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছে।] তোমাদের সাথেই আমি বিষয়টি জানতে পেরেছি।'

এরপর বললেন–

'সামান্য থেকে সামান্যতম মুসলমানও [কাউকে] আশ্রয় দিতে পারে।'

এরপর রাসুল ﷺ তার মেয়ে যয়নব رضي الله عنها-র নিকট গিয়ে বললেন–

'আবুল আসের থাকার জন্য ভালভাবে আয়োজন করো। কিন্তু সে যেন তোমার নিকট না আসে। কারণ, তুমি তার জন্য হালাল নও। [কারণ, সে কাফের; আর তুমি মুসলমান।]

যয়নব রাযি. রাসুল ﷺ-কে জানালেন যে, আবুল আস তার সম্পদ চাওয়ার জন্য এসেছে।

যারা সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তাদের সমবেত করে রাসুল ﷺ বললেন–

'এই ব্যক্তি [আবুল আস] যে আমাদের আত্মীয়, তা তোমাদের জানা আছে। তোমরা তার মাল ছিনিয়ে নিয়েছ, যা আল্লাহ ﷻ তোমাদেরকে গনিমত হিসেবে দিয়েছেন। আমি চাই, তোমরা তার ওপর অনুগ্রহ করো, এবং তাকে তার মাল ফিরিয়ে দাও। এটা আমার একটা প্রস্তাব

মাত্র। তোমরা যদি তা অস্বীকার করো, তবে জেনে রাখো, এই মালে তোমরাই বেশি হকদার।'

সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, না; হে আল্লাহর রাসুল! [আমরা এই প্রস্তাবটিকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়ে] তার মাল তাকে ফেরত দিচ্ছি।

তারা পুরো মাল আবুল আসকে ফেরত দিলেন। এই মাল নিয়ে আবুল আস মক্কায় ফিরে গেলেন। প্রত্যেকের মাল তার নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। কুরাইশরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল–

'আল্লাহ ﷻ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি যে বিশ্বস্ত ও শালীন, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই।'

এরপর আবুল আস রাযি. কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হলেন। কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললেন–

'আল্লাহর কসম! [মদিনায় নবীজির দরবারে] আমার মুসলমান হওয়ার একমাত্র বাধা ছিল এই সন্দেহ যে, তোমরা হয়ত আমার ব্যাপারে ভাববে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করব।'

এরপর তিনি মদিনায় ফিরে এলেন। আগের বিয়ের ওপর ভিত্তি করেই রাসুল ﷺ তার নিকট তার মেয়ে যয়নবকে ফিরিয়ে দিলেন।[৩৭]

---

৩৭. উসদুল গাবা : ৬০৪২ ; সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬৫৭ ; বায়হাকি : ৯/৯৫ ; হাকেম : ৪/৪৫ ; মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ : ৫/৩৩০

দানিয়াল عليه السلام-র ফয়সালা

আলী رضي الله عنه-র বর্ণনা। দানিয়াল عليه السلام ইয়াতিম ছিলেন। তার পিতামাতা ছিল না। বনি ইসরাইলের এক মহিলা তাকে লালনপালন করেন। সে-কালে বনি ইসরাইলের এক বাদশাহ ছিলেন। তার দুজন কাজি ছিল। আর ওই মহিলাটি ছিল খুবই রূপসী, সুন্দরী এবং প্রভাবশালী। বাদশাহর নিকট সে মাঝেমধ্যে আসত এবং তাকে নসিহত করত।

ওই মহিলার আসা-যাওয়া কাজি-দুজনের চোখে পড়ল। মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখতে লাগল। তাদের মনে তার ভালবাসা সৃষ্টি হল। ভেতরে ভেতরে জানেপ্রাণে তাকে চাইতে লাগল। সুযোগ পেয়ে একবার তারা তাদের মনের কথা তার নিকট প্রকাশও করল। তাকে বিশ্বাস করাতে চাইল যে, তারা তাকে মনেপ্রাণে ভালবাসে এবং চায়। আর তাদের আশা, সে তাদের ভালবাসা কবুল করবে। কিন্তু সেই পবিত্র নারী তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। বিভিন্নভাবে তারা তাকে ফুসলাতে চেস্টা করল। তাদের মিথ্যা ভালবাসার জালে আটকাতে চেস্টা করল। কিন্তু সফল হল না।

তারা যখন দেখল, এই সুন্দরী রমণী কোনওভাবেই তাদের হাতে আসছে না, তখন তারা ক্রুদ্ধ হল। বাদশাহর নিকট অভিযোগ করল, যে মহিলা আপনাকে নসিহত করার জন্য আসে, সে ব্যভিচারের মত বিরাট একটি অপরাধ করেছে।

কাজি দুজনের সাক্ষ্য শুনে বাদশাহ সংকটে পড়ে গেলেন। মনে বড় ব্যথাও পেলেন। কারণ, ওই মহিলার শালীনতা ও আভিজাত্যবোধ তার মনে দাগ কেটেছিল। কিন্তু কাজিদের সাক্ষ্যও তো মিথ্যা বলা যায় না।

কাজিদের সাক্ষ্যের পর প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধানের ততটা প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। বললেন, তোমাদের দুজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এরপর বাদশাহ ওই মহিলাকে তিন দিনের অবকাশ দিলেন। এরপর তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ করলেন। শহরেও ঘোষণা করে দেওয়া হল–অমুক মহিলাকে অমুক দিন প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তা দেখার জন্য সবাই যেন উপস্থিত হয়।

প্রস্তারাঘাতে হত্যার হুকুম দিলেও বাদশাহ ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির ছিলেন। তার এক নির্ভরযোগ্য উজিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনওভাবে কি এই মহিলাকে বাঁচানো যায় না?

উজির বলল, শহরে যখন প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যার ঘোষণা হয়ে গেছে, আর এই ফয়সালাও হয়েছে আপনার নিকটবর্তী দুই কাজির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, তা হলে এই হুকুম রদ করার কোন কারণ থাকতে পারে?

তৃতীয় দিন, যেদিন ওই নারীর প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যার দিন ছিল, বাদশাহর ওই নির্ভরযোগ্য উজির বাড়ি হতে বের হয়ে দেখতে পেল, কয়েকটি বাচ্চা খেলা করছে। তাদের মধ্যে দানিয়াল ﷺ ও ছিলেন। দানিয়াল ﷺ-কে উজির চিনত না। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখতে লাগল। বাচ্চাদের একত্রিত করে দানিয়াল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের বাদশাহ হচ্ছি। আর তুমি যুহদ ও তাকওয়ার প্রতিমা একজন নারী সেজে যাও। আর দু' বাচ্চাকে দু' কাজি বানিয়ে বললেন, তোমরা দুজন আমার আদালতে এই মহিলার বিরুধ্বে সাক্ষ্য দেবে। এরপর নিজেই মাটির স্তুপ জমা করে সেটার ওপর বসে পড়লেন। হাতে কাঠের একটি তলোয়ার নিলেন। এখন পরিবেশ একটি আদালতের রূপ নিয়েছে। দুই বালক দুই কাজির রূপে ছিল। আর ওই ছেলেটি ছিল মহিলার রূপে; সামনে দাঁড়ানো।

দানিয়াল ﷺ অন্য বালকদের বললেন, এক কাজির হাত ধরে দূরে নিয়ে যেতে। তারা চলে গেলে অপর কাজিকে ডেকে কঠোরভাবে বললেন, সত্য সত্য বল। নচেৎ তোকে হত্যা করা হবে। কীসের ভিত্তিতে তুই ওই মহিলার বিরুধ্বে সাক্ষ্য দিচ্ছিস?

কাজি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই মহিলা ব্যভিচার করেছে।

দানিয়াল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কবে?

শিশু কাজি বলল, অমুক দিন।

দানিয়াল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কোন পুরুষের সাথে ব্যভিচার করেছে?

শিশু কাজি জবাবে বলল, অমুকের পুত্র অমুকের সাথে।

দানিয়াল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জায়গায়?

শিশু কাজি জবাব দিল, অমুক জায়গায়।

বালকদের দানিয়াল ﷺ বললেন, এই কাজিকে নিয়ে যাও। অপর কাজিকে নিয়ে এসো। বালকরা তাই করল। দ্বিতীয় কাজিকে দানিয়াল ﷺ তা-ই জিজ্ঞাসা করলেন, যা প্রথম কাজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কাজির জবাব ছিল অন্য রকম। দানিয়াল ﷺ উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন।

বাদশাহর নির্ভরযোগ্য উজির, যে এই দৃশ্য দেখছিল, সময় ব্যয় না করে বাদশাহর নিকট উপস্থিত হল। বাচ্চাদের যে খেলতামাশা দেখেছে, বাদশাহকে তা শোনাল। বাদশাহর বুদ্ধি খুলল। দানিয়াল ﷺ-র মত তিনিও কাজিদের আলাদা আলাদাভাবে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাদের দুজনের বর্ণনায় অমিল পাওয়া গেল। তাই বাদশাহ ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, কাজিদের হত্যাদৃশ্য দেখার জন্য লোকজন যেন অমুক ময়দানে উপস্থিত হয়। এরপর জনগণের সামনে কাজিদেরকে তাদের কর্মফল দেওয়া হল। আর ওই পবিত্র নারীকে সসম্মানে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।[৩৮]

---

৩৮. দেখুন, আত্তুরুকুল হিকামিয়্যা ফিস্সিয়াসাতিস্শর'য়িয়্যা, ইবনুল কাইয়্যেম : ৮০

টীকা : ঘটনাটি হাফেজ ইবনে কাইয়্যেমের উল্লিখিত কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে। দানিয়ালের নামের সাথে এমন কোনও উপাধি ছিল না, যদ্দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি নবী ছিলেন। তিনি শুধু দানিয়াল নামটাই লিখেছিলেন। ইবনে কাসির রহ. আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া কিতাবে উল্লেখ করেন, দানিয়াল ﷺ নবী ছিলেন। কারও কারও মতে, তিনি নবী ছিলেন না; বরং একজন ওলি ছিলেন।

অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতি

বদরের যুদ্ধে যে সত্তুর জনকে বন্দী করা হয়েছিল, তাদের একজন ছিল আবু ইয়্যা আমর বিন আব্দুল্লাহ। সে ছিল কবি। অভাবগ্রস্ত এবং কয়েক সন্তানের জনক। রাসুল ﷺ-এর নিকট সে আবেদন করল–

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার অবস্থা তো আপনার অজানা নয়। আমি যে একজন অভাবী এবং কয়েক সন্তানের জনক, তাও আপনার জানা। তাই আপনার নিকট আমার আবেদন, আমাকে অনুগ্রহ করুন। [এবং আমাকে মুক্ত করে দিন।]'

সে এ-ও বলেছিল–

'আমি তো [মুসলমানদের বিরুদ্ধে এজন্য] নেমেছি যে, আমার সন্তানদের জন্য খাওয়ার কিছু পাওয়া যাবে।'

তার অনুনয়-বিনয় দেখে রাসুল ﷺ তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর তার থেকে এই অঙ্গীকার নিলেন যে, সে আর কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসবে না।

কিন্তু সে তার অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। উহুদের যুদ্ধেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে এল। রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে সে মুশরিকদের অনেক উত্তেজনা ও প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং কবিতা বলেছিল। ঘটনাক্রমে উহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের হাতে সে ধরা পড়ে এবং বন্দী হয়। ওই যুদ্ধে মাত্র একজন বন্দী মুসলমানদের হাতে আসে; আর সে-বন্দী ছিল সে।

এই দুর্ভাগাকে যখন রাসুল ﷺ-এর সামনে উপস্থিত করা হল, তখনও সে রাসুল ﷺ-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল–

'আমার ওপর অনুগ্রহ করুন!' [এবং আমাকে ছেড়ে দিন।]

কিন্তু এবার রাসুল ﷺ তার কথা কানে নেননি; বরং বললেন–

'মুমিন এক গর্তে দুবার দংশন হয় না। [আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না। তা হলে] তুমি মক্কায় গিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দম্ভভরে বলবে, আমি মুহাম্মদকে দুবার ধোঁকা দিয়েছি।'

এরপর রাসুল ﷺ-এর নির্দেশে তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করা হয়।[৩৯]

---

[৩৯]. আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি ﷺ : ১/২৪০ ; সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬৬০ হাদিসের অংশটি বুখারি : হাদিস ৬১৩৩ এবং মুসলিম : হাদিস ২৯৯৮-এ-ও আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালা

উরওয়া[৪০] বিন যুবাইর رضي الله عنه-র বর্ণনা। উবাই বিন খলফ মক্কায় এ শপথ করে রেখেছিল যে, রাসুল ﷺ-কে সে অবশ্যই হত্যা করবে। তার এই শপথ সম্বন্ধে জানতে পেরে রাসুল ﷺ বললেন–

'বরং আমিই তাকে হত্যা করব, ইনশা-আল্লাহ।'

উহুদের যুদ্ধের দিন মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোহার পোশাক পরিধান করে উবাই বিন খলফ মাঠে নামল। বলল–

'আমি যদি বেঁচে যাই, তা হলে মুহাম্মদ বাঁচতে পারবে না।'

এরপর হঠাৎ করে সে রাসুল ﷺ-এর ওপর আক্রমণ করল। এদিকে মুসআব বিন উমায়ের رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর সামনে লোহার প্রাচীরের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার দেহে এতগুলো আঘাত লাগে যে, একসময় তিনি শহিদ হয়ে পড়ে যান। এর মধ্যে রাসুল ﷺ উবাই-এর মাথার টোপ এবং দেহের বর্মের মধ্যখানে হাসলি দেখতে পেলেন। সেখানেই নেযা ঢুকিয়ে দিলেন। উবাই বিন খলফ তার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। নেযার আঘাতে সামান্য চোট লেগেছিল–এমনকি

---

৪০. উরওয়া ছিলেন যুবাইর বিন আওয়াম رضي الله عنه এবং আসমা বিনতে ফাতেমা رضي الله عنها-র পুত্র। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه ছিলেন তার সহোদর ভাই। উরওয়া ছিলেন মদিনার প্রসিদ্ধ সাত ফকিহ-র একজন। ২২ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৩ হিজরিতে রাবাযার নিকটবর্তী ফুরা' নামক এক জায়গায় তার মৃত্যু হয়। [ওফিয়াতুল আ'ইয়ান : ৩/৪১৬-৪১৮]

রক্তও বের হয়নি। তার সাথিরা এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। সে ষাঁড়ের মত চিৎকার করতে লাগল। তার সাথিরা বলল–

'কীসের ভয়ে তুমি এভাবে চিৎকার করছ? এটা সামান্য চোট মাত্র।'

সে তার সাথিদের বলল–

'কসম সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! এই কষ্ট, যা আমি এখন ভোগ করছি, যদি যুলমাজাযের[৪১] লোকদের হত, তা হলে তাদের সবাই মারা পড়ত।'[৪২]

কোনও কোনও বর্ণনায় রয়েছে, উবাই বিন খলফের সাথিরা যখন তাকে বলল, তুমি এত চিৎকার করছ কেন? তুমি তো সামান্য আহত হয়েছ মাত্র। জবাবে সে তার সাথিদের বলল, তোমাদের স্মরণ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আমাকে হত্যা করার কথা বলেছিল। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ যদি আমার ওপর থুতুও ফেলত, তা হলেও আমি মারা যেতাম।[৪৩]

এরপর আল্লাহর এই দুশমন সরফ নামক স্থানে মারা যায়।

আল্লাহ ﷻ-র এই দুশমনের ইচ্ছা ছিল, সে রাসুল ﷺ-কে হত্যা করবে। অথচ আল্লাহ ﷻ আগে থেকেই ফয়সালা করে রেখেছেন, সে মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে মারা যাবে। [আর হলও তা-ই।]

---

৪১. যুলমাজায হল আরাফার ময়দান থেকে এক ফরসখ [প্রায় পাঁচ কিলোমিটার] দূর একটি বাজার। [মু'জামুল বুলদান : খণ্ড পাঁচ]

৪২. দালায়েলুন্নাবুওয়াহ, বায়হাকি : ৩/২৫৮ ; আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া : ৪/৩২

৪৩. আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি [ﷺ] : ১/২৪১

দূতের নিরাপত্তা, চুক্তি ও অঙ্গীকার পালন

দূতের জান ও মাল রক্ষা করা একটি আর্ন্তজাতিক আইন। সকল শাসক ও রাষ্ট্রনায়ককে তা মেনে চলতে হয়। তদ্রূপ দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি ও অঙ্গীকার হয়, তা-ও মেনে চলা আবশ্যক। নবীজির ﷺ জীবনেও এগুলোর অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। নমুনা হিসেবে কয়েকটি উপস্থাপন করা হচ্ছে :

এক

মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবিদার মুসাইলামা কায্যাব তার দুজন দূত রাসুল ﷺ-এর নিকট পাঠাল। এরা দুজন মুসাইলামা কায্যাবের মিথ্যা নবুওয়্যতের ওপর ঈমান এনেছিল। এদের ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ হল, এই ধরনের বিশ্বাস যারা পোষণ করে, তাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু রাসুল ﷺ এদের হত্যা করেননি। কারণ, দূতদের হত্যা করা যায় না—চাই সে যে বিশ্বাসের লোকই হোক।

নু'আইম বিন মাসউদ আশজা'য়ি[৪৪] বর্ণনা করেন, একবার মুসাইলামা কায্যাব চিঠি দিয়ে তার দূতকে রাসুল ﷺ-এর নিকট পাঠাল। রাসুল তার পত্র শুনে দূত-দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—

৪৪. নু'আইম বিন মাসউদ আশজা'য়ি গাতফানি رضي الله عنه খন্দকের যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনু কুরাইযা, গাতফান এবং কুরাইশদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে দেন। হযরত উসমান رضي الله عنه-র খেলাফতকালে তার মৃত্যু হয়। [উসদুল গাবা : ৫/৩২৮-৩২৯]

'মুসাইলামা সম্বন্ধে তোমাদের দুজনের মত কী?'

তারা দুজন বলল, মুসাইলামা যা বলছে, তা আমরা স্বীকার করি। আর এ কথাও স্বীকার করছি যে, সে একজন নবী।

তাদের কথা শুনে নবীজি ﷺ বললেন—

'আল্লাহর শপথ! দূতদের হত্যা না করার নিয়ম যদি বাধা না হত, আমি তোমাদের দুজনকে হত্যা করতাম।'[৪৫]

দুই

হুদাইবিয়ার বছর যখন রাসুল ﷺ সাহাবিদের সাথে নিয়ে উমরা করার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন মুশরিকরা তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল। মক্কার কুরাইশরা রাসুল ﷺ-এর নিকট দূত পাঠাল, যেন উমরা না করেই মদিনা ফেরত যেতে তাকে রাজি করানো হয়। আর মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তাদের নিকট দূত গেল, যেন পরস্পরে আপসমূলক একটি বোঝাপড়া হয়ে যায়। তা হলে যুদ্ধের যে আগুন উস্কে উঠছিল, তা স্তমিত হয়ে যাবে। কুরাইশদের পক্ষ থেকে আগত দূতদের একজন ছিলেন আবু রাফে'। তিনি যখন রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে তার সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন তার অন্তরে ঈমান জায়গা করে নিল। তিনি এ আকাঙ্ক্ষা পেশ করলেন যে, মুসলমান হয়ে মুসলমানদের সাথেই থেকে যাবেন—মক্কা ফিরে যাবেন না। কিন্তু রাসুল ﷺ তাকে মক্কা ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু রাফে' رضي الله عنه নিজেই বর্ণনা করেন, [হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর] কুরাইশরা দূত হিসেবে আমাকে রাসুল ﷺ-এর দরবারে পাঠাল। তার নিকট এসে তার ব্যক্তিত্ব দেখার পর আমার অন্তরে ইসলাম বসে গেল। আমি আরজ করলাম—

'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাদের [কুরাইশদের] নিকট আমি আর ফিরে যাব না।'

৪৫. আবু দাউদ : হাদিস ২৭৬১ ; মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ : ৫/৩১৪

কিন্তু রাসুল ﷺ ইরশাদ করলেন–

'আমি চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না। আর দূতদেরও আটকে রাখি না। বরং তুমি ফিরে যাও। তোমার মনে যদি ইসলামের ভালবাসা থাকে যেমনটা এখন আছে, তা হলে [মক্কা হতে] ফিরে এসো।'

আমি চলে গেলাম। পরবর্তীতে রাসুল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করলাম।[৪৬]

তিন.

হুদাইবিয়ার চুক্তির একটি ছিল এরূপ–কোনও মুশরিক যদি মুসলমানদের নিকট আসে, তা হলে মুসলমানরা তাকে ফিরিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে কোনও মুসলমান যদি মুশরিকদের নিকট পালিয়ে যায়, তা হলে মুসলমানদের নিকট তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

চুক্তিনামা লেখা হচ্ছে, এখনও সম্পন্ন হয়নি, এই সময় আবু জান্দাল ﷺ দৌড়ে মুসলমানদের নিকট এলেন। তিনি জিঞ্জিরাবদ্ধ ছিলেন। সুহাইল বিন আমর [মুশরিকদের পক্ষ হতে চুক্তি করার জন্য আগমনকারী] আবু জান্দালকে দেখতে পেয়ে তার চেহারার ওপর থাপ্পড় কষল। জামার কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে তাকে উপুড় করে ফেলল। বলল–

'হে মুহাম্মদ! এ [আবু জান্দাল] আসার আগেই আমার এবং তোমার মধ্যেকার চুক্তি হয়ে গেছে।'

রাসুল ﷺ বললেন, 'ঠিক কথা।'

[প্রকাশ থাকে, তখনও দস্তখত হয়নি। চুক্তিনামা তখনও লেখা হচ্ছিল।]

এরপর সুহাইল আবু জান্দাল ﷺ-কে নির্মমভাবে টানতে লাগল। আর আবু জান্দাল ﷺ মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন–

[৪৬]. আবু দাউদ : হাদিস ২৭৫৮ ; আহমদ : ৬/৮

'হে মুসলমানরা! আমাকে কি আবার মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা আমার দীনের কারণে আমার ওপর জুলুম করছে?'

সে সময় মুসলমানদের, বিশেষ করে উমর ﷺ-র অবস্থা কীরূপ ছিল, ইতিহাস থেকে তা জানা যাবে। এখানে এতটুকু বলা উদ্দেশ্য, এমন ক্ষেত্রেও রাসুল ﷺ চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। আবু জান্দাল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

'আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ করো! আল্লাহর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা রাখো। নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য এবং অন্যান্য দুর্বল মুসলমানদের জন্য কোনও একটা পথ খুলে দেবেন। মুশরিকদের সাথে আমরা চুক্তি করে ফেলেছি। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-কে জামানতদার রেখেছি। তাই তাদের [মুশরিকদের] সাথে চুক্তিভঙ্গ করতে পারি না।'[৪৭]

[৪৭]. দেখুন, আলবিদায়াওয়ান্নিহায়া : ৬/২১৬ ; উসদুল গাবা : ৫৭৭৫

আইনানুগ বিচার

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর[৪৮] رضي الله عنه বর্ণনা করেন, হাররা এলাকার একটি পানির নালার ব্যাপারে এক আনসারি রাসুল ﷺ-এর নিকট যুবাইর رضي الله عنه-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সে নালার পানি দিয়ে মদিনার লোকজন তাদের বাগান সিক্ত করত। আনসারি যুবাইর رضي الله عنه-কে বলেছিল–

'পানি যেতে দাও।'

---

[৪৮]. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি.র মায়ের নাম ছিল আসমা رضي الله عنها। তিনি ছিলেন আবু বকর رضي الله عنه-র জেষ্ঠ্য কন্যা। আব্দুল্লাহ رضي الله عنه-র জন্ম হয় দ্বিতীয় হিজরিতে, মদিনা মুনাওয়ারায়। খেলাফতে উসমানির সময় তার প্রচেস্টায় তরাবেলস [লিবিয়া] জয় হয়। ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার হাতে তিনি বাইয়াত হননি। তার জীবদ্দশায়ই হিজাযবাসীরা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইয়েরের হাতে খেলাফতের বাইয়াত করে। ৬৪ হিজরিতে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর ইরাক মিসর প্রভৃতি দেশ তার এই খেলাফত মেনে নেয়। এর মধ্যে মারওয়ান বিন হাকাম শামে তার খেলাফতের ঘোষণা করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ৬৫ হিজরির রমজান মাসে মারওয়ান বিন হাকামের আকস্মিক মৃত্যু হলে তার পুত্র আব্দুল মালেক দামেশকের খলিফা হয়। ৭১ হিজরিতে আব্দুল মালেক ইরাকের ওপর আক্রমণ করে। সে-যুদ্ধে ইরাকের গভর্নর মুসআব বিন যুবাইর এবং তার পুত্র মারা যান। ওই বছরই আব্দুল মালেকের সিপাহসালার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা অবরোধ করে সেখানে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। ইবনে যুবায়েরের দশ হাজার সাথি দল ত্যাগ করে হাজ্জাজের সাথে যোগ দেয় এবং তিনি একাকী লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন। [তারিখে ইসলাম, শাহ মুঈনুদ্দিন আহমদ নদভী : ৪০৯-৪২৮]

যুবাইর رضي الله عنه তা মানতে রাজি হচ্ছিলেন না। উভয়ের বিচার হুযুর ﷺ-এর দরবারে পৌঁছলে তিনি যুবাইর رضي الله عنه-কে বললেন–

'যুবাইর! তোমার বাগান সিক্ত হওয়ার পর পাশের বাগানের জন্য পানি ছেড়ে দিয়ো।' [তা হলে তারাও তাদের বাগানে পানি দিতে পারবে।]

এতে ওই আনসারি ক্রুদ্ধ হয়ে বলল–

'আপনার ফুফাত ভাই তো!' [তাই তার পক্ষে ফয়সালা করেছেন।]

আনসারির কথা শুনে রাসুল ﷺ-এর চেহারা মুবারকের রং বদলে গেল। বললেন–

'যুবাইর! তোমার বাগান সিক্ত হয়ে গেলে পানি আটকে দেবে, যেন পানি দেয়ালের দিকে ফিরে যায়।'

আসলে রাসুল ﷺ প্রথমে একটি মানবিক ফয়সালা করেছিলেন। তাই যুবাইর رضي الله عنه-কে আনসারির খেতের দিকে পানি ছাড়তে বলেছিলেন। এই ফয়সালার প্রতি আনসারি অসন্তোষ প্রকাশ করলে নবীজি ﷺ আইনানুগ ফয়সালা শোনালেন। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কুয়ো বা নহরের পানির হক হল নিকটবর্তী খেতের। সেটা সিক্ত হওয়ার পর প্রতিবেশীকে পানি দেওয়া হবে।

যুবাইর رضي الله عنه বলতেন, আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি, এ-প্রসঙ্গেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে–

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'অতএব, তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করবে; আর তোমার বিচারের ব্যাপারে তাদের মনে কোনওরূপ সংকীর্ণতা পাবে না। এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে।' [সূরা নিসা : ৬৫][৪৯]

---

[৪৯]. বুখারি : হাদিস ২৩৬০ ; মুসলিম : হাদিস ২৩৫৭

বাইতুল্লাহর চাবি

সফিয়্যা বিনতে শায়বা رضي الله عنها বর্ণনা করেন–

রাসুল ﷺ [মক্কা বিজয়ের সময়] যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন [তখন মক্কা বিজয় হয়ে গেছে], আর মক্কার লোকদের মন থেকে ভয় ও আতঙ্ক দূর হয়ে গেল, তখন রাসুল ﷺ বাইতুল্লাহ শরিফে আগমন করলেন। উটের ওপর সওয়ার থেকেই কা'বার তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি উসমান বিন তালহা[৫০] رضي الله عنه-কে ডেকে পাঠালেন, [যিনি কা'বার দেখভাল করতেন।] এবং তার থেকে চাবি চাইলেন।

ইরশাদ হল– 'উসমান বিন তালহা কোথায়?'

ইনি হুদাইবিয়ার সময় মুসলমান হয়েছিলেন। তাকে বললেন, বাইতুল্লাহর চাবি নিয়ে এসো। তিনি বাড়ি গিয়ে তার মায়ের নিকট চাবি চাইলেন। তার মা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি তার মাকে ধমক দিয়ে বললেন–

৫০. উসমান বিন তালহা বিন আবি তালহা رضي الله عنه হলেন আব্দুদ্দার বিন কুসাঈয়ের সন্তান। উহুদের যুদ্ধে তার পিতা তালহা এবং তার চাচা উসমান, দুজনই কাফেরদের হয়ে যুদ্ধ করে এবং যথাক্রমে আলী رضي الله عنه এবং হামযা رضي الله عنه-র হাতে মারা যায়। শুধু তা-ই নয়, উসমান বিন তালহার চার ভাই মুসাফে', জিলাস, হারেস এবং কিলাবও ওই যুদ্ধে মারা যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি মদিনায় হিজরত করেন। নবীজি ﷺ-এর ওফাতের পর তিনি মক্কায় স্থানান্তর হন। ৪২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। কারও কারও মতে আজনাদাইনের যুদ্ধে [১৫ হিজরি] তিনি শহিদ হন। [উসদুল গাবা : ৩/৫৭২]

'তোমাকে চাবি দিতেই হবে। নচেৎ তলোয়ার বের করতে আমি বাধ্য হব।'

তার মা তাকে চাবি দিলেন। চাবি এনে তিনি নবীজিকে দিলেন।

উসমান বিন তালহা رضي الله عنه-র চাবি দেওয়ার পর বাইতুল্লাহর দরজা খোলা হল। রাসুল ﷺ কা'বাঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন, কাঠের বানানো একটি কবুতর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে দিলেন।

এরপর তিনি কা'বাঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। মাথা নত করে মক্কাবাসীরা তার অপেক্ষা করছিল সেখানে –না জানি আজ তিনি কী ফয়সালা করেন! তিনি সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তখন আলী رضي الله عنه দাঁড়িয়ে সবিনয় আরজ করলেন–

'হে আল্লাহর রাসুল! হাজিদের পানি পান করানোর যে সৌভাগ্য আমাদের আছে, তার সাথে বাইতুল্লাহর দেখভালের দায়িত্বও আমাদের ওপর অর্পণ হোক। [আর চাবি আমাদের হাতে দিন, যেন এই সম্মানও আমাদের হয়।] আল্লাহ ﷻ আপনাকে আরও বরকত ও রহমত দান করুন।'

এই ক্ষেত্রেও রাসুল ﷺ পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। যেহেতু অনেক বছর থেকেই এই দায়িত্ব আদায় করে আসছেন উসমান বিন তালহা رضي الله عنه, তাই চাবি দেওয়ার জন্য তাকেই খোঁজ করলেন।

আল্লাহর রাসুল আজ যাকে ইচ্ছা, চাবি দিতে পারেন।

মক্কীজীবনে একবার রাসুল ﷺ চাবি চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে চাবি দিতে এই উসমান বিন তালহা অস্বীকার করেছিলেন। কথাটা তার ভালভাবেই স্মরণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ইরশাদ করলেন–

'উসমান! এসো। তোমার চাবি নাও। আজকের দিন বিশ্বাস রক্ষার ও অনুগ্রহের দিন।'[৫১]

৫১. আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি : ২/৬৬৮

আবু ওহব! নীচে নামো

ঘটনাটি ইবনে শিহাব (রহ.)-র সূত্রে মুআত্তা ইমাম মালেকে[৫২] বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি পড়লে বুঝতে পারবেন, রাসুল ﷺ কতটা প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে তিনি কতটা বিচক্ষণ ছিলেন। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তার সময়োপযোগী ফয়সালা বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তিনি মানুষের প্রকৃতি বুঝতে পারতেন। যে যেমন, তার সাথে তেমনই আচরণ করতেন।

যখন মক্কা বিজয় হয়, তখন এমন কিছু নারী ছিলেন, যারা নিজেরা তো মুসলমান হয়েছেন, কিন্তু তাদের স্বামীরা তখনও ইসলামের নিয়ামত হতে বঞ্চিত ছিল। তাদের একজন ছিলেন ওলিদ বিন মুগিরার[৫৩]

৫২. ইমাম মালেক বিন আনাস বিন মালেক আসবাহি (রহ.)-র প্রপিতামহ আবু আমের নাফে' ইসলাম গ্রহণ করেন; এবং কাজি আয়াযের উক্তি হিসেবে তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেন। তার দাদা মালেক ইয়ামান থেকে এসে হিজাযে বসবাস করতে থাকেন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ৯৩ হিজরিতে ইমাম মালেক (রহ.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। তাকে 'ইমামে দারুল হিজরত' বলা হত। পুরো জীবন তিনি মদিনায় কাটিয়ে দেন। জোরপূর্বক তালাকের মাসয়ালায় খলিফা মনসুর তাকে প্রহার করান। ১৭৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার কিতাব 'মুয়াত্তা'য় হাদিস ও ফিকহ সংকলন করা হয়েছে। [উর্দু দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া : ১৮/৩৭২-৩৭৮]

৫৩. ওলিদ বিন মুগিরা মাখযুমি ছিল ইসলামের দুশমন কুরাইশদের সরদার। যারা আবু তালেবের নিকট গিয়ে দাবি জানিয়েছিল যে, তুমি তোমার ভাতিজাকে ইসলামের তাবলিগ করতে বাধা দাও, নচেৎ তার সঙ্গ ছেড়ে দাও, ওলিদ বিন

মেয়ে। তার স্বামীর নাম ছিল সফওয়ান বিন উমাইয়্যা[৫৪]। সে ইসলাম গ্রহণ না করে মক্কা থেকে পলায়ন করেছিল। তার চাচাত ভাই ওহব বিন উমায়ের (রা.)-কে ডেকে রাসুল ﷺ সফওয়ান বিন উমাইয়্যার নিরাপত্তাপত্র জারি করে তার খোঁজে পাঠালেন। সফওয়ানের সান্ত্বনার জন্য একটি নিদর্শন চাইলেন ওহব (রা.)। সফওয়ান বিন উমাইয়্যা ছিল একজন সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।

নিদর্শন হিসেবে রাসুল ﷺ তার নিজের চাদরটি প্রদান করলেন। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন, দেখ! তাকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। কবুল করলে তো ভাল। আর যদি না করে, তা হলে চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্য তাকে আরও দু'মাসের অবকাশ দেবে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার নিকট ওহব (রা.) পৌঁছলেন। নবীজির ﷺ চাদর তাকে দেখিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন সে অনুগত হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হল। রাসুল ﷺ-কে দেখতে পেয়ে সওয়ারের ওপর থেকেই তার চাদর তাকে দেখিয়ে বলল–

'হে মুহাম্মদ! ওহব বিন উমায়ের আপনার চাদর আমাকে দেখিয়ে বলেছে, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আর আমার বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদি ইসলাম কবুল করি, তা

মুগিরা তাদের মধ্যেও ছিল। তার পরামর্শেই হজ্জের সময় কুরাইশরা তাকে 'যাদুকর' বলে প্রচার করে। [তখন সূরা মুদ্দাস্সিরের ১১ আয়াত থেকে ৩০ আয়াত পর্যন্ত নাযেল হয়।] প্রথম হিজরিতে ওলিদ মক্কায় মারা যায়। তার সাত পুত্রের মধ্যে তিনজন মুসলমান হন। খালেদ বিন ওলিদ (রা.) এবং ওলিদ বিন ওলিদ (রা.) তারই পুত্র ছিলেন।

৫৪. সফওয়ান বিন উমাইয়্যা (রা.)-র পিতার নাম ছিল উমাইয়্যা বিন খলফ। বদরের যুদ্ধে উমাইয়্যা বিন খলফ মারা যায়। হুনাইনের যুদ্ধের সময় সফওয়ানের মন জোগানোর জন্য নবীজি ﷺ তাকে গনিমতের মাল থেকে অংশ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মুসলমান হন। ইসলামপূর্ব কালে তাকে কুরাইশদের সম্ভ্রান্তদের থেকে গণ্য করা হত। ৪২ হিজরিতে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

হলে তো ভাল। তা না হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমার দু'মাসের অবকাশ রয়েছে।'

রাসুল ﷺ বললেন–

'আবু ওহব! নীচে নামো!'

সফওয়ান বিন উমাইয়্যা বলল–

'না! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নামব না, যতক্ষণ না আপনি আমার ব্যাপারে খোলাসা করে কিছু বলবেন।'

রাসুল ﷺ বললেন,

'দু'মাস কী; বরং আমি তোমাকে চার মাসের সুযোগ দিচ্ছি।'

এর মধ্যে হুনাইনের যুদ্ধ সামনে এল। মুসলমানদের অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সফওয়ান বিন উমাইয়্যার নিকট তার যুদ্ধাস্ত্রগুলো ধার চেয়ে নবীজি ﷺ এক ব্যক্তিকে তার নিকট পাঠালেন।

সফওয়ান বলল–

'ধার হিসেবে চাওয়া হচ্ছে, না কি জবরদস্তি?'

রাসুল ﷺ বললেন–

'না! বরং ধার হিসেবে।'

সফওয়ানের নিকট যতগুলো যুদ্ধাস্ত্র ছিল, সবগুলোই নবীজিকে ধার হিসেবে প্রদান করল। আবু দাউদ শরিফের বর্ণনামতে, ত্রিশ থেকে চল্লিশটার মত বর্ম সে নবীজিকে দিয়েছিল।

যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হল। হাওয়াযেন গোত্র পরাজিত হল। যুদ্ধলব্ধ অনেক মাল মুসলমানদের হাতে এল। যুদ্ধের পর সফওয়ানের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সেগুলো সংগ্রহ করা হল। দেখা গেল, কয়েকটি বর্ম নেই। সেগুলো হয়ত হারিয়ে গেছে, নয়ত ভেঙ্গে গেছে।

সফওয়ান বিন উমাইয়্যাকে রাসুল ﷺ বললেন–

'তোমার কিছু বর্ম হারিয়ে গেছে। আমরা কি সেগুলোর বিনিময় দেব?'

সফওয়ান বিন উমাইয়্যা বলল–

'না, হে আল্লাহর রাসুল! [সেগুলোর বিনিময় আমার দরকার নেই।] কারণ, আজ আমার মনে [আপনার সম্বন্ধে] সে ভালবাসা আছে, যা ওইদিন ছিল না।'

এরপর তিনি ইসলামগ্রহণের ঘোষণা করলেন।[৫৫]

৫৫. দেখুন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২/১৩ ; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৮/১৮০ ; সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৪৪০ ; আবু দাউদ : হাদিস ৩৫৬৩

চোরের চালাকি

আবু তা'মা[৫৬] নামে এক আনসারি ছিল। একবার সে একটি বর্ম চুরি করল। আটার থলের মধ্যে গোপন করে নিয়ে গেল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই থলের মধ্যে একটি ছিদ্র হয়ে সামান্য সামান্য করে আটা পড়তে লাগল। ফলে চুরির জায়গা হতে ঘর পর্যন্ত একটি নিশানা হয়ে যায়। লোকজনের মনে ধারণা সৃষ্টি হল, এই লোকই চুরি করেছে। লোকদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হল। কেউ কেউ বলল, আবু তা'মাই বর্ম চুরি করেছে। আবার কেউ তাদের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তারা অযথাই আবু তা'মাকে দোষ দিচ্ছে।

এর ফাঁকে আবু তা'মা বর্মটি নিয়ে এক ইয়াহুদির নিকট আমানত রাখল। এরপর বাড়ি এসে গোত্রের লোকদের নিকট বলল, লোকজন যখন আমার ওপর অপবাদ দিল যে, বর্ম আমিই চুরি করেছি, তখন এ ব্যাপারে আমি খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। বিভিন্ন জায়গায় তালাশ নিলাম, কিন্তু চোর পেলাম না। অবশেষে অনেক কষ্টের পর খোঁজ পেলাম যে, আসলে বর্মটি অমুক ইয়াহুদির নিকট আছে। তাই সন্দেহ নেই, সে-ই চুরি করেছে।

---

[৫৬]. আবু তা'মার নাম ছিল বশির বিন উবাইরেক। সে ছিল মুনাফিক। রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের গালি দিত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা বলত এবং সেগুলো অন্যের কবিতা বলে চালিয়ে দিত। কিন্তু মুসলমানরা ঠিকই বুঝতে পারতেন, এই কবিতা হচ্ছে এই বদমাশের। কথিত আছে, আবু তা'মা পলায়ন করে মক্কা চলে আসে এবং ধর্ম ত্যাগ করে। একবার চুরি করার জন্য এক ঘরের প্রাচীর খোদাই করছিল। প্রাচীরটি তার ওপর পতিত হলে সে সেখানেই মারা যায়।

চুরি করতে গেলে দেয়াল-ধ্বসে মরে

তার কথা শুনে গোত্রের লোকজন নবীজির ﷺ দরবারে গিয়ে বলল, আপনি লোকদের সামনে আবু তা'মার নিরাপরাধ হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করে দিন। নবীজি ﷺ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং আবু তা'মার নিরাপরাধ হওয়ার কথা ঘোষণা করতে চাইলেন। তার দায়মুক্ততার ঘোষণার আগেই নবীজির ওপর ওহি এল, যাতে তিনি জানতে পারলেন, প্রকৃত চোর ওই ইয়াহুদি নয়; বরং এই আনসারি আবু তা'মা। এই খেয়ানতকারীর সুপারিশ করতে আল্লাহ ﷻ নবীজিকে নিষেধ করলেন। এবং আল্লাহ ﷻ-র কিতাব দ্বারা ফয়সালা করার নির্দেশ দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا. وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾

'নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষদের মধ্যে ফয়সালা করো, যা আল্লাহ তোমাকে বোঝান। তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষ হতে বিতর্ককারী হয়ো না। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল; দয়াময়। আর তাদের পক্ষ হতে বিতর্ক কোরো না, যারা নিজেদেরই খেয়ানত করে। নিশ্চয় আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।' [সূরা নিসা : ১০৭][৫৭]

---

[৫৭]. দেখুন, আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি [ﷺ] : ২/৭২০ ; মাআনিল কুরআন, যুজাজ : ২/১১০ ; তিরমিযি : ৩০৩৬

মজদুরের উপর অবিচার

মুসলমানের ইজ্জত

ইসলামের ইতিহাসে কাজি আবু আব্দুল্লাহ শরিক বিন আব্দুল্লাহ নখ'য়ির[৫৮] নাম একজন কাজি হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিচারকার্য সম্বন্ধে তার অনেকগুলো ঘটনা বর্ণিত আছে। উমর বিন হাইয়াজ বিন সাঈদ হামদানি ছিলেন কাজি শরিকের বন্ধু। তিনি বর্ণনা করেন–

একদিন ভোরবেলায় আমি কাজি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়ি গেলাম। তিনি দরজা খুললেন। দেখলাম, তার গায়ে চামড়ার একটি কোট। ভেতরে জামা নেই।

বললাম, আদালতের সময় হয়ে গেছে, আর এখনও আপনি এই পোশাকে? তিনি বললেন, গত কাল আমার কাপড় ধুয়েছিলাম; এখনও শুকোয়নি। সেগুলো শুকোনোর অপেক্ষায় আছি। তুমি বসো। আমি বসে পড়লাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে, শরিয়তে তার হুকুম কী? আমি বললাম, আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তোমার কী মত? আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। এরই মধ্যে একব্যক্তি আহত কাঁধ নিয়ে চিৎকার করতে

---

৫৮. কাজি শরিক বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু শরিক ছিলেন খুবই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ধীমান আলেম। তার দাদা আবু শরিক কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ৯৫ হিজরিতে কাজি শরিক বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। খলিফা মাহদি তাকে কূফার কাজি নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি আহওয়াযের কাজি হন। ১৭৭ হিজরিতে তিনি কূফায় মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য খলিফা হারুন রশিদ বাগদাদ আগমন করেন। [ওফিয়াতুল আ'ইয়ান : ২/৪৬৪-৪৬৮]

করতে এক ঈসায়িকে নিয়ে কাজি শরিকের ঘরে প্রবেশ করল। সে দোহাই দিয়ে বলল, আমাকে সাহায্য করুন। এই সময় আল্লাহ ﷻ ছাড়া একমাত্র কাজিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

তার পিঠে কোড়ার দাগ দেখা যাচ্ছিল। কাজিকে সালাম করে সে কাজির সামনে বসে পড়ল। বলল, আমি এক মজদুর। নকশার কাজ করি। মাসে মোটামুটি শ'খানেক দেরহাম কামিয়ে নেই। এই ঈসায়ি অযথাই আমাকে আটকে রেখে চার মাস আমার থেকে কাজ নিতে থাকে। আমার বিবি-বাচ্চারা দুশ্চিন্তায় ভুগছে। তাদের নিকট খাওয়ার কিছু নেই। তাই তার থেকে আজ আমি পলায়ন করে এসেছি। সে আবার আমাকে ধরে ফেলে এবং আমার সাথে অমানবিক আচরণ করে। আমার পিঠই এর সাক্ষ্য দেবে। কোড়া দিয়ে মেরে মেরে আমাকে রক্তাক্ত করে ফেলেছে।

মূলত এই ঈসায়ি লোকটা খলিফা মাহদির স্ত্রী খিযরানের বিশেষ পত্র নিয়ে কূফার আমির মুসা বিন ঈসার নিকট যাচ্ছিল। পত্রে লেখা ছিল, এ আমার খাস লোক। এর দিকে লক্ষ রেখো। আর এর হুকুম যেন অমান্য না করা হয়।

মজদুরের বক্তব্য শুনে কাজি শরিক ঈসায়িকে বললেন, মজদুরের পাশে বসে পড়ো। সে বলল, কাজি! তোমার মঙ্গল হোক। এ হল আমাদের নওকর। একে এক্ষণই জেলে পাঠিয়ে দিন। কাজি বললেন, ওঠার আগেই তোমাকে যে হুকুম দেওয়া হচ্ছে, তা তামিল করো। তার পাশে গিয়ে বসো। ঈসায়ি লোকটা নিরুপায় হয়ে মজদুরের পাশে বসল। কাজি সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তির পিঠে যে দাগ, সেটা কী? আর কে তাকে মেরেছে?

সে বলল, কাজির মঙ্গল হোক! আমি নিজেই তো আমার কোড়া দিয়ে ওকে পিটিয়েছি। ওকে তো আরও পিটানো দরকার ছিল। আপনি এখনই ওকে জেলে পাঠিয়ে দিন।

কাজি শরিক ঘরে গেলেন। নিজের কোড়াটা আনলেন। এরপর সেটা দিয়ে ঈসায়িকে পিটাতে শুরু করলেন। আর ওই ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার বাড়ি যাও।

এরপর ঈসায়িকে মারতে মারতে বললেন, আরে বেকুব! ঘাড় বাড়িয়ে দে! আল্লাহর কসম! আজকের পর তুই কোনও মুসলমানকে পিটাতে পারবি না।

এরমধ্যে তার কয়েক সাথি তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে কাজি শরিক মহল্লার যুবকদের ডাকলেন, যেন ঈসায়ির সঙ্গীদের ধরে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। তা দেখে ঈসায়ির সাথিরা সবাই পালিয়ে বাঁচল। ঈসায়ি একাকী থেকে গেল। এখন সে কান্নাকাটি এবং অনুনয়-বিনয় করছিল। আবার ধমকও দিচ্ছিল, এর ফল তুমি পাবে!

কাজি শরিক কোড়াটি দরজার দিকে ফেলে দিয়ে আমার [ঘটনাটি বর্ণনাকারী উমর বিন হাইয়াজ] দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ! কী বলছিলাম আমরা? যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে, ইসলামে তার হুকুম কী?

আমরা আবার আগের আলোচনা করতে লাগলাম। যেন কিছুই ঘটেনি।

ঈসায়ি খুবই দ্রুত উঠে তার খচ্চরের দিকে দৌড়ে গেল এবং সেটার ওপর আরোহণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু খচ্চরটি লাফালাফি শুরু করে দিল। তাকে সাহায্য করার মত কেউ সেখানে ছিল না যে, তার পাদানি ধরে তাকে উঠিয়ে দেবে। এতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে তার খচ্চরটিকে প্রহার করতে শুরু করল। কাজি তাকে ডেকে বললেন, ধ্বংস হোক তোর! এই পশুটিকে দয়া দেখা। এটা তোর থেকে অনেক অনুগত ও বাধ্য। ঈসায়ি এ কথা শুনে জ্বলেপুড়ে চলে গেল।

কাজি শরিক আবার ফিকহি মাসয়ালার আলোচনা শুরু করলেন।

আমি বললাম, যে ঘটনাটি ঘটেছে, সে ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন।

শরিক বললেন–

'চুপ করো!... আল্লাহ ﷻ-র হুকুম মজবুতভাবে পালন করো...আল্লাহ ﷻ তোমাকে সম্মানী বানাবেন।'

এর পর বললেন–

'আমরা যে আলোচনা করছিলাম, তা চালিয়ে যাও। আর আজকের ঘটনা যা ঘটেছে, তার পরিণাম হয়ত ভাল হবে না।'

এই অভিযোগ নিয়ে ওই ঈসায়ি কূফার গভর্নর মুসা বিন ঈসার নিকট গেল।

সে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে তোমাকে মেরেছে? পুলিশের প্রধান এবং তার সাথিরা সবাই এতে অসন্তোষ প্রকাশ করল। জানতে চাইল, সে কে? এক্ষণই তাকে মেরামত করছি। ঈসায়ি বলল, কাজি শরিক আমার সাথে এটা করেছে।

গভর্নর বলল–

'আল্লাহর কসম! শরিকের ব্যাপারে আমি কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারব না।'

ঈসায়ি সেখান থেকে বাগদাদ চলে গেল। কূফার দিকে আর ফিরেও তাকায়নি।

সম্পদ ধার নিয়ে মিথ্যা কসম করার পরিণাম

মিথ্যা কসমের পরিণতি

আলহাজ ইবরাহিমের নিকট তার এক বন্ধু এল। বলল, কিছু টাকার দরকার। ধার হিসেবে দাও। বছরখানেকের মধ্যেই শোধ করে দেব। আলহাজ ইবরাহিম তাকে টাকা দিয়ে একটি খাতায় লিখে রাখলেন। তার বন্ধু বলল, টাকার জামানত হিসেবে কিছু রাখতে চাই। আলহাজ ইবরাহিম বললেন, না। তুমি আমার প্রিয় বন্ধু; কোনও জামানতের দরকার নেই। আমার আর তোমার মাঝখানে আল্লাহই সাক্ষী। তিনিই তো উত্তম উকিল ও উত্তম সাক্ষী।

বছর পুরো হওয়ার আগেই আলহাজ ইবরাহিম মারা যান। স্ত্রী ও চার সন্তান রেখে যান তিনি। বড় ছেলের বয়স মাত্র তেরো বছর। একদিন তার স্ত্রী স্বামীর খাতা দেখলেন–কার কার নিকট দেনা-পাওনা আছে। সবার হিসাব লিখলেন। দেখলেন, অমুক বন্ধু ঋণ হিসেবে টাকা নিয়েছে। বছরশেষে দেওয়ার কথা। স্বামীর বন্ধুর নিকট তিনি লোক পাঠিয়ে পাওনার তাগাদা দিলেন। কিন্তু জবাবে সে বলল, আলহাজ ইবরাহিম থেকে সে কোনও ঋণই নেয়নি। তাই শোধ করার প্রশ্নই আসে না। চাপ সৃষ্টি করা হলে সে বলল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ধার হিসেবে কিছু টাকা নিয়েছিলাম। কিন্তু সে তো অনেক আগেই ফিরিয়ে দিয়েছি।

এ কথা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। একদল আলহাজ ইবরাহিমের পক্ষে। তাদের কথা হল, ইবরাহিমের ব্যাপারে এ কথা তো সবারই জানা যে, আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য তিনি লোকদের ঋণ দিতেন, কিন্তু কোনও জামানত রাখতেন না, কিংবা লিখিয়েও রাখতেন না। আরেকদল ছিল ঋণগ্রহীতার পক্ষে। তাদের কথা হল, আলহাজ ইবরাহিমের মত জ্ঞানী

সামান্য কিছু পয়সার জন্য মিথ্যা কসম খেলে

মানুষ কোনও লেখা বা জামানত ছাড়া এত টাকা ঋণ দেবেন, তা তো ভাবাও যায় না।

এরপর আলহাজের বিধবা স্ত্রী এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হলেন। ঋণগ্রহীতার ওপর তারা চাপ সৃষ্টি করল। কিন্তু সে পুরোপুরি অস্বীকার করল। এভাবে নিরাশ হয়ে তাকে আদালতের আশ্রয় নিতে হল। তার বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করা হল। আদালত উভয়পক্ষকে ডাকল। উভয়পক্ষ আদালতে উপস্থিত হল। উভয়পক্ষের দলিলপ্রমাণ শোনার পর আদালত বলল,

'আমার ব্যক্তিগত মত হল, এ ব্যক্তি আলহাজ ইবরাহিম থেকে ঋণ নিয়েছে, সন্দেহ নেই। আর তিনি তা নথীভুক্তও করেছেন। কিন্তু খাতায় লিখে রাখাই যথেষ্ট ছিল না। তার ওপর দস্তখত নেওয়া দরকার ছিল।

এখন এই ব্যক্তির বক্তব্য হল, সে ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। আর তার কথার সমর্থন পাওয়া যায় আরেক ব্যক্তির কথা থেকে। সে ঋণগ্রহীতাকে বলতে শুনেছে, আল্লাহ ﷻ হাজি ইবরাহিমকে উত্তম প্রতিদান দিন! তিনি আমার সাথে বড়ই ভাল আচরণ দেখিয়েছেন। অভাব-অনটন থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল। ঠিকসময় তিনি আমাকে টাকা দিয়ে আমার প্রয়োজন পূরণ করেছেন।

বিচারক বললেন, টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, সে-ব্যাপারে আমাদের নিকট কোনও প্রমাণ নেই। দাবিদারের জন্য তার পক্ষ থেকে প্রমাণ উপস্থিত করা নিয়ম। আর বিবাদী যদি দাবি না মেনে তা অস্বীকার করে, তার জন্য কসম। তাই আমার ফয়সালা হল, বিবাদী কুরআনে কারিমের কসম করে বলবে, সে হাজি সাহেবের দেনাদার নয়। সে যে ঋণ নিয়েছে, তা ফেরত দিয়েছে।

বিবাদী কসম করতে শুরু করল, আমি কসম করে বলছি..., আমি কসম করে বলছি....। এভাবে সে তার কসম পুরো করল যে, আমি ঋণ শোধ করে দিয়েছি।

আদালত তাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করল।

বড়ই গর্বভরে এবং হাসিমুখে বিবাদী আদালত থেকে বের হল। সুস্থসবল নওজোয়ান ছিল সে। আদালতের বাইরে সে পা রাখার সাথে সাথেই শোরগোল উঠল, বিবাদী মাটিতে পড়ে গেছে। তার দেহের এক অংশ আদালতের বাইরে, আরেক অংশ ভেতরে। ভয়ে চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল সবার মুখ থেকে–ও মারা গেছে! ...হায় কীভাবে!....ও তো তরতাজা যুবক ছিল....মরে গেছে! মরে গেছে!!

ঘটনাটির বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলহাজ ইবরাহিমের প্রতিবেশী ছিলাম। আদালতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তার এই শিক্ষণীয় মৃত্যু সবার মনেই প্রভাব ফেলল। আলহাজ ইবরাহিমের ঘরে গেলাম। পর্দা রক্ষা করে তার স্ত্রীর সাথে যে কথাবার্তা হল, তা অনেকটা এরূপ ছিল–

আমার স্বামী বড়ই মুত্তাকি ও পরহেজগার ছিলেন। মানুষের উপকার করতেন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। সব ধরনের মানুষই তার কাছে আসত। ধনী-গরিব সবাই। মানুষদের তিনি ঋণ দিতেন। এরপর রাসুল ﷺ-এর হাদিস অনুসারে আমল করতেন। গরিবদেরটা মাফ করে দিতেন; ধনীদের অবকাশ দিতেন। তিনি একটি খাতা বানিয়েছিলেন। ঋণের বিবরণ সেখানে লিখে রাখতেন। খুব কম ঋণগ্রহীতারই স্বাক্ষর নিতেন। কয়েকবার তাকে বলেছিলাম, কমপক্ষে তাদের থেকে লিখিয়ে নিন। জবাবে তিনি একটি কথাই বলতেন–

'এই ধনসম্পদ আল্লাহ ﷻ-র মাল। এককালে আমিও গরিব ছিলাম। অনুগ্রহ করে আল্লাহ ﷻ আমাকে সম্পদশালী করেছেন।'

বিচারের দিন বাদী হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলাম। কাজি যখন তাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করল, আর সে মিথ্যা কসম করল, তখন আমার দেহ শিউরে উঠেছিল। আমার পুরো বিশ্বাস ছিল, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলছে। আল্লাহ ﷻ-র কিতাবকে মাঝখানে এনে সেটার মিথ্যা কসম করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আমার মনে ঘৃণা জাগল এবং মন থেকে বদদোয়া বের হল–

'হে আল্লাহ! গোপন ও লুকায়িত সব বিষয় তোমার জানা আছে। তুমি অদৃশ্য বিষয় জানো। হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যদি মিথ্যা কসম করে

থাকে, তা হলে তাকে লোকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় বানিয়ে দাও। হে শক্তিশালী! হে পরাক্রমশালী!'

নিজ চোখেই আমি তাকে আদালত থেকে বাইরে পড়ে যেতে দেখেছি। দুনিয়ার বিচারক থেকে সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে–সন্দেহ নেই, কিন্তু আসমান ও জমিনের বিচারক যিনি, তার থেকে বাঁচতে পারেনি।

[বর্ণনাকারী বলেন,] এর পর প্রচণ্ড শীতের একরাতে, মানুষ যখন তাদের বিছানায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে, আলহাজ ইবরাহিমের বাড়ির ঘণ্টা বাজল। দরজায় এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ছ' বছরের একটি বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ইবরাহিমের স্ত্রী দরজা খুললেন। সামনে ঋণগ্রহীতার স্ত্রী তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সে ইবরাহিমের স্ত্রীকে বলল, ভরা আদালতে আমার স্বামী মিথ্যা বলেছে যে, সে ইবরাহিমের ঋণ শোধ করে দিয়েছে। আমার জানা ছিল, সে মিথ্যা বলেছে। আমি তাকে বোঝাতে পুরোপুরি চেষ্টা করেছি–এমনটা করবেন না! তাদের মাল তাদের ফিরিয়ে দিন! আমার বার বার বলা সত্ত্বেও অন্যায়ের ওপর অটল থাকে সে। এর অনেক বড় মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। এখন সেই অর্থ আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। এই নিন সেই অর্থ।

সেই অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

ধোঁকার গন্ধ

একবার খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহ তার নির্মাণাধীন মহল দেখতে গেলেন। বিভিন্ন কোণ থেকে তিনি তা দেখলেন। কারিগররা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। মিস্ত্রী-মজদুর দ্রুত হাত চালাচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি কালো রঙের হাবশিকে দেখতে পেলেন। অন্যসব মজদুরের সাথে টুকরি উঠিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। অন্য মজদুররা এক সিঁড়ি করে উঠছে, আর ও দু' সিঁড়ি করে। তা ছাড়া অন্যদের তুলনায় তার টুকরিও ছিল যথেষ্ট বড় ও ভারি। তার এই অস্বাভাবিক কাজে খলিফা হুমুক দিলেন, ওই হাবশিকে আমার সামনে নিয়ে এসো।

হাবশিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য মজদুরের তুলনায় তুমি মাটি বেশি উঠাচ্ছ। আর সিঁড়িও বেয়ে উঠছ একটার জায়গা দুটো করে। এর কারণ কী? এর কোনও সদুত্তর সে দিতে পারেনি। এদিক-ওদিকের কথা বলতে লাগল।

উজিরকে বললেন, তার কথায় মিথ্যা এবং ধোঁকার গন্ধ পাচ্ছি। এই লোকটা হয়তো চোর, দিনের বেলায় কাজ করে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিংবা কোথাও থেকে খাজানা পেয়ে গেছে। এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার হাতে দিনার-দেরহাম এসে গেছে।

উজির হাবশিকে ডেকে পাঠালেন এবং সজোরে একটি চড় কষে বললেন, ঠিক ঠিক বল। তোর ব্যাপারটা কী? আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দে। নচেৎ তোকে মেরেই ফেলব!

প্রথমে হাবশি এদিক-ওদিকের কথা বলতে লাগল। কোনও অপরাধ স্বীকার করতে রাজিই হল না। পরে যখন আরও চাপ বাড়ানো হল, তখন বলল, আমিরুল মুমেনিন! আমার জানের নিরাপত্তা দেওয়া হলে আমি সত্য সত্য বলব।

খলিফা বললেন, তুমি যদি এমন কোনও কিছু না করে থাক, যাতে তোমার ওপর শাস্তি আসতে পারে, তা হলে তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হল। সে ভাবল, সে নিরাপত্তা পেয়ে গেছে। বলল—

আমি অমুক এলাকায় বোঝা বহনের কাজ করি। অনেক সময় কাজ পাই, অনেক সময় পাই না। একবার অনেকদিন ধরে কোনও কাজ পাইনি। অনেক দিন থেকে বেকার। একদিন একব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, হাতে থলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তার পিছু নিলাম। আমাকে সে চিনত না। তাই আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। একটি বিরাণ জায়গায় সুযোগ পেয়ে গেলাম। তার থেকে থলেটি কেড়ে নিয়ে খুলে দেখলাম। দেরহামে ভরা। সে আমার পিছনে এলে আমি তাকে ফেলে দিয়ে তার গলা টিপে ধরলাম। সে চিৎকার করতে চাইলে আমি তার মুখ চেপে ধরলাম। সে চটপট করতে লাগল। যখন তাকে ছাড়লাম, তখন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিলাম। রাত হয়ে গেছে। সোজা বাড়ি এসে চুলোয় তার দেহটা রেখে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। জ্বলে কালো হয়ে গেল সে। চুলোর ওপর মাটি ঢেলে দিলাম। আমার নিকট দিনার ছিল। তা আমাকে এসব কাজে শক্তি জোগাচ্ছিল। পরের দিন হাড়গুলো বের করে দজলা নদীতে ফেলে দিলাম।

খলিফা তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। তার ঘর থেকে দিনারের থলেটি আনার জন্য একজনকে পাঠালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে থলেটি নিয়ে এল সে। দেখা গেল, থলের ওপর ওই ব্যক্তির নাম লেখা। তার নাম নিয়ে শহরে ঘোষণা করে দেওয়া হল। ঘোষণা শুনে তার বিধবা স্ত্রী দৌড়ে এল—ঘোষিত এই নামটি আমার স্বামীর। কয়েক সপ্তাহ থেকে তার কোনও খোঁজ নেই। সবখানে তালাশ করে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। অমুক তারিখে এক হাজার দিনার নিয়ে বের হয়েছিল। আমার স্বামীর একটি ছোট পুত্রসন্তান আছে। ওই থলেটি তাকে দিতে বলে খলিফা হাবশির শিরচ্ছেদ করার নির্দেশ জারি করলেন। বললেন, তাল লাশটি চুলোয় পুড়িয়ে তার হাড়গুলো দজলা নদীতে ফেলে দেবে।[৫৯]

---

[৫৯] আজায়েবুল কাসাস, মনসুর বিন নাসের আওয়াজি : ১০২

আমার থেকে বদলা নাও

আমিরুল মুমেনিন উমর বিন খাত্তাব ﵁-র সোনালি যুগ। একের পর এক বিজয়ের সুসংবাদ আসছে মুসলমানদের। আমিরুল মুমেনিন মদিনায় অবস্থান করছেন। নির্দেশ ছিল, যুদ্ধের সংবাদগুলো তৎক্ষণাৎ যেন জানানো হয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়া হয়। যুদ্ধ-সম্পর্কিত যে-কোনও সংবাদ যেন দারুল খিলাফায় পৌঁছানো হয়।

আহনাফ বিন কায়স[৬০] ﵁ বর্ণনা করেন–

আমরা কয়েকজন একটি বিরাট সুসংবাদ শোনানোর জন্য আমিরুল মুমেনিন উমর ﵁-র নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় অবস্থান করছ? আমরা বললাম, অমুক জায়গায়।

---

৬০. আহনাফ বিন কায়স তমিমি ﵁-র জন্ম হয় হিজরতের তিন বছর পূর্বে, ৬১৯ খৃস্টাব্দে। ইসলাম প্রকাশ পাওয়ার পর বনু তমিম ইসলামের দিকে মনোযোগী ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। বসরার প্রাথমিক অধিবাসীদের একজন ছিলেন তিনি। কুম, কাশাঁ এবং ইস্পাহান জয় করার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এবং হিরাত, মারভ, বলখ ও অন্যান্য এলাকা জয় করেন। জঙ্গে জামালে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন এবং জঙ্গে সিফ্‌ফিনে তিনি হযরত আলী রাযি.র পক্ষে যুদ্ধ করেন। ৭২ হিজরি মুতাবিক ৬৯১ খৃস্টাব্দে মুস'আব বিন যুবাইরের বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুখতার সাকাফির ওপর আক্রমণ করার জন্য কুফায় যাওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে বনু উমাইয়্যারা অনেক সময় রাজনৈতিক পরামর্শ নিত। [উর্দু দায়েরা মা'আরেফে ইসলামিয়্যা : ২/১৭১-১৭৩]

রাজ্যের খেলায় একজন লোককে দিল মারে. এবং বদলাও নিতে বলেছিলেন (রা:)

তিনি আমাদের সাথে আমাদের তাঁবুর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখানে আমাদের উটগুলোও বাঁধা ছিল। কয়েক দিনের অবিরাম সফরে এবং ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেগুলো। সেগুলোর এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি বললেন–

'এসব সওয়ারির ব্যাপারে তোমাদের মনে কি আল্লাহ ﷻ-র ভয় জাগে না? তোমরা কি জানো না, তোমাদের ওপর এগুলোর হক আছে? রাস্তায় কিছুক্ষণের জন্য এগুলোকে আরামের সুযোগ দিলে না কেন? তা হলে সেগুলো কিছু তরুলতা খেয়ে নিত।'

আমরা আরজ করলাম, আমিরুল মুমেনিন! এই বিশাল বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আমরা দ্রুত দৌড়ে আপনার নিকট এসেছি, যেন আপনার এবং অন্যান্য মুসলমানের মনে খুশি জাগে এবং অন্তর শীতল হয়। এজন্য পথিমধ্যে আমাদের সওয়ারিগুলোকে থামাতে চাইনি।'

আমাদের কথা শোনার পর আমিরুল মুমেনিন ফিরে চললেন। সাথে সাথে আমরাও চলছিলাম। এই সময় একব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হল। বলল, আমিরুল মুমেনিন! অমুক ব্যক্তি আমার ওপর অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে। তার বিরুদ্ধে আপনি আমাকে সাহায্য করুন!

আমিরুল মুমেনিন কোড়া উঠিয়ে তার মাথার ওপর আঘাত করে বললেন–

'আজব তামাশা! তোমরা [অবসর সময়ে] উমরের সামনে তোমাদের সমস্যা নিয়ে আসো না। উমর যখন মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন এসে বল, আমাকে সাহায্য করো! আমাকে সাহায্য করো!'

ওই ব্যক্তি নিজেকে ভালমন্দ বলে ফিরে গেল। আমিরুল মুমেনিন একজনকে পাঠালেন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সে ফিরে এলে তিনি তার হাতে কোড়াটা দিয়ে বললেন, তুমি আমার থেকে বদলা নাও। সে বলল, না! না! আমি বদলা নেব না! বরং তা আল্লাহর জন্য এবং আপনার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আমিরুল মুমেনিন বললেন, এমনটা হবে

না। হয়তো আল্লাহ ﷻ-র জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং এর বদলা তারই নিকট চাও; নচেৎ তা আমার ওপর ছেড়ে দাও। [সে-ক্ষেত্রে তোমাকে আমার থেকে বদলা নিতে হবে।] সে বলল, না! না! আমি আল্লাহ ﷻ-র খুশি ও সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি।

এরপর আমিরুল মুমেনিন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বাড়ি এলেন। তার সাথে আমরাও ছিলাম। তিনি দু' রাকআত সালাত পড়লেন। এরপর নিজেকে লক্ষ করে বললেন–

'ইবনে খাত্তাব! তুমি একজন তুচ্ছ মানুষ ছিলে; আল্লাহ ﷻ তোমাকে উচ্চ আসনে আসীন করেছেন। তুমি পথহারা ছিলে; আল্লাহ ﷻ তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। তুমি এক লাঞ্ছিত ব্যক্তি ছিলে; আল্লাহ ﷻ তোমাকে সম্মানী করেছেন। এরপর তোমাকে লোকদের শাসক বানিয়েছেন। যখন এক ব্যক্তি তার ওপর হওয়া জুলুমের বিরুদ্ধে তোমার সাহায্য চাইতে এসেছে, তখন তুমি তাকে প্রহার করেছ। এখন বল! কিয়ামতের আল্লাহ ﷻ-র দরবারে কী জবাব দেবে?'

আহনাফ বিন কায়স رحمه الله বলেন, এ কথা বলে আমিরুল মুমেনিন নিজেকে এতটা ভর্ৎসনা করতে থাকেন যে, আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেছে–ওই সময় তিনি ছিলেন পুরো দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষ।[৬১]

[৬১] কাসাসুল আরব : ৩/১৩-১৪

আমরাও সাক্ষ্য দিয়েছি

ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহর মুসেল। সেখানকার এক ব্যবসায়ী কিছু গবাদি পশু নিয়ে হলবের উদ্দেশে রওয়ানা হল। এটা তখনকার কথা, যখন ইরাক ও শামের সীমান্ত আলাদা হয়নি। ইতিহাসবিদদের মতে, হলব হল বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। বর্তমানে এটি সিরিয়ার একটি শহর। ওই ব্যবসায়ী তার উপযোগী একটি হোটেলে অবস্থান করল। এইসময় এখানে পশুর মেলা বসত। সে তার পশুগুলো বিক্রয় করে মুসেলের উদ্দেশে রওয়ানা হল।

এক ডাকাত ওই ব্যবসায়ীর পিছু নিল। তার প্রতি লক্ষ রাখতে লাগল। তার জানা ছিল, এই ব্যবসায়ীর নিকট বিরাট অংকের অর্থ আছে। পথিমধ্যে একটি গাছের নীচে আরাম করার জন্য ব্যবসায়ী নামল। ডাকাত তার ওপর আক্রমণ করে বসল। তার ঘাড়ের ওপর খঞ্জর ধরে বলল, যা-কিছু আছে, সব বের করে আমার হাতে দাও। এদিক-ওদিক তাকাল ব্যবসায়ী। চিৎকার করল। কিন্তু বিরাণ জায়গা–শুনবে কে? নীরবে তার মাল ডাকাতের হাতে তুলে দিল। এরপর ডাকাত তাকে হত্যা করতে চাইল। ব্যবসায়ী বলল, আমার সব মাল তো তুমি নিয়ে নিলে। এখন আমাকে মারার উদ্দেশ্য কী? আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে। আমার ওপর দয়া করো। আমাকে মেরে ফেলো না! কিন্তু ডাকাতের মাথায় তখন খুন সওয়ার। তার অনুনয়-বিনয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি সে। তাকে হত্যা করতে শুরু করল। ব্যবসায়ী নিরুপায়। ডানে-বাঁয়ে তাকাল–কোনও সাহায্যকারী যদি পাওয়া যায়। হঠাৎ তার চোখ পড়ল গাছের ওপর। একজোড়া কপোত-কপোতী বসে আছে। তার প্রাণ তখন যায় যায় অবস্থা। খঞ্জর দিয়ে একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছিল ডাকাত। সে কবুতরদুটিকে লক্ষ করে বলল–

'হে কবুতর! তোমরা সাক্ষ্য থেকো!'

ডাকাত তাকে হত্যা করে ফেলল। তার শেষকথাগুলো বড়ই উপহাসের ঢঙে আওড়াতে লাগল–

'হে কবুতর! তোমরা সাক্ষ্য থেকো!'

নিজের পথে রওয়ানা হল সে। রাস্তায়ও তার কথাগুলো বার-বার বলতে লাগল। তার জন্য এটা যেন একটি মজার কথা ছিল। মরার সময় ব্যবসায়ী কথাগুলো বলে গিয়েছিল।

এদিকে ব্যবসায়ীর পরিবারের লোকজন তার আসার অপেক্ষা করছিল। দিন পেরিয়ে যাচ্ছিল–কিন্তু তার কোনও হদিস পাওয়া গেল না। পিতার খোঁজে তার বড় ছেলে হলব গেল। সেখানে তাকে জানানো হল, অমুক তারিখে সে হলব এসেছিল। অমুক জায়গায় অবস্থান করেছিল; অমুকের নিকট পশু বিক্রয় করেছিল; অত টাকা পেয়েছিল, এবং কয়েকদিন পর হলব হতে কিছুটা দূরে কেউ একজন তাকে খঞ্জর দিয়ে হত্যা করে। তার পুরো টাকা ছিনিয়ে নেয়। অমুক কবরস্তানে তোমার পিতাকে দাফন করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীর ছেলে শহরের হাকেমের নিকট গেল। এরপর কাজির নিকট গেল, এবং তার পিতার বন্ধুদের নিকট গেল–কোনওভাবে হত্যাকারীকে সনাক্ত করা যায় কি না। সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ফলাফল শূন্য। কারণ, সাক্ষীও কেউ ছিল না; আর হত্যাকারীরও কোনও চিহ্ন ছিল না। নিরাশ হয়ে সে মুসেল চলে গেল। সেখানকার শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে সাহায্যের আবেদন করল। সে তৎক্ষণাৎ হলবের শাসককে চিঠি লিখল। আরেকবার হত্যাকারীর খোঁজ শুরু হল। কিন্তু সবই বেকার গেল। হত্যাকারীকে ধরা গেল না।

পরাজিত ও ক্লান্ত হয়ে তারা বসে পড়ল। মুকাদ্দমার নথীপত্র গুটিয়ে ফেলা হল।

সময় পেরোতে দেরি লাগে না। কত বছর পেরিয়ে গেল। কত হাকেম আর শাসকের বদল হল। কত কাজি এল, কত কাজি গেল। ব্যবসায়ীর আত্মীয়স্বজনও ধীরে ধীরে তা ভুলে গেল। সন্তানরাও ধৈর্যধারণ করল।

কিন্তু এক ব্যক্তি ছিল, যে এই ঘটনাটি ভোলেনি। সে ছিল, ওই হত্যাকারী। যখনই কোনও কবুতরের জোড়া দেখত, নিহত ব্যক্তির কথা তার মনে এসে যেত–হে কবুতর! তোমরা সাক্ষী থেকো!

একবার তার এক নিকটাত্মীয়ের একটি অনুষ্ঠান ছিল। এরা ছিল অনেক বড় ধনী। তাই অনেক লোক আমন্ত্রিত ছিল। তাদের মধ্যে শহরের বড় বড় হাকেমও ছিল। হরেক রকম খাবার সামনে ছিল। একটি বিরাট ভাণ্ডের ওপর থেকে ঢাকনা তুলল হত্যাকারী। দুটো ভূণা কবুতর ছিল সেখানে। একটি লম্বা নিঃশ্বাস নিল সে। তার চোখের সামনে একটি দৃশ্য ভেসে উঠল–একটি গাছ, তার ওপর বসা দুটি কবুতর, এবং নীচে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহ। নিহতের কথাটি তার কানে গুঞ্জরিত হল–হে কবুতর! সাক্ষী থেকো!'

এরপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে জোরে জোরে অট্টহাসি হাসতে লাগল। সবার চোখ ঘুরে গেল তার দিকে–ব্যাপারটা কী? সে কবুতরের দিকে ইশারা করে হো হো করে হাসতে লাগল। একটি অদৃশ্য শক্তি তার মুখ খুলিয়ে দিল। নিমন্ত্রণের কথা ভুলে লোকদের হত্যার ঘটনা শোনাতে লাগল। হত্যার প্রতিটি বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করল। কোনও কথাই বাদ পড়েনি। হতভম্ব হয়ে লোকজন তার কাহিনী শুনছিল।

গোপন কথা ফাঁস করার পর তার অনুভব হল–এ কী ভুল করলাম! বছরের পর বছর যে কথা গোপন রেখেছি, অনেক আগেই মানুষ যা ভুলে গেছে, যে মুকাদ্দমার নথীপত্র সব গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, সেটা আমি নিজেই প্রকাশ করে দিলাম!...কিন্তু তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে–ফেরানোর উপায় নেই।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুরো হলবে প্রচার হয়ে গেল। সবার মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগল। হলবের শাসকও বিষয়টি জানতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করার নির্দেশ জারি করলেন। পুলিশ-প্রধানের পক্ষ হতে আবার হত্যা মামলা দায়ের করা হল। সাক্ষ্যের জন্য নিমন্ত্রণে উপস্থিত লোকদের ডাকা হল। তাদের সবাই নিজ নিজ বয়ান দিল। অপরাধীকে ডেকে এনে সাক্ষীদের বয়ান তার সামনে রাখা হল।

এখন আর স্বীকার না করে উপায় নেই। কাজি তাকে ফাঁসির সাজা শোনালেন।

হলবের হাকেম বললেন, لَقَدْ شَهِدْنَا 'আমরা সাক্ষ্য দিলাম'।

হলবের কাজি বললেন, لَقَدْ شَهِدْنَا 'আমরা সাক্ষ্য দিলাম'।

পুলিশ-প্রধান বললেন, لَقَدْ شَهِدْنَا 'আমরা সাক্ষ্য দিলাম'।

লোকেরা বলল, لَقَدْ شَهِدْنَا 'আমরা সাক্ষ্য দিলাম'।

ফাঁসির একদিন আগে তার স্ত্রী তার সাথে শেষ সাক্ষাৎ করতে এল। জিজ্ঞাসা করল, এত বছর যখন তোমার এই অপরাধের ওপর পর্দা পড়ে ছিল, তখন কীভাবে এ রহস্য ফাঁস করে দিলে? জবাবে সে বলল–

'একটি অদমনীয় ইচ্ছাশক্তি আমার ইচ্ছাকে অকার্যকর করে দিয়েছে এবং কথা বলতে বাধ্য করেছে।'

তার ফাঁসির দৃশ্য দেখার জন্য পরের দিন সকালে অনেক লোক জমায়েত হল। ফাঁসির রশি যখন তার গলায় পরানো হচ্ছিল, তখন সে বলল–

'আমার মুখ থেকে কথা বের হয়নি। বরং দাওয়াতের দিন আমার পাত্রে যে কবুতর ছিল, সেগুলোর মুখ থেকে বের হয়েছে।'

জল্লাদ তার রশি টেনে দিল। লোকজন এক অপরাধীকে তার কর্মফল পেতে দেখল। তারপর হঠাৎ উপস্থিত সবাই 'আল্লাহু আকবার! আলহামদুলিল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে শুরু করল। তখন লোকজন দেখতে পেল, হত্যাকারীর মাথার ওপর দুটি কবুতর বসে আছে। সবাই একসাথে বলে উঠল,

لَقَدْ شَهِدَتَا 'এ কবুতর-দুটিও সাক্ষ্য দিল।'

এই মুকাদ্দমায় দুনিয়ার আদালত কিছুই করতে পারেনি। হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে পারেনি। দীর্ঘ দিন যাবৎ হত্যাকারী স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র আদালত হত্যাকারীর জন্য উঁৎ

পেতে ছিল। তার গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত সে আইনের হাতে ধরা পড়ল। তাকে কিছুটা সময়ের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কতদিন?.....আর অবশেষে কবুতর সাক্ষ্য দিল। এক মজলুম তার ডাকের সাড়া পেয়ে গেছে।

ঘুষের প্রভাব

আব্বাসী খলিফা মাহদির[৬২] যুগ। বাগদাদের কাজি ছিলেন আক্বেবা বিন ইয়াজিদ। একদিন যোহরের সময় হঠাৎ তিনি উপস্থিত হলেন খলিফার নিকট। ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খলিফা অনুমতি দিলেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি সালাম দিলেন। এরপর বললেন, খলিফাতুল মুসলেমিন! আমাকে কাজি নিয়োগ দেওয়া সম্পর্কিত অঙ্গীকারপত্র যে বাক্সে রাখা হয়েছে, সেটা আনান। কারণ, আমি এই পদ থেকে ইস্তিফা দিতে চাই। আপনার নিকট আবেদন, আমার ইস্তিফা কবুল করুন!

আক্বেবা বিন ইয়াজিদের কথায় খলিফা মাহদি মনে করলেন, প্রশাসনের দায়িত্বশীল কেউ হয়ত তার কোনও ফয়সালা উপেক্ষা করেছে। তাই তিনি ইস্তিফা দিতে চাইছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ

---

৬২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আলমাহদি বিন মুনসুর আব্বাসি ১৫৮ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর পরের বছরই মারভের [খোরাসানের] হাকিম মুকান্না'মাবুদ হওয়ার দাবি করে। সে বুসাম কিল্লায় তার ৩২ হাজার অনুসারী নিয়ে অবরুদ্ধ হয়। মাহদির সিপাহসালার সাঈদ হিঁরিশি তাকে সমূলে ধ্বংস করে। মুকান্না' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়। ১৬৫ হিজরিতে হারুন রশিদকে মাহদি কুস্তুনতুনিয়ার অভিযানে প্রেরণ করেন। রোমীরা বাৎসরিক ৭০ হাজার দিনার কর দেওয়ার ওয়াদা করে বশ্যতা স্বীকার করে। এবং চুক্তিবদ্ধ হয়। মাহদি বসরা, ইয়ামামা এবং বাহরাইনের জিন্দিকদের সমূলে নিপাত করেন। তিনি মসজিদে হারামও প্রশস্ত করে নির্মাণ করেন। হিজরি ১৬৯ সালের মুহররম মাস, মুতাবিক ৭৮৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/৮৯৩-৯০১]

ঘুষ না নেওয়ার জন্য চাকুরী থেকেই অব্যহতি চান

কি আপনার ফয়সালা মানতে অস্বীকার করেছে, যার ফলে আপনি এ দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চাইছেন?

কাজি বললেন, এ ধরনের কোনও ব্যাপার নয়।

খলিফা বললেন, তা হলে কাজির দায়িত্ব হতে অব্যহতি চাওয়ার কারণ কী?

কাজি সাহেব বললেন, আমিরুল মুমেনিন! মূল কারণ হল– এক মাস আগে দু' ব্যক্তি আমার নিকট একটি মুকাদ্দমা দায়ের করেছিল। মুকাদ্দমাটি ছিল জটিল। উভয়পক্ষের নিকটই স্পষ্ট সাক্ষী-প্রমাণ রয়েছে। ফয়সালা শোনাতে বিলম্ব হতে পারত। কারণ, উভয়পক্ষের দলিল মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, আর এতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাদের মুকাদ্দমা শোনার পর এ আশা নিয়ে উভয় পক্ষকে ফেরত পাঠিয়েছি, যেন তারা পরস্পরে আপস করে নেয়, এবং ঝামেলাটি মিটে যায়। এরইমধ্যে তাদের এক পক্ষ কোনওভাবে জানতে পারল, পাকা খেজুরের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। অনেকগুলো উত্তম খেজুর সংগ্রহ করে দারোয়ানকে অনেক বড় অংকের ঘুষ দিয়ে সে আমার নিকট পৌঁছাতে বলে। এত উন্নত ও উত্তম খেজুর আমি জীবনে আর দেখিনি। কিন্তু দারোয়ান যখন খেজুরের ভাণ্ড আমার নিকট হাজির করল, তাকে ধমকিয়ে-ধামকিয়ে সেগুলো ফেরত পাঠালাম। পরের দিন যখন উভয়পক্ষ আদালতে উপস্থিত হল, তখন তাদেরকে আমি সমানভাবে দেখতে পারছিলাম না।

আমিরুল মুমেনিন! হাদিয়া কবুল না করার পরও আমার অবস্থা এরূপ। কবুল করলে কী অবস্থা হত?

আমিরুল মুমেনিন! হিলা-বাহানায় শয়তান আমার দীন ও পরকাল বরবাদ করতে পারত। কারণ, প্রত্যেক মানুষের সাথেই শয়তান লেগে আছে। তার জালে ফেঁসে মানুষ ধ্বংস ও বরবাদ হচ্ছে। তাই আমিরুল মুমেনিন! আমাকে এই দায়িত্ব হতে অব্যহতি দিন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে এর বিনিময় দেবেন। এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে ক্ষমা করবেন।[৬৩]

---

৬৩. কাসাসুল আরব : ৩/৭৫ ; আলইকুদল ফরীদ :১৭০

খলিফার ছেলের খলিফা হওয়া ও
-কতোয়ালের সাথে আচরণ

বিবেকের ফয়সালা

আব্দুল্লাহ বিন মালেক বর্ণনা করেন–

খলিফা মাহদির খেলাফতকালে আমি তার কতোয়াল [পুলিশপ্রধান] ছিলাম। অনেক সময় তিনি তার ছেলে হাদির সঙ্গীদের আমার নিকট পাঠাতেন। আমাকে নির্দেশ দিতেন, এদের যেন শাস্তি দিই এবং বন্দীশালায় ফেলে রাখি। তার উদ্দেশ্য ছিল, ছেলেকে তার সহচরদের থেকে নিরাপদ রাখা।

ওইসময় হাদিও আমার নিকট সংবাদ পাঠাত, তার সঙ্গীদের সাথে আমি যেন ভাল আচরণ করি এবং শাস্তি কম করে দিই। কিন্তু তার কথা আমি রাখতাম না–খলিফা যে নির্দেশ দিতেন, সেটাই পালন করতাম।

খলিফা মাহদির পর তার পুত্র হাদি যখন খলিফা হলেন, তখন আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, আমার ভাল হবে না। অবশ্যই তিনি আমার খবর নিয়ে ছাড়বেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি কাফন পরে, মৃতের সুগন্ধি লাগিয়ে খলিফা হাদির দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। তার সামনে চামড়ার ফরশ [যার ওপর অপরাধীকে হত্যা করা হয়।] বিছানো ছিল। তলোয়ারও রাখা ছিল। তাকে সালাম করলে তিনি বললেন, আল্লাহ ﷻ তোমার কল্যাণ না করুক। তোমার কি স্মরণ আছে, অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট পাঠিয়ে আমিরুল মুমেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে ভালভাবে পিটাই করো। কিন্তু আমি যখন তার সুপারিশ করলাম, তুমি তা কবুল করলে না। আমার কথাটা প্রত্যাখ্যান করলে।

এভাবে তিনি তার কয়েক সহচরের কথা বললেন।

আমি বললাম, আমিরুল মুমেনিন। আপনার কথা একেবারেই সঠিক। কিন্তু আমার কি কিছু বলার সুযোগ আছে?

খলিফা বললেন, হ্যাঁ; বলো! কী বলতে চাও?

আমি বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনি ঠিক ঠিক বলুন–আপনি আমাকে একটি দায়িত্ব দিলেন, যা আপনার পিতাও আমাকে দিয়েছেন। এরপর আপনি কোনও হুকুম দিলেন, যেমনটা আপনার পিতা দিয়েছেন। কিন্তু আপনার পুত্রও আমাকে কোনও নির্দেশ দিল, যা আপনার নির্দেশের পরিপন্থী। এরপর যদি আপনার নির্দেশটি না মেনে আপনার পুত্রের নির্দেশ পালন করি, তবে কি আপনার ভাল লাগবে?

খলিফা বললেন, না! না!

আমি বললাম–

'তা হলে আপনার জন্যও আমি একজন বিশ্বস্ত কতোয়াল, যেমনিভাবে আপনার পিতার জন্য ছিলাম।'

আমার কথা শোনার সাথে সাথে খলিফার ক্রোধ কর্পূরের মত উবে গেল। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন। আমি তার হাতে চুমো খেলাম। এরপর একজোড়া রাজকীয় পোশাক আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর আমি বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বাড়ি পৌঁছে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, খলিফার আশপাশের লোকেরা আমার বিরুদ্ধে তাকে উস্কে দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ফলে আমাকে ক্ষমা না করে আগে তার [হাদি-র] কথার বিরোধিতা করার কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারেন, কিংবা হত্যাও করতে পারেন।

ঘরে বসে ছিলাম, সামনে রুটি-তরকারি রাখা ছিল, বাচ্চাদের গরম গরম খাওয়াচ্ছিলাম, এ সময় দরজার বাইরে শোরগোল শোনা গেল। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে আমার মনে হল, ভূমিকম্প এসে গেছে। বললাম, আল্লাহর কসম! মৃত্যুর ফেরেশতা এসে গেছে। এ সময়ে

দরজা খুলে গেল। খলিফার চাকর-সেবক আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যখানে খলিফাও ছিলেন। তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালাম, এবং খলিফার হাতে চুমো খেলাম। তিনি বললেন, আরে আল্লাহর বান্দা! তুমি ফিরে আসার পর আমি তোমার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকলাম। ভাবলাম, মজলিসে বসলে তোমার বিরোধীরা তোমার বিরুদ্ধে আমার কান ভারী করবে। তোমার ব্যাপারে আমার যে সুধারণা ছিল, তা কুধারণায় বদলে যাবে। আর তোমার ব্যাপারে আমার খারাপ ধারণা হলে তোমার সুখ-শান্তি শেষ হয়ে যাবে। তাই ভাবলাম, নিজেই তোমার নিকট এসে তোমার সাথে ভাব করি। তোমাকে জানিয়ে দিই যে, তোমার বিরুদ্ধে কোনও কিছুই আমার মনে নেই। চলো! তোমার সাথে খাবারে আমাকেও শরিক করো।

আব্দুল্লাহ বিন মালেক বর্ণনা করেন, উপস্থিত যে তরকারি ছিল, তা-ই খলিফার সামনে উপস্থিত করলাম। সানন্দে তিনি তা গ্রহণ করলেন। সিপাহিদের নির্দেশ দিলেন, আব্দুল্লাহর জন্য যা-কিছু এনেছ, সামনে আনো। খচ্চরের ওপর করে অনেক জিনিসপত্র এবং দেরহাম আমার ঘরে নামাল। খলিফা বললেন, এই সামান্য জিনিস এবং দেরহামগুলো রাখো। আর খচ্চরগুলোও রেখে দাও। তা ছাড়া আমার পিতা তোমাকে যে পদে রেখেছিলেন, সে-পদেই আমি তোমাকে বহাল রাখছি।

এ কথা বলে খলিফা চলে গেলেন। এরপর থেকে আমি খলিফার একজন কাছের মানুষ হিসেবে গণ্য হতে লাগলাম।[৬৪]

৬৪.কাসাসুল আরব : ৩/৭৬ ; আলইকদুল ফরিদ : ১২৪ ; আসরুল মামুন : ১/১০৭

শেষমুহূর্তে মাফ

তায়েফ থেকে দক্ষিণ দিকে চলতে থাকুন। এক সারি পাহাড় দেখতে পাবেন। ছোট ছোট গ্রামও আছে সেখানে। এ এলাকাতেই নবীজির ﷺ শৈশব কেটেছে। এ এলাকাতেই থাকতেন হালিমা ؓ। এর থেকে একটু নীচের দিকে নামুন। সেখানে রয়েছে আবহা এবং খামিস মাশিত এলাকা। যা গরমের সময়ে নাতিশীতোষ্ণ, বরং কিছুটা শীতল এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই পাহাড়গুলোয় এখনও বকরি চরতে দেখতে পাবেন।

আবু মাশহুদ নামক এক রাখাল বকরির পাল নিয়ে সকালে বের হত। বৃষ্টির ফলে পাহাড়ে যেসব তরুলতা জন্মাত, সেগুলো ছিল বকরির খোরাক। সন্ধ্যার সময় ছোট ছোট নালা থেকে পানি পান করিয়ে বকরিগুলোকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হত।

একদিন সন্ধ্যা হলে বকরিগুলো ফিরে এল। কিন্তু আবু মাশহুদ এল না। রাতের অন্ধকারে তার পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তার খোঁজে বের হল। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরল। পরের দিন সকাল বেলায় আবারও গ্রামের কয়েকজন যুবক তার খোঁজে বের হল। পাহাড়ের কোলঘেঁষে একটি ঝরনার নিকট তার মৃতদেহ দেখতে পেল তারা। দেহে বন্দুকের গুলির নিশান। পুলিশকে অবহিত করানো হল। ঘটনা, অবস্থা এবং নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, অন্য কোনও রাখালের সাথে তার ঝগড়া হয়েছিল। রাখালদের পারস্পরিক ঝগড়া একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। পানি আগে পান করানো নিয়েই সাধারণত তাদের ঝগড়া-বিবাদ হত। তবে এই ঝগড়া ওইদিন না হলেও পরের দিন সমাধা হয়ে যেত।

আবু মাশহুদের আত্মীয়দের পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, কার ওপর তাদের সন্দেহ হচ্ছে, কিংবা কার সাথে ঝগড়া হতে পারে?

পরিবারের লোকজন বলল, ও ছিল সিধেসাদা ধরনের লোক। কারওই কোনও ক্ষতি সে করত না। কারও সাথে তার ঝগড়াও ছিল না। তবে অমুক অমুকের সাথে মিলে বকরি চরাত।

সামান্য অনুসন্ধানের পর পুলিশ আলী বিন আব্দুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। পরে সে তার অপরাধ স্বীকার করল। আদালতে মুকাদ্দমা চলল। সাক্ষী ও স্বীকারোক্তির পর কাজি হত্যাকারীকে হত্যার ফয়সালা শোনালেন।

নিহতের বড় ছেলের বয়স তখন সতেরো; আর ছোট ছেলে দুগ্ধপোষ্য। কাজি সাহেব রায় লিখলেন, যতক্ষণ না এই ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকরী করা যাবে না। হত্যাকারীকে জেলে পাঠানো হল। তখন তার বয়স ছিল ৪২ বছর। মৃত্যুর জন্য তাকে জেলে আঠারো বছর অপেক্ষা করতে হল। কারণ, ছোট ছেলের বয়স আঠারো বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত এই হুকুম কার্যকর করা যাবে না। তাকে তার অপর ভাইয়ের সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে–হত্যাকারীকে ক্ষমা করবে, না কি তার থেকে পিতার খুনের বদলা নেবে।

এই পুরো সময়টা আলী বিন আব্দুর রহমান দুটি অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাল–নিহতের আপনজন তাকে ক্ষমা করে দেবে, না কি তাকে হত্যার সাজা পেতে হবে।

আবু মাশহুদের ছোট পুত্র এখন ইয়াতিম হয়ে গেছে। তার নামও ছিল ইয়াতিম। কেন যে এ নাম হল, আল্লাহ মালুম। এরপর একসময় তার বয়স আঠারো বছর হল। এখন তাকে তার ভাইদের সাথে ফয়সালা করতে হবে–পিতার হত্যাকারীকে মাফ করা হবে, না কি তার থেকে বদলা নেওয়া হবে। এদিকে গোত্রের প্রধানরা তাদের দস্তুর অনুযায়ী একত্রিত হল। তারা মৃতের ওয়ারেসদের বলল, খুনের মূল্য নিয়ে নাও, এবং হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দাও। সৌদি আরবে খুনের মূল্য মোটামুটি এক লাখ বিশ হাজার রিয়ালের মত। কিন্তু ওয়ারেসদের এই এখতিয়ার থাকবে যে, তারা চাইলে এই পরিমাণ অর্থই গ্রহণ করবে, কিংবা ইচ্ছা করলে তার চেয়ে বেশিও চাইতে পারে। এদিকে ওয়ারেসরা খুনের দাম নিতে অস্বীকার জানাল–তারা তা কবুল করবে

না। হত্যাকারীর গোত্রের পক্ষ থেকে খুনের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকল। তারা দশ লক্ষ সৌদি রিয়াল দেওয়ার ঘোষণা দিল।

আলী বিন আব্দুর রহমান তার জেলের অবস্থা বর্ণনা করে বলল, যখন জেলে যাই, তখন আমার বয়স ছিল ৪২ বছর। জোয়ান ছিলাম। এখন আমার বয়স ষাট। জেলে থাকাও একটি শাস্তি। আট বছর ছিলাম বিলজারশি প্রদেশের জেলে। বাকি সময় কাটিয়েছি আলবাহা জেলে। নতুন কোনও কয়েদি এলে সে তার ঘটনা শোনাত। আমরা একে অপরের ঘটনা হাজারো বার শুনেছি। এ সময়ে জেলে কুরআন পড়তে শিখলাম। লেখাপড়া শিখলাম। কিছু বইপুস্তকও পড়তাম। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমার ভাগ্যের ফয়সালার সময় এল। এদিকে আমার গোত্রের লোকজন আমার মাফির জন্য দৌড়ঝাপ করে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও আশার আলো দেখা গেল না।, আমি আশা-নিরাশার মাঝে দোদুল্যমান ছিলাম।

একদিন জেলার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, আপস করার সকল চেস্টা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই আগামী কাল তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। তার নির্দেশ শোনার পর আমার মনে সামান্যতম ভয়ও জাগেনি। আসলে আঠারো বছর জেলে থাকার ফলে সকল ভয় দূর হয়ে গেছে। আর এমনিতেও জীবন থেকে আমি নিরাশ হয়ে গেছি। আগামী কাল হবে আমার জীবনের শেষ দিন। চোখ বন্ধ করে নিলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। ভাবছিলাম...ছোটবেলার কথা, যৌবনের কথা,...বিবি-বাচ্চাদের কথা,...আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কথা। গোত্রের লোকদের কথাও মনে এল, যারা আমার জন্য দশ লাখ রিয়ালের সাথে একটুকরো জমিনও তাদেরকে দিতে চেয়েছিল। কুরআনের যতটুকু মুখস্থ ছিল, পড়ে নিলাম। সেই রাতটা ছিল আমার জীবনে একটি বিস্ময়কর রাত। পুরো রাত ঘুম আসেনি। যিকির-আযকার এবং নফল সালাতে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলায়ই জেলার এলেন। আমার পায়ে বেড়ি পরানো হল। হাতে হাতকড়ি। অশ্রুনয়নে সাথিরা বিদায় জানাল। বড়ই আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেয়ালগুলোর দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে পুলিশের কড়া পাহারায় বেরিয়ে পড়লাম। জেলের গাড়ির দরজা খোলা ছিল। ধাক্কা দিয়ে আমাকে ভিতরে ফেলা

হল। কিছুক্ষণ পর কিসাসের ময়দানে নামানো হল। চোখ বাঁধা ছিল। তবে লোকজনের কথা শুনতে পারছিলাম। এটা হল খামিসমশিতের কেন্দ্রীয় চক। আমার হত্যাদৃশ্য দেখার জন্য অনেক মানুষ উপস্থিত হয়েছে। একদিন আগেই আমার আপনজন আমার থেকে বিদায় নিয়েছে। আমাকে বসিয়ে আদালতের কর্মকর্তা আমার অপরাধ ঘোষণা করল। আমার অপরাধ স্বীকার, কাজির ফয়সালা, সুপ্রিম কোর্টের ফয়সালা, সব শোনাল। নিঃশব্দে শুনছিল সবাই। এর পর জল্লাদকে নির্দেশ দেওয়া হল, অপরাধীর শিরচ্ছেদ করা হোক। সামনে অগ্রসর হয়ে সে তলোয়ার উত্তোলন করল। আমি কালিমা পড়ে ভাবছিলাম, এখনই আমার ধড় থেকে ঘাড়টা আলাদা হয়ে যাবে। সকল শক্তি একত্রিত করে নিলাম। এ সময় হঠাৎ একটি আওয়াজ গর্জে উঠল–

'আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিলাম!'

এটা ছিল নিহতের বড় ছেলের আওয়াজ। লোকজন, যারা কল্পনায় আমার লাশ দেখছিল, তারা এখন আমার ক্ষমার ঘোষণা শুনতে পেল। পুরো সমাবেশে 'আল্লাহ আকবার!' ধ্বনি গর্জে উঠল। সবার মুখে ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার বা অন্য কারওই ধারণা ছিল না যে, আমি ক্ষমা পেতে পারি। আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। আবার আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে জেলে নেওয়া হল। আমাকে ক্ষমা করা হলেও জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু আইনি প্রক্রিয়া আছে। সেগুলো সেরেই তবে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আমার বা আমার আত্মীয়-স্বজনের, কারওই জানা ছিল না, কোন দিন মুক্তি পাওয়া যাবে।

অবশেষে সেদিন এসে গেল। জেলার আমাকে জানালেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষ। তাই এখন তোমাকে মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

আমার জীবনের নতুন দিন শুরু হচ্ছে। খুশির সেই মুহূর্তে এতটুকু সময়ও পাইনি যে, আত্মীয়দের আমার মুক্তির সংবাদ জানিয়ে বলব, আমি আসছি। জেল থেকে বেরোলাম। একটি টেক্সি দেখতে পেলাম। ইশারায় ডেকে এনে সেটায় উঠে বসলাম। নিজের ঘর এবং আত্মীয়স্বজনের কথা মনে ভাসছিল। ভাবছিলাম, কখন তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছব।

কিন্তু হঠাৎ আমি একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। সর্বপ্রথম আবু মাশহুদের ঘরে আমার যাওয়া উচিত। সকলের শোকরিয়া আদায় করা উচিত। তার সন্তানদের, তার ভাইদের, এবং তার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের। আঠারোটি বছর। সবকিছুই বদলে গেছে। আবু মাশহুদের গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করলাম ড্রাইভারকে। কিছুক্ষণ পর আবু মাশহুদের পরিবারের লোকদের সাথে আমার মুলাকাত হল। তাদের বললাম–

'আপনাদের শোকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই। আমি আপনাদের শোকরিয়া আদায় করছি–এ কথাই যথেষ্ট নয়। এর প্রকৃত বিনিময় তো আল্লাহ ﷻ-ই আপনাদের দেবেন।' এসব কথা বলছিলাম, আর তাদের সাথে কোলাকুলি করছিলাম, তাদের মাথায় চুমো নিচ্ছিলাম।

এরপর আবু মাশহুদের বড় ছেলে মাশহুদ বলল, বসো! আমি তোমাকে আমাদের ঘটনা বলছি।

তোমার তো জানা আছে, তোমার গোত্রের পক্ষ থেকে দশ লাখ রিয়ালের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরে একটি জমিনও তার সাথে পেশ করা হয়েছিল। তা ছাড়া অনেক লোকই আমাদের ক্ষমা করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সবগুলো প্রস্তাবই আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। একদিন পরিবারের সবাই বসলাম। মা-ও ছিলেন সেখানে। আমার ছোট ভাই ইয়াতিম যুবক হয়ে উঠেছে। সবাই আমাকে লিখে দিল যে, আমি যে ফয়সালাই করি, তা তাদের মঞ্জুর। যে-ই আমার নিকট সুপারিশ নিয়ে আসত, তাতে আমার ক্রোধ আরও বেড়ে যেত। চোখের সামনে বাবার চেহারা ভেসে উঠত। তাই বদলা নেওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। এজন্যই প্রত্যেকের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছি। একই জবাব ছিল আমার–টাকা নয় বদলা চাই; শুধুই বদলা! এর ফলে কারও কথা মেনে নেওয়া হয়নি।

পরে একদিন আমরা সবাই একসাথ হলাম। তাদের বললাম, তোমাদের কী মত–যদি আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়? এটা আমাদের বাবার পক্ষ থেকে সদকা হবে। এ নিয়ে ওই দিন অনেক চিন্তাভাবনা করলাম। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, আল্লাহ ﷻ-র খুশির জন্য মাফ করে দেওয়া চাই। আর

আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছি যে, এ কথাটি আর কেউ জানবে না।

এদিকে আদালতি কার্যক্রম চলছি। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল, আপস করার কোনও আশা বা উপায় আছে কি? কিন্তু আমরা পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানালাম। আলবাহা-র পুলিশের নিকট হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ এসে পৌঁছল। শেষবারের মত আমাকে জানানো হল, তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে, না কি বদলা নেবে? আমি ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানালাম। এবং কিসাস নেওয়ার জন্য চাপ দিলাম। আর পুলিশের লোকদের জানালাম, কিসাসের সময় আমি আমার ভাই এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে উপস্থিত থাকব।

এরপর তোমাকে কিসাসের জায়গায় নেওয়া হল। পট্টি বাঁধা ছিল তোমার চোখে। আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলে না। আদালতের কর্মকর্তা তোমার অপরাধ, তোমার স্বীকারোক্তি এবং কাজির ফয়সালা পড়িয়ে শোনাল। এরপর জল্লাদ তলোয়ার বের করল। তোমার ঘাড়ে মারতে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে বাধা দিলাম, এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তার হাত চেপে ধরলাম। আর সাথে সাথে ঘোষণা করলাম যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।

আমি কারও প্রশংসা বা গুণকীর্তন চাই না। এই সবই আমি আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছি। যদি আমি আমার প্রশংসা বা নামডাক চাইতাম, তা হলে যখন আমার নিকট সুপারিশ নিয়ে আসা হয়েছিল, আমাকে দশ লাখ রিয়াল প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা কবুল করে নিতাম। কিন্তু আমি আমার পিতার পক্ষ থেকে সদকা করেছি। আল্লাহ ﷻ তা কবুল করুন!

প্রিয় পাঠক! একটি সোনালি ফয়সালা দ্বারা মাশহুদ তার গোত্রের জন্য একটি সোনালি অধ্যায় সৃষ্টি করল।[৬৫]

---

৬৫. ঘটনাটি সৌদি আরবের দৈনিক পত্রিকা 'উকায' সংখ্যা : ৮৪৩৯-১৪১০ থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ইবরাহিম হাজেমিও ঘটনাটি তার বই আলফরজু বা'দাশ্‌শিদ্দায় উল্লেখ করেছেন। সামান্য পরিবর্তনসহ নিজ ভাষায় সেটা উল্লেখ করা হল।

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা:)
[illegible]

মজলুমের আহ্

ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেন, কূফার লোকজন এসে উমর (রা.)-র নিকট সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস[৬৬] (রা.)-র [তিনি তখন কূফার হাকেম ছিলেন।] বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তাকে অপসরণ করে উমর (রা.) আম্মার (রা.)-কে সেখানকার হাকেম নিযুক্ত করলেন। সা'দ (রা.)-র বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ ছিল, তার একটা হল, তিনি ভালভাবে সালাতও পড়াতে পারেন না।

সা'দ (রা.)-কে ডেকে উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন–

'আবু ইসহাক! [এটা তার উপনাম।] কূফাবাসীর অভিযোগ, আপনি সালাতও ঠিকভাবে পড়াতে পারেন না।'

জবাবে সা'দ রাযি. বললেন–

---

৬৬. বনু সা'দ গোত্রের ছিলেন হযরত সা'দ (রা.)। প্রথমবার ওহি নাযিল হওয়ার পর সপ্তম দিন তিনি আবু বকর (রা.) দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। নবীজি ﷺ-এর সাথে সবগুলো যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনটি পতাকার একটি নবীজি তাকে অর্পণ করেছিলেন। পারস্যদের বিরুদ্ধে অভিযানে উমর (রা.) তাকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তার নেতৃত্বেই কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। উমর (রা.)-র পরামর্শে তিনি 'হিরা'র কয়েক মাইল দক্ষিণে কূফার শহর আবাদ করেন। হযরত উমর (রা.) এবং উসমান (রা.)-র যুগে তিনি কূফার গভর্নর ছিলেন। তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন। ৫৫ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [এটলাসে সীরতে নববী : ১৯৯-২০০]

'আল্লাহর কসম! আমি তো তাদের রাসুল ﷺ-এর সালাত পড়াই। তাতে কোনওরূপ কমবেশি করি না। ইশার প্রথম দু' রাকআতে কিরাআত লম্বা করি। আর শেষ দু' রাকআতে শুধু সূরায়ে ফাতেহা পড়ি।'

উমর ؓ বললেন, 'আবু ইসহাক! আপনার ব্যাপারে আমার এই ধারণাই ছিল।'

এরপর সা'দ ؓ-র সাথে একব্যক্তিকে দিয়ে উমর ؓ তাদের কূফা পাঠালেন। সেখানকার সবগুলো মসজিদে ঘুরে ঘুরে ওই ব্যক্তি সা'দ রাযি. সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করত। সবাই তাকে ভাল বলল; তার প্রশংসা করল। তবে বনু আবসের মসজিদে আবু সা'দা উসামা কাতাদা-নামক এক লোক [জিজ্ঞাসাকারীকে] বলল, আপনি যখন কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন আমাদের অভিযোগ হল—সা'দ যুদ্ধে যেত না; গনিমতের মাল সঠিকভাবে বণ্টন করত না, এবং ইনসাফের সাথে ফয়সালা করত না।

তার কথা শোনার পর সা'দ ؓ বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি তিনটা মিথ্যা অভিযোগ করেছ। আমিও তোমাকে তিনটি বদদোয়া দিচ্ছি।

হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়, নাম কামাই করার জন্য যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে, তা হলে তার আয়ু বাড়িয়ে দিয়ো, ততদিন তাকে দারিদ্রে লিপ্ত রেখো এবং তাকে [পাপের] ফিতনায় লিপ্ত করো!

[ওই ব্যক্তির ওপর সা'দ রাযি.র বদদোয়া লেগে গেল।] তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলত, আমি বুড়ো হয়ে গেছি; পরীক্ষায় পতিত হয়েছি, সা'দের বদদোয়া আমার ওপর লেগে গেছে।

আব্দুল মালেক [এক বর্ণনাকারী] বলেন, পরবর্তীতে আমি ওই লোকটাকে দেখেছি। বার্ধক্যের কারণ, তার চোখে পলক পড়ে গেছে। রাস্তায় মেয়েদের দেখলে সে চোখ টিপত।[৬৭]

---

৬৭. বুখারি শরিফ, কিতাবুল আজান : ৭৫৫

শাসক হলেন বাইতুল মালের রক্ষক

একবার উমর ؓ তার ছোট ছেলের হাতে কাঁসার একটি টুকরো দেখতে পেলেন। তেমন মূল্যবান ছিল না সেটা। [খুবই সাধারণ ছিল।]

উমর ؓ জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁসার এই টুকরোটি তোমাকে কে দিয়েছে?

তার ছেলে জবাব দিল, আব্বুজান! বাইতুল মালের রক্ষক আমাকে এটা দিয়েছেন।

ছেলেকে নিয়ে আমিরুল মুমেনিন তার নিকট গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, উমরের পুত্রের হাতে এই টুকরোটা দেওয়ার জন্য কে তোমাকে বলেছে?

জবাবে সে বলল, আমিরুল মুমেনিন! আমি কোষাগারের হিসাব নিয়েছি। [কোন মালটা কী পরিমাণ আছে।] কোষাগারে শুধু স্বর্ণ আর রূপাই পেয়েছি। [এর বাইরে] পুরো কোষাগারে কাঁসার এই টুকরোটাই পেলাম। তাই সেটা আপনার ছেলেকে দিয়েছি।

এ কথা শুনতেই উমর ؓ-র চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুন! তুমি কি মুসলমানদের ঘর যাচাই করার পর এমন কোনও ঘর পেলে না, যারা হারাম মাল খাবে। তাই উমরের ঘরই নজরে এল? টুকরোটি নিয়ে আগের জায়গায় রেখে দাও।

বাদশাহকে বিড়ালের মত দেখাচ্ছিল

এক ঈদের দিন শায়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস্সালাম রাজপ্রাসাদের দিকে গেলেন। দেখতে পেলেন, সিপাহিরা বাদশাহ নাজমুদ্দিনের[৬৮] সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজকীয় সাজে সেজেগুজে বাদশাহ জাতির অলঙ্কার হয়ে আছেন। আর আমিররা এসে তার সামনে মাটিতে চুমো নিচ্ছে।

শায়খ ইজ্জুদ্দিন সজোরে আওয়াজ করে বললেন, হে আইয়ুব! আল্লাহ ﷻ যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, মিসরে আমি তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম। আর তুমি শরাব বেচাকেনায় অংশ নিতে। তখন তোমার জবাব কী হবে?

বাদশা বললেন, এমনটা কি হচ্ছে?

শায়খ বললেন, হ্যাঁ। অমুক সরাইখানায় শরাব বিক্রয় হয়। এ ছাড়াও আরও অনেক পাপকাজ হয়। কিন্তু তুমি তো রাজ্যের ভোগে ডুবে আছ।

বাদশাহ বললেন, হে আমার মনিব! এই বাজার আমি গরম করিনি। আর এর শুরুও আমি করিনি। এটা তো আমার পিতার যুগ থেকেই চলে আসছে।

শায়খ বললেন, তুমিও কি তাদের মধ্যে, যারা বলেছিল–

---

[৬৮] নাজমুদ্দিন আইয়ুব [৬৩৭ হি.-৬৪৭ হি.] ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভাই মালেকুল আদেলের পৌত্র, এবং মিসর ও শামের আইয়ুবি গোত্রের সপ্তম শাসক। ৬৪৭ হিজরিতে খৃস্টানদের সাথে ক্রুশযুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। [তারিখুল ইসলাম-আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ২/৪১৯]

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾

'আমরা আমাদের বাপদাদাকে [একটি পথের ওপর এবং] একটি দীনের ওপর পেয়েছি। আর আমরা তো তাদেরই অনুসরণ করব।' [সূরা যুখরুফ : ২৩]

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ ওই সরাইখানা জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

শায়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস্সালাম ফিরে এলেন। তাকে তার এক শাগরেদ জিজ্ঞাসা করল, উস্তাদে মুহতারাম! আপনি এমনটা করলেন কেন? নসিহত করলেই তো চলত!

শায়খ জবাব দিলেন, বাদশাহ এই জাঁকজমক নিয়ে বের হওয়ায় আমি তাকে তাচ্ছিল্য করতে চাইলাম। যেন সে অহংকারের জালে ফেঁসে না যায়। তা হলে তাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত।

শাগরেদ জিজ্ঞাসা করল, আপনার মনে কি তার ভয় জাগেনি?

শায়খ বললেন–

'বাদশাহর সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ ﷻ-র প্রতাপ ও মাহাত্ম্য সামনে উপস্থিত রেখেছি। তখন সুলতান আমার চোখে বিড়ালের মত দেখাচ্ছিল।'

খুঁজে বের করলেন অপরাধীকে

এক ব্যক্তি একটি আর-গাছের নীচে মাল লুকিয়ে রেখে হজ্জের সফরে গেল। হজ্জ আদায়ের পর ফিরে এসে সে তার মাল পেল না। তাই হাকিমের নিকট সে তার মাল চুরির অভিযোগ করল।

ঘটনা শুনে হাকিম সাহেব বিস্মিত হলেন। এই জটিল মাসয়ালাটির সমাধান নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। শহরের সব চিকিৎসককে তার নিকট ডেকে পাঠালেন। সবাই উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ কি ইদানিং আর-গাছের শিকড় দিয়ে কারও চিকিৎসা করেছ?

এক চিকিৎসক বলল–

হ্যাঁ; অমুক ব্যক্তির চিকিৎসা আমি আর-গাছের শিকড় দিয়ে করেছি।

হাকিম ওই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

আর-গাছের শিকড় কে এনেছিল?

সে বলল, আমার সেবক।

হাকিম সেবককে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সেবক এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

তুমি তোমার মনিবের জন্য আর-গাছের শিকড় কোত্থেকে নিয়েছ?

সে বলল–

বালুময় একটি জায়গা থেকে।

হাকিম তাকে হুকুম দিলেন, যার মাল চুরি হয়েছে, তার সাথে গিয়ে তাকে জায়গাটা দেখাও। তারা দুজন গেল। জানা গেল, সেবক সেই গাছেরই শিকড় এনেছে, যে গাছের নীচে ওই ব্যক্তির মাল ছিল। তারা দুজন ফিরে এলে সেবককে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন–

গাছের গোড়ায় গোপন করে রাখা মাল কি তুমিই নিয়েছ?

সেবক জবাবে বলল, হ্যাঁ।

হাকিম হুকুম দিলেন, তার নিকট তার মাল ফিরিয়ে দাও।

সেবক মাল ফিরিয়ে দিল। হাকিমের কৃতজ্ঞতা আদায় করে খুশি মনে মালের মালিক বাড়ি ফিরে গেল।

হত্যাযোগ্য আসামী

খলিফা মাহদি একব্যক্তিকে হত্যাযোগ্য ঘোষণা করলেন। তার রাজ্যে সে ফ্যাসাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। ঘোষণা করা হল, তাকে ধরিয়ে দিলে বা তার সন্ধান দিলে এক লাখ দেরহাম পুরস্কার দেওয়া হবে। সে মা'ন বিন যায়েদার বাড়ি আশ্রয় নিল।

বিষয়টি জানতে পেরে খলিফা মাহদি মা'ন বিন যায়েদাকে ডেকে পাঠালেন। মা'ন তার দরবারে উপস্থিল হলেন।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন–

মা'ন! তুমি আমার দ্রোহী ও দুশমনকে আশ্রয় দিয়েছ। অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল।

মা'ন বিন যায়েদা বললেন, জী হ্যাঁ, আমিরুল মুমেনিন।

আবার জী হ্যাঁ-ও বলছ?–গর্জে উঠলেন মাহদি।

মা'ন বিন যায়েদা বলল–

আমিরুল মুমেনিন! আপনার আনুগত্য ও হুকুম পালন করে ইয়ামানের ভেতর অনেক দুশমনকে হত্যা করেছি। তাদের কাজের পরিণতিতে তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অনেকবারই আমি আপনার সাথে যুদ্ধে শরিক হয়েছি। অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। এরপরও আপনি আমাকে এর যোগ্য মনে করছেন না যে, আমার আশ্রয়ে এক অপরাধী থাকতে পারে?!

এ কথা শুনে অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রাখলেন খলিফা মাহদি। এর পর মাথা তুলে মা'ন বিন যায়েদার ক্রোধ দূর করে বললেন–

যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, তাকে আমরাও আশ্রয় দিলাম।

মা'ন বিন যায়েদা বললেন, যদি আমিরুল মুমেনিন এই অপরাধীকে অনুগ্রহ করেন, তা হলে ধরে নেওয়া যাবে যে, তাকে জীবন দান করা হয়েছে এবং তাকে অভাবমুক্ত করা হয়েছে।

মাহদি বললেন, আমরা এই অপরাধীকে পাঁচ হাজার দেরহাম দান করলাম।

মা'ন বিন যায়েদা বললেন, আমিরুল মুমেনিন! খলিফাদের দান অপরাধীদের মান অনুযায়ী হয়। আর এ-ব্যক্তি প্রকৃতই বড় মাপের অপরাধী। তাই তার জন্য দানও অনেক বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাহদি বললেন, ঠিক আছে, দশ হাজার দেরহামেরই নির্দেশ দিচ্ছি।

মা'ন বিন যায়েদা বললেন, তা হলে দেরি কীসের, আমিরুল মুমেনিন! জলদি করুন! কারণ, ভাল কাজ তাড়াতাড়িই করা হয়।

হাজ্জাজের সামনে দাঁতভাঙ্গা জবাব

ইবনে ফুজাআ-র ভাইকে বন্দী করিয়ে আনল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফি।[৬৯] তাকে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই।

বন্দী জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এর কারণটা কী?

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলল–

তোমার ভাই কুতরি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঠিয়েছিল।

---

[৬৯] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন হাকাম ছিলেন বনি সকিফ গোত্রের। ৪১ হিজরির দিকে তায়েফে তার জন্ম হয়। উমাইয়্যা খলিফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে হাজ্জাজ ৭২ হিজরিতে মক্কা অবরোধ করেন। সেখানে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ-র খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘ সাত মাস অবরুদ্ধ থাকার পর তিনি তার ছোট পুত্রের সাথে কা'বা শরিফের সন্নিকটে যুদ্ধে শহিদ হন [৭৩ হি.]। এই সফলতার ফলে আব্দুল মালেক তাকে হিজায, ইয়ামান এবং ইয়ামামার গভর্নর নিয়োগ করেন। দু' বছর পর তাকে কূফার [ইরাকের] গভর্নর পদে আসীন করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খারেজি এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের শক্তহাতে দমন করেন। ৭৮ হিজরিতে সিস্তান এবং খোরাসানও তার আওতায় দেওয়া হয়। কূফা এবং বসরার মধ্যে প্রাদেশিক রাজধানী 'ওয়াসেত' তিনি নির্মাণ করেন। খলিফা ওলিদ বিন আব্দুল মালেকের যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সিপাহসালার কুতাইবা বিন মুসলিম, মুজাআ' বিন সে'র এবং মুহাম্মদ বিন কাসেম যথাক্রমে মা-ওরাউন্নাহর [তুর্কিস্তান], উম্মান এবং সিন্দ ও মুলতান জয় করেন। পবিত্র কুরআনের ই'রাব [যের, যবর, পেশ ইত্যাদি] লাগানো ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি মহান কীর্তি। তার মৃত্যু হয় ৯৫ হিজরিতে, এবং তিনি ওয়াসেতে সমাধিস্থ হন। [উর্দু দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়া : খণ্ড ৭]

বন্দী জবাব দিল, আমার নিকট আমিরুল মুমেনিনের লেখা কাগজ আছে যে, আমার ভায়ের ভুলের শাস্তি আমাকে যেন দেওয়া না হয়।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলল, কাগজটা আমাকে দাও।

বন্দী বলল, আমার নিকট আমিরুল মুমেনিনের লেখা কাগজ ছাড়াও আসমানি লেখা আছে। এরপর বলল, আমার সাথে আল্লাহ ﷻ-র এই ফরমান আছে–

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

'কেউ অপর কারও গোনাহর বোঝা ওঠাবে না।' [সূরা যুমার : ৭]

এই দাঁতভাঙ্গা জবাবে বিস্মিত হয়ে গেল হাজ্জাজ। তাকে ছেড়ে দিল।

চিরুনি দিয়ে ফয়সালা

আমিরুল মুমেনিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ আয়াসকে বসরার বিচারকের পদে আসীন করলেন। এই পদে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আয়াস নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ দূরদর্শিতা এবং কৌশল [যা মুকাদ্দমার গভীরে পৌঁছতে সহায়ক হয়।] সৃষ্টি করে নিলেন। তা ছাড়া ফয়সালার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যাচাই-বাছাইয়ের বিচক্ষণতাও অর্জন করে নিলেন।

একবার দু' ব্যক্তি তাদের চাদর নিয়ে আয়াসের নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করল। তাদের একজনের চাদর ছিল লাল; আরেকজনেরটা সবুজ। তাদের একজন এভাবে বক্তব্য রাখল যে, হাউজের কিনারায় চাদর রেখে আমি গোসল করতে নামলাম। এইসময় এই ব্যক্তি তার চাদরটা আমার চাদরের নিকট রেখে সে-ও গোসল করতে নামল। গোসল করে সে আমার আগে বেরিয়ে গেল, এবং আমার চাদর গায়ে দিয়ে চলতে লাগল। গোসল করে উঠে এসে আমি তার পিছনে গিয়ে তার নিকট পৌঁছলাম। তাকে বললাম, এই চাদর তোমার।

আয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কি কোনও প্রমাণ আছে?

সে বলল, নেই।

একটি চিরুনি আনিয়ে আয়াস তাদের চুল আঁচড়ালেন। একজনের চুল থেকে লাল পশম, এবং অন্যজনের চুল থেকে সবুজ পশম বের হল। আয়াস লাল পশম-ওয়ালাকে লাল চাদর এবং সবুজ পশম-ওয়ালাকে সবুজ চাদর দিয়ে দিলেন।

আজানের কারিশমা

এক ব্যবসায়ীর সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেন কাজি আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ হাশেমি[৭০]। ব্যবসায়ীর বর্ণনার হল–

বাগদাদের এক আমিরের [গভর্নরের] নিকট আমি অনেক টাকা পাওনা ছিলাম। পাওনার তাগাদা দিলে সে তালবাহানা করত। একপর্যায়ে দিতেই অস্বীকার করে বসল। যখনই তার বাড়ি গিয়ে পাওনার তাগাদা দিতাম, সে আত্মগোপন করত এবং নওকরের মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দিত। এভাবে আদায় করতে অক্ষম হয়ে বিষয়টি সামনে বাড়ালাম। উজিরের নিকট গিয়ে অভিযোগ করলাম। কিন্তু মরুভূমিতে চিৎকার করার মত তা-ও নিষ্ফল হল। প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও শরণাপন্ন হলাম। তা-ও বেকার গেল। এদিকে আমার মাল আত্মস্যাৎকারী আমাকে ধমকি দিয়ে চলল। আমার মাল দিতে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল।

আমার পাওনা আদায়ের জন্য অনেক চেষ্টা চালালাম। যেখানে যেখানে গেলে পাওয়ার কিছুটা আশা ছিল, সবখানেই গেলাম। তাদের নিকট অভিযোগ করলাম। কিন্তু সবই বেকার গেল। অবশেষে নিরাশ হয়ে বসে গেলাম। মনকে এ বলে সান্ত্বনা দিলাম, এই মাল ফেরত পাওয়ার আশা নেই; চেষ্টাও বেকার; সময়ও নষ্ট। কিন্তু আমার মন শান্ত হবে

---

৭০. কাজি আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ হাশেমি ছিলেন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-র সন্তান। তিনি হাদিসের একজন নির্ভরযোগ্য রাবি ছিলেন। অনেক বড় আবেদ এবং যাহেদও ছিলেন। [তারিখে বাগদাদ : ২/৩৫৯-৩৬০]

কী, আরও অস্থির হয়ে উঠল। গভর্নরের এমন আচরণ আর কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিল। দুঃখ-বেদনা সব সময় আমার মন ও মস্তিষ্কে চেপে থাকত। সব সময় চিন্তিত থাকতাম, কোথায় যাব? কার কাছে অভিযোগ করব। কে শুনবে আমার দুঃখের কথা? কে আমাকে সাহায্য করবে? এইসব চিন্তায় থাকতাম। এ সময়ে একব্যক্তি আমাকে বলল, তুমি অমুক দর্জির নিকট যাচ্ছ না কেন? যিনি মসজিদে ইমামতি করেন? তোমার সমস্যার একটা ইতিবাচক সমাধান হয়ত তিনি করে দেবেন। আমি বললাম–

যখন প্রশাসনের নেতৃস্থানীয়রা তার জুলুম থেকে মুক্তি দিতে পারেনি, তখন ওই দর্জি করবেটা কী!

সে বলল, আজ পর্যন্ত তুমি যার যার নিকট গিয়েছ, এই দর্জির সামনে তারা কিছুই নয়। অন্যদের তুলনায় ওই আমির একে বেশি ভয় করে। তার নিকট তোমার মুকাদ্দমা পেশ করো। হয়ত সমাধানের পথ খুলে যাবে।

এ পরামর্শমতে আমি ওই দর্জির নিকট গেলাম। আমার প্রয়োজনের কথা তাকে জানালাম। এই ব্যাপারে আমি যে জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছি, তা-ও জানালাম। আমার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর আমাকে নিয়ে ওই আমিরের নিকট গেলেন। তাকে দেখেই আমির অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেল। অনেক সম্মান দেখাল। দর্জি ইমাম তাকে শুধু এতটুকু বললেন–

তাকে তার পাওনা দিয়ে দাও। নচেৎ এখনই আমি আজান দেব।

এ কথা শুনতেই আমিরের রং বদলে গেল। দেহ কাঁপতে লাগল। ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন চেহারায় ভেসে উঠল। কোনওরূপ প্রতিবাদ ছাড়াই সে আমার পুরো মাল ফিরিয়ে দিল।

এসব দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। একজন সাধারণ লোক; যার অবস্থা খুবই করুণ; দৈহিকভাবেও অনেক দুর্বল; বাহ্যিক চমক-দমক বা দাপট যার নেই–কিন্তু ঘটনা কী, আত্মস্যাৎ করে খাওয়া আমার মাল এই সাধারণ লোকটা আসতেই আমির বিনা প্রতিবাদে তা দিয়ে দিল!

সুন্দরী নারীর উপর আমীরের হামলা

আমার হক উসুল হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দর্জি–ইমামকে কিছু মাল দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। আমাকে বললেন–

আমার যদি সম্পদের চাহিদা থাকত, তা হলে আমার নিকট এত পরিমাণ মাল আসত যে, গুণে শেষ করা যেত না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা জনাব! আমাকে এ কথাটা বলুন, আপনাকে দেখতেই সে আমার মাল ফিরিয়ে দিল কেন? এর আগে তো আমি অনেক বড় বড় ব্যক্তিকে সামনে এনেছি। কিন্তু সে তাদের কোনওই পরওয়া করেনি!

দর্জি আমাকে একটি ঘটনা শোনালেন। যা এর থেকেও বিস্ময়কর ছিল। দর্জি বললেন :

কিছুদিন আগে এখানে এক তুর্কি আমির ছিল। নওজোয়ান ছিল; সুদর্শনও। একদিনের ঘটনা। এক মহিলা গোসলখানা থেকে গোসল করে বের হল। বেশ দামি দামি পোশাক এবং অলংকার পরে ছিল। দেখতেও বেশ সুন্দরী ছিল। তুর্কি আমির শরাব পান করে নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। তার দৃষ্টি যখন ওই সুন্দরী নারীর ওপর পড়ল, তখন সে তার ওপর আসক্ত হয়ে পড়ল। মহিলাকে তার ঘরে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাল। মহিলা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য চিৎকার করে বলতে লাগল–

মুসলমান ভায়েরা! আমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। এই আমির আমাকে তার ঘরে নিয়ে আমার ইজ্জত লুটতে চাইছে। আর আমার স্বামী কসম করে আমাকে বলেছে, যদি তার ঘর ব্যতীত অন্য কোনও ঘরে রাত কাটাই, তা হলে আমাকে তালাক। এই অবস্থায় আমি যদি রাতভর এই আমিরের ঘরে থাকি, তা হলে আমার ওপর তালাক পড়ে যাবে। তা ছাড়া, এর কারণে পুরো জীবন আমাকে লজ্জা ও লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াতে হবে। আমার পুরো জীবনের চোখের পানিও তা মুচতে পারবে না।

ইমাম সাহেব বলেন–

ওই মহিলা চিৎকার করতে থাকল। কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেওয়ার মত সাহস কারও ছিল না। এই দিকে ওই জালেম আমির মহিলাটিকে তার ঘরে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। মহিলার সাথে তুর্কি আমিরের অন্যায় আচরণ দেখে আমার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল। তার থেকে তাকে মুক্ত করার সংকল্প করলাম। আমিরের নিকট গিয়ে তাকে তিরস্কার করলাম, মহিলাটিকে ছেড়ে দাও। ও ওর ঘরে চলে যাক। ওই জালেম আমার কথা শোনেনি। বরং লাঠি দিয়ে আঘাত করে আমাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। এর মধ্যে মহিলাটিকে সে তার ঘরে নিয়ে যেতে সমর্থ হল। আমি দ্রুত বাড়ি এসে রক্ত ধুয়ে নিলাম। মাথার ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধলাম। এরপর ইশার সালাত পড়িয়ে লোকদের বললাম–

ওই আমির যা করেছে, তা তোমাদের অজানা নয়। আমার সাথে চলো। আমরা বাধা দিয়ে মেয়েটিকে তার হাত থেকে মুক্ত করে আনি।

মুক্তাদিরা সবাই আমার সাথে চলল। আমরা গিয়ে তার বাড়ি ঘেরাও করলাম। আমির তার বাহিনী এবং চাকরবাকরদের নিয়ে বেরিয়ে এল। হাতে লাঠি এবং লোহার হাতুড়ি। এরপর তারা আমাদেরকে একাধারে মারতে শুরু করল। বিশেষ করে আমাকে ঘিরে ফেলল এবং অনেক মারল। আমি একেবারে রক্তাক্ত হয়ে পড়লাম। সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাদেরকে বের করা হল। অপমান এবং লাঞ্ছনার চূড়ান্ত অবস্থা।

উদ্দেশ্য তো পূরণ হয়ইনি–উল্টো অপমান হয়ে আসতে হয়েছে। আমাকে এতটা মারা হয়েছে যে, প্রচণ্ড কষ্ট এবং রক্ত ঝরার কারণে আমি বাড়ির রাস্তাও ঠিকভাবে চিনতে পারছিলাম না। কোনও রকমে বাড়ি পৌঁছে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসবে কোত্থেকে! আমার মাথায় তো একটাই চিন্তা কাজ করছে–কীভাবে ওই মহিলাটিকে ওই জালেমের হাত থেকে মুক্ত করা যায়, যেন সে নিজ বাড়ি যেতে পারে, এবং তার ওপর তালাক না পড়ে।

হঠাৎ আমার মনে একটি কথা জাগল। এখনই ফজরের আজান দেই না কেন! তা হলে ভোর হয়ে গেছে মনে করে তুর্কি আমির তাকে ছেড়ে দেবে। তা হলে মহিলাটি তার ঘরে পৌঁছতে পারবে, এবং তার ওপর

তালাক পড়বে না। আমি মিনারার ওপর উঠলাম। আমিরের ঘরের দিকে তাকালাম–দরজা খোলা কি না। মহিলা তার বাড়ি চলে গেছে কি না। কিছুই বুঝতে পারলাম না। এরপর আমি আজান দিলাম। তারপরও ওই মহিলাকে তার ঘর থেকে বের হতে দেখা গেল না। এখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম–ইকামত বলব। তা হলে আমিরের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে। মহিলাটিকে সে তার বাড়ি থেকে বের করে দেবে। ইকামত বলতে যাব–এমন সময় ঘোড়া-সওয়ার এবং পদাতিক বাহিনীতে রাস্তা ভরে গেল। সবাই একবাক্যে বলে উঠল–

এই সময় যে আজান দিয়েছে, সে কোথায়?

আমি বললাম, আমি আজান দিয়েছি। এই আজানের মাধ্যমে আমি তোমাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

সিপাহিরা বলল, আগে মিনার থেকে নামো। খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহর নিকট গিয়ে নিজের সাফাই পেশ করো যে, এই অসময়ে তুমি আজান দিলে কেন?

খলিফার দরবারে যখন পৌঁছলাম, তখন তিনি খেলাফতের মসনদে বসে ছিলেন। তাকে দেখে আমি কেঁপে উঠলাম। দেহের পশম দাঁড়িয়ে গেল। কাছে যাওয়ার জন্য খলিফা আমাকে বললেন। তার কাছে গেলাম। তখন আমার দেহ কাঁপছিল। খলিফা বললেন–

ভয় দূর করো; মন শান্ত করো।

আমার ভয় ও আতঙ্ক দূর করার জন্য খলিফা আমার সাথে খুবই নরমভাবে কথা বলতে লাগলেন। আমার মন থেকে ভয়-আতঙ্ক দূর হয়ে গেল। এরপর খলিফা বললেন–

তুমিই কি এ সময়ে আজান দিয়েছিলে?

আমি বললাম, জী-হ্যাঁ; আমিরুল মুমেনিন!

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কী? এ সময় আজান দিলে কেন? অথচ ফজর হতে এখনও অনেক সময় বাকি। তোমার আজানের

কারণে না জানি কত রোজাদার, মুসাফির এবং মুসল্লির ধোঁকা হয়ে থাকবে!

আমি বললাম, আমিরুল মুমেনিন! যদি আমাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়, তা হলে আমি প্রকৃত বিষয়টি বলব।

খলিফা বললেন, আমার পক্ষ থেকে তুমি পুরো নিরাপদ। নির্দ্বিধায় বলো।

আমি খলিফাকে পুরো বিষয়টি জানালাম। শোনার সাথে সাথেই রাগে খলিফা লাল হয়ে গেলেন। সিপাহিদের নির্দেশ দিলেন, ওই জালেম আমিরকে, এবং তার নিকট আটক থাকা মহিলাকে যেভাবেই আছে, এখনই উপস্থিত করো।

তৎক্ষণাৎ তাদের উপস্থিত করা হল। কয়েকজন নির্ভরযোগ্য মহিলার সাথে ওই মহিলাকে তার বাড়ি পাঠানো হল। স্বামীকে বলা হল, সে যেন স্ত্রীকে ক্ষমা করে; তার ওপর অনুগ্রহ করে। কারণ, স্ত্রী এখানে অপারগ ছিল। তার ওপর জোর করা হয়েছে। এরপর খলিফা নওজোয়ান তুর্কি আমিরের দিকে ফিরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট ধন-দৌলতের সাথে সাথে কী পরিমাণ স্ত্রী এবং দাসী আছে?

আমির খলিফাকে জানাল, তার নিকট অনেক ধনসম্পদ আছে। স্ত্রী-দাসীও অনেক আছে।

খলিফা বললেন, ধ্বংস হোক তোমার! তোমার ওপর আল্লাহ ﷻ-র এত অনুগ্রহ। তারপরও তুমি আল্লাহ ﷻ-র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছ। আর এতটা দুঃসাহস দেখিয়েছ যে, যে ব্যক্তি তোমাকে মন্দ কাজ থেকে বাধা দিয়েছে, ভাল কাজের নির্দেশ দিয়েছে, তুমি তাকে পিটাই করেছ! তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছ! তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছ!

খলিফার কথার কোনও জবাব ছিল না তার নিকট। সিপাহিদের নির্দেশ দিলেন আমিরের পায়ে জিঞ্জির পরিয়ে, গলায় বেড়ি পরিয়ে বস্তার মধ্যে রাখো। এরপর লাঠি দিয়ে একে ভালভাবে পিটাই করো।

খলিফার নির্দেশ মুতাবিক সিপাহিরা পায়ে জিঞ্জির এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে বস্তায় ঢুকিয়ে বেশ পিটাই করল। সে জোরে জোরে চিৎকার করছিল। কিন্তু তাকে দয়া করার মত কেউ ছিল না। কেউ তার চিৎকারের প্রতি কর্ণপাত করেনি। চিৎকার করতে করতে একসময় তার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেল। এর পর খলিফার নির্দেশে এই অবস্থায়ই তাকে দজলা নদীতে ফেলে দেওয়া হল।

এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার পর খলিফা তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বাইতুল মালে নিয়ে নিলেন। এর পর আমার দিকে ফিরে বললেন—

ইমাম সাহেব! আপনি যান। এরপর যদি কোনওরূপ অন্যায় দেখেন—সেই অন্যায়কারী যে-ই হোক, আপনি যদি আমার নিকট আসতে পারেন, তা হলে এসে আমাকে জানাবেন। আর যদি না পারেন, তা হলে আপনি আজান দেবেন—যেমনটা এ-ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন।

ব্যবসায়ী বলেন, এই ইতিহাস শোনানোর পর দর্জি ইমাম আমাকে জানালেন, এই ঘটনার পর সরকারি কর্মচারীদের কোনও ভাল কাজের কথা বললে তারা তা মেনে নেয়। মন্দ কাজ থেকে বাধা দিলে তৎক্ষণাৎ তা ছেড়ে দেয়। কারণ, খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহর ভয় তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তবে, আজ পর্যন্ত এইরূপ আজান দেওয়ার পরিস্থিতি আসেনি। এই আজানের কী দাম, তা তো তুমি দেখলেই।[৭১]

---

[৭১].দেখুন, আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া, ইবনে কাসির : ১৪/৭০৪-৭০৭ ; আলমুনতাজিম, ইবনুল জাওযি : ১২/৩১৭

ক্ষমতা পতনের কারণ

খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-র শাসনকাল। তার জনৈক হাকেম তার নিকট অভিযোগ লিখে পাঠাল যে, শহর বিরাণ হতে যাচ্ছে। আর তা আবাদ করার জন্য তিনি আমিরুল মুমেনিনের নিকট সম্পদ চেয়ে চিঠি পাঠালেন।

জবাবে আমিরুল মুমেনিন লিখে পাঠালেন–

'তুমি যখন আমার চিঠিটা পড়বে, তখন ন্যায়-পরায়ণতা দ্বারা তোমার শহর আবাদ করো; শহরের রাস্তাগুলো থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করো। কেননা, এরই কারণে শহর বিরাণ হয়। ওয়াস্‌সালাম।'

সত্যি কথাই–

'লশকর ছাড়া দেশ হয় না; মাল ছাড়া লশকর হয় না; শহর ছাড়া মাল হয় না; প্রজা ছাড়া শহর হয় না, আর ইনসাফ ছাড়া প্রজা হয় না।'

ছাদে কয়টি কড়ি আছে

কাজি আয়াস বলেন, আমি শুধুমাত্র এক ব্যক্তির নিকট পরাস্ত হয়েছিলাম। ঘটনাটি ছিল–আমি বসরার আদালতে ছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হল। সাক্ষ্য দিল, অমুক বাগানের মালিক হল অমুক ব্যক্তি। সাক্ষীকে যাচাই করতে চাইলাম, যে বিষয়ে সে সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে ব্যাপারে তার জানাশোনা কতটুকু। তাই জিজ্ঞাসা করলাম–

ওই বাগানে কতগুলো গাছ আছে?

সাক্ষী বলল, শ্রদ্ধেয় কাজি সাহেব! কত বছর যাবৎ আপনি এই কাজির পদে দায়িত্ব পালন করছেন?

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, এত বছর ধরে।

সাক্ষী বলল, এই ছাদে কয়টি কড়ি আছে?

সাক্ষীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝে গেলাম। বললাম, সত্য তোমার সাথে। আমি তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম।

ন্যায়-পরায়ণতার কারিশমা

ঘটনাটি নেওয়া হয়েছে শামের প্রসিদ্ধ লেখক ও সংকলক শায়খ আলী তানতাবি রহ.-র বই 'কাসাসুম্মিনাত্তারিখ' থেকে। কিছুটা সংক্ষেপ ও সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

সমরকন্দের এক প্রচণ্ড শীতের রাত। বাড়ি থেকে বের হল এক ব্যক্তি। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। তার গন্তব্য রাজপ্রাসাদের দিকে। রাস্তা খোঁজ করে ধীরে ধীরে হাঁটছে। অবশেষে পৌঁছে গেল রাজপ্রাসাদের নিকট। প্রাসাদের একপাশে ইবাদতখানা। দরজায় বিশাল ভারী একটি পাথর রাখা। সেটার ওপর একটি মূর্তি আঁকা। আতঙ্ক চেপে ধরল ওকে। জীবনে প্রথমবারের মত ইবাদতখানায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এর আগে কখনও এই সুযোগ আসেনি।

শক্তি-সমর্থ এই যুবক ভীরু নয়–বেশ সাহসী। সুঠাম দেহের অধিকারী সে। বেশ বুদ্ধিমানও। চিন্তাভাবনাও উঁচু। খুবই কৌশলী। স্থানীয় ভাষা তো তার মাতৃভাষা। তবে আরবি ভাষায়ও তার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। অনায়াসে বলতে পারে। ইবাদতখানার সবচেয়ে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তাকে ডেকেছে। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। তার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ এবং ভয়, উভয়টি মিলে তার মধ্যে অভিনব একটি অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। দেহ কাঁপছে তার। খুব কম লোকই এখানে ঢুকতে পারে। আর এই ইবাদতখানার দায়িত্বে যারা আছে, তারা শুধুমাত্র একবারই প্রবেশ করে। এরপর পুরো জীবন সূর্যের আলো দেখার ভাগ্য তাদের হয় না।

ধীরে ধীরে সে আগে বাড়ল। তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। পরবর্তী কামরার মাঝখানে বিশালদেহী একব্যক্তি। সাদা লম্বা দাড়ি। নাম

ধরে ডেকে সে তাকে পিছু পিছু আসার ইশারা করল। সে বুঝে গেছে, এ হল ইবাদতখানার চৌকিদার। তার পিছু পিছু চলল সে। কয়েকটি মোড় নেওয়ার পর গণকদের সরদারের সামনে পৌঁছল। কেউ তাকে দেখেনি। ইবাদতখানা থেকে বের হয় না সে। খুব কম লোকই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। দেশটার প্রকৃত শাসক এই গণক। তার বিরোধিতা করার সাহস কারও নেই। মানুষের মুখে মুখে রটা কথা–তার বিরোধিতা করা দেবতাদের বিরোধিতার নামান্তর। আর এ ধরনের লোক অভিশাপযোগ্য।

আতঙ্ক ফুটে উঠল যুবকের চোখে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল। গণকদের একটি সারি দাঁড়িয়ে আছে। বড় গণকের দিকে মনোযোগ দিল। আস্তে আস্তে কথা বলছিল সে। প্রথমে সে কিছুই বোঝেনি। পরে ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে। সমরকন্দের ইতিহাস ও পূর্বকথা বলার পর বলল, কীভাবে মুসলমানরা এই দেশটা কব্জা করে নিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক পদক্ষেপই নিয়েছি। কিন্তু সফল হওয়া যায়নি। বরং ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা মজবুত হচ্ছে। এখন আমরা তুরুপের তাস ফেলতে চাই। তা হল, আমরা জানতে পেরেছি, এই জাতির বাদশাহ খুবই ন্যায়-পরায়ণ। দামেশ্‌ক থাকে সে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার নিকট আমাদের পক্ষ থেকে দূত যাবে। তার হাতে আমরা অভিযোগপত্র পাঠাব। দেখব, এই ব্যাপারে সে কী করে। আর যেহেতু তুমি আরবি জানো, তাই তোমাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া তুমি বুদ্ধিমান এবং সাহসী। আলাপ-আলোচনার নিয়মও জানো। এখন তুমি কি এ কাজটি করতে আগ্রহী?

যুবক ইতিবাচক সাড়া দিল।

বড় গণক বলল, তা হলে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে যাও। তোমার পথের খরচপাতি পর্যাপ্ত পরিমাণ দেওয়া হবে।

যুবক সেখান থেকে যখন বের হল, তখন তার মুখে হাসির ফোয়ারা – সবচেয়ে বড় গণক সাক্ষাৎ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। এখন সময়

এসেছে নিজের যোগ্যতা দেখানোর। সমরকন্দ মুক্ত করার ক্ষেত্রে আমারও অবদান থাকবে।

বাড়ি এসে সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগল। ইবাদতখানার পক্ষ থেকে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাথেয় দেওয়া হয়েছে। দ্রুতগামী ঘোড়া হল তার সফরসঙ্গী। সেটার ওপর আরোহণ করে বুখারার উদ্দেশে রওয়ানা হল সে। মাসের পথ সপ্তাহে অতিক্রম করে হলব পৌঁছল। তার গন্তব্য খুব কাছে এসে গেছে। একসময় দামেশ্‌ক পৌঁছে গেল।

দামেশ্‌ক ছিল মুসলমানদের রাজধানী। তাদের মাহাত্ম্যের নিদর্শন। অনেক বড় শহর। খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিক্ষা-সংস্কৃতি দ্বারা লালিত। এটি যুবকের নিকট সমরকন্দ হতেও বড় মনে হল।

একটি সরাইখানায় নামল সে। মালিককে জিজ্ঞাসা করল, আমিরুল মুমেনিনের সাথের সাক্ষাতের উপায় কী?

সরাইখানার মালিক বলল, আমাদের আমিরুল মুমেনিনের সাথে সাক্ষাৎলাভ তো খুবই সহজ। তুমি উমাইয়্যা মসজিদে চলে যাও। সেখানে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই তোমাকে তার বাড়ির পথ দেখিয়ে দেবে। সেখানে কোনও পাহারাদার নেই। সাক্ষাতেও বাধা নেই।

সে উমাইয়্যা মসজিদে প্রবেশ করল। এমন সুদর্শন ইমারত আজ পর্যন্ত দেখেনি। তার ধারণা হল, রাজপ্রাসাদ এটাই হবে। একজনকে জিজ্ঞাসাও করল। তার ধরন-ধারণে বোঝা যাচ্ছিল, লোকটি শহরে নতুন। তাই সে জিজ্ঞাসা করল–

তুমি কি খলিফার বাড়ি সম্বন্ধে জানতে চাও?

তবে কি এটা নয়? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল সে।

হাসিমুখে ওই ব্যক্তি বলল, না হে বিদেশি দোস্ত! এটা তো আল্লাহর ঘর। মসজিদ। তুমি কি সালাত পড়ে নিয়েছ?

সালাত...আমি কীভাবে সালাত আদায় করতে পারি? আমি তো সমরকন্দের গণকদের ধর্মে বিশ্বাসী। ওই ধর্ম সম্বন্ধে গণকদের ছাড়া আর কারও জানা নেই। আর তা রহস্যে ভরা।

ওই ব্যক্তি তাকে আবার সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, আমি সালাত পড়ব কীভাবে? সেই নিয়মও তো আমার জানা নেই।

সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ধর্ম কী?

বলল, আমি সমরকন্দের গণকদের ধর্মের ওপর আছি।

প্রশ্ন হল, তাদের ধর্ম কী?

জবাব এল, আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : তা হলে তোমার প্রভু কে?

জবাবে সে বলল, ইবাদতখানার প্রভু।

এরপর সে প্রশ্ন করল, তুমি যখন তার নিকট কিছু চাও, তখন কি সে তোমাকে দান করে? তুমি অসুস্থ হলে কি সে তোমাকে সুস্থ করে তোলে?

বলল, আমার জানা নেই।

এটাকে সুবর্ণসুযোগ মনে করল সে। লোকটা আকারে-ধরনে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মনে হচ্ছে। বিদেশি। তার কোনও দীন-ধর্ম নেই। তাকে দীনের মৌলিক কিছু নিয়মনীতি জানানো যাক। তাই সে তার নিকট ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরল। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ওই সমরকন্দি লোকটার ভেতর থেকে ধূলোবালি দূর হয়ে গেল। কালিমায়ে তাওহিদ পড়ে নিল এবং দীন-ইসলামে প্রবেশ করল।

এরপর সে তার নতুন মুসলমান ভাইকে বলল, চলো! আমিরুল মুমেনিনের সাথে সাক্ষাৎ করি। এই সময়টা তার পরিবারের লোকদের জন্য। এরপরও তিনি বড়ই বিনয়ী।

মসজিদ হতে বের হয়ে তারা গলির ভেতর এল। খুবই সাধারণ একটি দরজার দিকে ইশারা করে তাকে বলল, এটাই হল আমিরুল মুমেনিনের ঘর। আশ্চর্য বোধ করল সে। তার ধারণা ছিল, বিশাল আলীশান বাড়ি হবে । কিন্তু এটা তো খুবই সাধারণ একটি ঘর। দরজায় নাড়া দিল সে। ন্যায়ের প্রতীক খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ এসে

তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তার আগমনের কারণ, জানতে চাইলেন : বলো, কী ব্যাপার? সে সিপাহসালার কুতাইবা বিন মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। বলল, মুসলমানরা ধোঁকা দিয়ে আমাদের দেশ কব্জা করেছে। যুদ্ধের ঘোষণাও করা হয়নি; আর আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াতও দেওয়া হয়নি। আমাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ বললেন, আল্লাহর নবী আমাদেরকে জুলুম করার নির্দেশ দেননি; বরং ন্যায় ও ইনসাফের পরামর্শ দিয়েছেন। এতে মুসলমান-অমুসলমানে কোনও তফাৎ নেই। গোলামকে আওয়াজ দিয়ে কাগজ-কলম আনতে বললেন।

ছোট্ট এক টুকরো কাগজ নিয়ে এল সে। সেটার ওপর দুই লাইন লিখলেন। সিলমোহর মেরে সমরকন্দির হাতে দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে তোমাদের শহরের হাকিমের নিকট দেবে।

সমরকন্দি ফিরে গেল। তাওহিদের নুরে তার অন্তর ভরপুর। যেখানেই যায়, সোজা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে। সালাত পড়ে। মুসলমান ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজ মনযিলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। সফরে একটি অনাবিল আনন্দ অনুভব করছিল সে। এখন তার জন্য কেউ অপরিচিত নয়, কিংবা সে-ও করো জন্য বিদেশি নয়। যে মসজিদেই সালাত পড়ত, লোকজন তার দিকে চেয়ে থাকত। তাকে দেখে বোঝা যেত, সে মুসাফির। এই এলাকার বাসিন্দা নয়। আর সালাতের পর তার মেহমানদারি করা নিয়ে বাজি লেগে যেত। প্রত্যেকেই তাকে নিজ বাড়ি নিয়ে তার মেহমানদারি করার জন্য পীড়াপীড়ি করত। এখন মসজিদের গুরুত্ব এবং এই ধর্মের অনেক সৌন্দর্য তার চোখে পড়ল। এরপর একদিন সে সমরকন্দ পৌঁছল। সোজা ইবাদতখানার দিকে গেল। এ সফরের ব্যাপারে তাদের জানাতে হবে। খলিফাতুল মুসলেমিনের জবাব জানাতে হবে। ইবাদতখানায় প্রবেশ করল। এখন সে আর তাদের কালো গলি নিয়ে ভীত নয়।

পাথরের মূর্তিগুলো, যেগুলো এককালে তার জন্য একটি রহস্য ছিল, সেগুলোর মূলরহস্য এখন সে জেনে গেছে। এগুলো মানুষের হাতে

বানানো; কোনও কারিগরের হাতের কারিশমা মাত্র। সেগুলো লাভ-ক্ষতির অধিকারী নয়। কুড়ালের আঘাত করা হলেও নিজেদের রক্ষা করার শক্তি এগুলোর নেই। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে সামনে এগোল। বড় দরজার সামনে এসে পৌঁছল। দারওয়ান তাকে ভালভাবেই চেনে। দরজা খুলে দিল। কয়েক মিনিট পর সে বড় গণকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে সামনে দেখতে পেয়ে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যেন। তার ধারণা ছিল, তাকে হয়ত মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সে তো সামনে দাঁড়ানো! সফরের সবিস্তার বর্ণনা শোনাল তাকে। কীভাবে গেছে, কোনখান দিয়ে গেছে। তবে তার ইসলামগ্রহণের বিষয়টি বুঝেশুনে এড়িয়ে গেল। খলিফার সাথে সাক্ষাৎ এবং তার হুকুমনামা নেওয়া পর্যন্ত এক এক করে সব কথা তাকে জানাল। গণকদের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল তাদের মুখে–আমাদের মুক্তির সময় এসে গেছে। খলিফার পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, কাজির সামনে যেন এই মুকাদ্দমা পেশ করা হয়। স্বাধীনভাবে তাদের দলিল উপস্থাপন করতে পারবে। বিবাদী কুতাইবাও আদালতের কুঠরিতে দাঁড়ানো থাকবে। এরপর কাজি সাহেব যে ফয়সালা করবেন, তা কার্যকর হবে।

একসময় সেই দিনও এসে গেল, যেদিনের অপেক্ষায় ছিল সমরকন্দের লোকজন। মুকাদ্দমার কার্যবিবরণী শোনার জন্য অনেক লোক সমবেত হল। আদালত কায়েম হয়েছে মসজিদে। যে গণককে কেউ কখনও দেখেনি, মুকাদ্দমার জন্য সে উপস্থিত হল। মুসলমানদের সিপাহসালার কুতাইবাও উপস্থিত আছেন। কাজির অপেক্ষা করছে সবাই।

কী আশা নিয়ে গণক এই মুকাদ্দমা নিয়ে এসেছে–ভেবে দেখুন! তার ইচ্ছা, একটি বিজয়ী জাতি তাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা করা হয়েছে, তিনি ছিলেন বিজয়ী সেনাপতি। সবার চোখ মসজিদের দরজায়–কখন কাজি সাহেব আসবেন। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ছোটখাটো শীর্ণকায় একজন মানুষ মসজিদে প্রবেশ করলেন। দেহে ছিল সাধারণ পোশাক।

মাথায় পাগড়ি। তার পিছনে ছিল তার গোলাম। আঙ্গুল কামড়ে ধরল অনেকেই–আচ্ছা! এ হল মুসলমানদের কাজি! এই ব্যক্তি ফয়সালা দেবেন খলিফার বিরুদ্ধে? সিপাহসালার কুতাইবার বিরুদ্ধে?

মসজিদের এককোণে কাজি তার আসন গ্রহণ করেন। সাথেই দাঁড়িয়ে আছে গোলাম। কোনও উপাধি ছাড়াই আমিরের [শাসকের] নাম নিয়ে ডাকা হল–আদালতের সামনে যেন হাজির হয়। শহরের আমির হাজির হলেন। আদালত তাকে বসার ইঙ্গিত করল। এরপর গণকদের সরদারের নাম ডাকল গোলাম। সে-ও বসে পড়ল; আমিরের পাশে। এরপর শুরু হল আদালতের কার্যক্রম।

খুবই নীচু স্বরে গণককে বললেন কাজি, তোমার কী বলার আছে, বলো!

সে বলল–

বর্তমান নেতা কুতাইবা বিন মুসলিম ধোঁকা দিয়ে আমাদের শহরে প্রবেশ করেছে। যুদ্ধের ঘোষণাও দেয়নি; আর আমাদের ইসলামের দাওয়াতও দেয়নি।

এবার কাজি আমিরের দিকে ফিরে বললেন, তোমার কী বলার আছে?

কাজিকে দেখল একবার; এরপর বলল,

যুদ্ধে তো ধোঁকা হয়। এই দেশটা অনেক বড়। এর বাসিন্দাদের আল্লাহ ﷻ আমাদের কারণে কুফর-শিরক থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর এই দেশটাকে মুসলমানদের মালিকানায় দিয়ে দিয়েছেন।

কাজি : আক্রমণের পূর্বে কি সমরকন্দের লোকদের তুমি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলে? কিংবা কর দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলে? কিংবা এ-দুটোর অস্বীকৃতির ফলে যুদ্ধের আহ্বান করেছিলে?

সিপাহসালার : না; এমনটা হয়নি।

কাজি : তা হলে তুমি তোমার দোষ স্বীকার করছ?

এরপর কাজি কী বললেন, তা দেখুন–

আল্লাহ ﷻ এই উম্মতকে এজন্য সাহায্য করেছেন যে, তারা দীনের অনুসরণ করেছে এবং ধোঁকা পরিহার করে চলেছে।

আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের ঘোড়া দৌড়াই শুধুই আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে–জমিন কব্জা করার জন্য নয়।

অন্যায়ভাবে সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি ফয়সালা দিচ্ছি যে, মুসলমানরা এই শহর ছেড়ে চলে যাবে।

শহর তার মূল বাসিন্দাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে। এরপর তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেবে; যুদ্ধের আহ্বান করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেবে।

সমরকন্দের লোকজন এই ফয়সালা শুনল। চোখ যা দেখেছে, কান যা শুনেছে, তা তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভাবল, স্বপ্ন দেখছি না তো! হুকুমতের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিয়েছেন কাজি। অনেকে বুঝতেই পারেনি–আদালত বরখাস্ত হয়ে গেছে এবং কাজি ও আমির চলে যাচ্ছেন।

আমাদের সমরকন্দি [মুসলমান] দূত সবিস্ময়ে দেখছিলেন গণকদের। তাদের চেহারার প্রতিক্রিয়া মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। চেহারার রং বদলে যাচ্ছে তাদের। গভীর চিন্তায় মগ্ন তারা। মনের ওপর জোর দিল গণক-প্রধান। চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। নিজের অতীতে ডুবে গেল সে। নিজের পথ ও বিশ্বাস নিয়ে ভাবতে লাগল–কত অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল তাদের। কতটা সীমাবদ্ধ চিন্তা ছিল, যা শুধুমাত্র গণকদের মধ্যেই সীমিত ছিল। এখন সে দীন-ইসলাম নিয়ে ভাবছে। তার পরিধি কত বড়। পুরোটাই কল্যাণকর। ন্যায় ও ইনসাফের দীন। যার উচ্চতায় সূর্যের কিরণ বা চাঁদের আলোও পৌঁছতে পারে না। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। ভাবছিল। চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মস্তিষ্কে। কত কাল আর অন্ধকারে থাকব? আলো তো খুবই স্পষ্ট। নিশ্চয়ই ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের দীন। ছোট-বড় সবাই সেখানে সমান। আদালতে আজ সবাই দেখেছে, কাজির সামনে একজন শাসক কীভাবে মাথা নত করে বসে ছিল। আমাদের বাদশাহ কি এভাবে

আদালতে আসতে পারেন? এসব চিন্তা ঘুরছিল তার মনে। এসময় ঘোড়া চলার আওয়াজ পেল। বাজারের ওপর দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। শোরগোল হচ্ছে। চোখ খুলল। আওয়াজের দিক কান পাতল। সাথিদের জিজ্ঞাসা করল, কীসের শোরগোল?

তাকে জানানো হল, কাজির ফয়সালা পালন হচ্ছে। সেনাবাহিনী ফিরে যাচ্ছে। হ্যাঁ! সেই মহান সেনাবাহিনী ফিরে যাচ্ছে, যাদের সামনে মদিনা থেকে নিয়ে সমরকন্দ পর্যন্ত কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। যারা কায়সার ও কেসরা এবং খাকানের শক্তি তছনছ করে দিয়েছে। যে শক্তিই মুসলমানের সামনে এসেছে, তাকে তারা খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আজ এক শীর্ণকায় দুর্বলদেহ কাজির ফয়সালার সামনে তারা অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। আজ সকালবেলারই তো কথা–একব্যক্তি, যার সাথে তার এক গোলাম ছিল, সে মুকাদ্দমা শুনেছে। কয়েক মিনিটের শুনানি। আদালতে উভয়পক্ষের বয়ান শুনেছে। সিপাহসালারের স্বীকারোক্তিও শুনেছে। এরপর দু'তিন বাক্যের একটি ফয়সালা। মুসলমানদের আমিরকে শহর খালি করার হুকুম জারি করেছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি রীতিমত চ্যালেঞ্জ দেবেন; আর এরপর লড়াই করবেন।

গণক তার সাথিদের কথা শুনছিল আর ভাবছিল–এই প্রবহমাণ বন্যার সামনে সমরকন্দের লোকজন কি টিকে থাকতে পারবে? মুকাবিলা করার শক্তি কি তাদের হবে? দুনিয়ার সব দেশ তাদের সামনে ঝুঁকে গেছে। আমাদের বাতিল দীন কি এই সত্যের সামনে স্থির থাকতে পারবে? তারা নুরে-ইসলামির মুকাবিলা করতে পারবে?

না! মোটেই পারবে না! প্রতিপালকের ফয়সালা এসে গেছে। জুলুম ও অন্যায়ের কালো রাত শেষ হয়ে গেছে। জগতের নতুন সকাল আসছে। সেই আলোর সামনে কেউ টিকতে পারে না। সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কী মত? আমাদের কী করা চাই? আমরা কী তাদের মুকাবিলা করতে পারব? আরে! জবাব দিচ্ছ না কেন? সে তাদের ডাকল।

সমরকন্দি মুসলমান দূত বলে উঠল, সাথিরা! আমার ফয়সালা এবং পরামর্শ শোনো!

তার দিকে কান পাতল সবাই। সে বলল–

আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ হলেন তার বান্দা ও রাসুল!

এখন বড় গণকের বলার পালা। সে বলল, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ হলেন তার বান্দা ও রাসুল।

আর এরপর আসমান দেখতে পেল, সমরকন্দের গলি-বাজারে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে। মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল তারা। অনুনয় করল তারা–এদেশ ছেড়ে যাবেন না আপনারা। ইসলামের ন্যায়-ইনসাফ আমাদের দরকার। আমরা আমাদের নিজেদের রাজত্ব দেখেছি। তাদের জুলুম-অত্যাচার সম্বন্ধে বেশ জানা আছে। আপনারা সবাই ফিরে যান। আমরাও আপনাদের ধর্ম কবুল করেছি।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, একটি বিজিত শহরে ফিরে আসছে মুসলমান বাহিনী।

কোনও শাসক-শাসিত রইল না; কোনও বিজয়ী-বিজিত থাকল না। সবাই ইসলামি ভাই হয়ে গেল।

কোনও আরবের কোনও অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনও শক্তিশালী কোনও দুর্বল থেকে মূল্যবান নয়। পার্থক্যের বিষয় হল তাকওয়া।

এভাবে ইসলামের নিয়ামত প্রবেশ করল সমরকন্দে। তার পর আর তা সেখান থেকে কেউ বের করতে পারেনি।

বিয়ের ৬ মাস পরেও সন্তান হতে পারে?

ছয় মাসে- প্রসূত সন্তানের ফয়সালা

আমাদের পূর্বসূরীদের নিয়ম ছিল, মাসয়ালার ধরন বোঝার পর ইজতিহাদ করতেন। পরে যদি কুরআন-হাদিসের কোনও ভাষ্য তাদের ইজতিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানো হত, তখন তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ফয়সালাকেই প্রাধান্য দিতেন। কোনওরূপ সংশয় করতেন না। এর একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল নিম্নবর্ণিত ঘটনা :

আমিরুল মুমেনিন উসমান[৭২] رضي الله عنه-র খেলাফতকালের ঘটনা। এক নারী বিয়ের ছ' মাস পর একটি সন্তান জন্ম দিল। অথচ সাধারণত

---

৭২. তৃতীয় খলিফা উসমান বিন আফ্‌ফান رضي الله عنه ছিলেন বনু উমাইয়্যা গোত্রের। আব্দে মানাফের সাথে গিয়ে তার বংশ-পরম্পরা নবীজি ﷺ-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। হিজরতের ৪৭ বছর পূর্বে তার জন্ম হয়। হযরত আবু বকর رضي الله عنه-র তাবলিগে উৎসাহিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি ﷺ একে একে তার দু' মেয়ে রুকাইয়্যা رضي الله عنها এবং উম্মে কুলসুম رضي الله عنها-কে তার বিবাহে প্রদান করেন। মদিনা মুনাওয়ারার 'বিরে রওমা' [একটি কুয়ো] ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। ২৪ হিজরিতে উমর رضي الله عنه-র শাহাদতের পর তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত আবু বকর رضي الله عنه-র যুগে সংকলিত কুরআনের কপি তিনি বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন এবং অন্যসব কপি বিনষ্ট করে দেন। এতে সকল মুসলমান এক কুরআনের ওপর একমত হয়ে যায়। তার খিলাফতকালে তারাবেলস, কুবরস, তবরস্তান, তরাকিস্তান [উত্তর আফগানিস্তান], কিরমান, যাবেলিস্তান [গজনা], খোরাসান এবং সিস্তান বিজয় হয়। ২৭ হিজরিতে আব্দুল্লাহ বিন নাফে' স্পেনের ওপর আক্রমণ করেন। ৩২ হিজরিতে মুআবিয়া رضي الله عنه রোমের কায়সরের বাহিনীকে পরাস্ত করেন। সাবাঈদের ফিতনার ফলে ৩৫ হিজরির ১৮-ই যিলহজ্জ তিনি শাহাদত বরণ করেন। [তারিখে ইসলাম, শাহ মঈনুদ্দিন নদভি : ২১৭-২৬৯]

গর্ভধারণের নয় মাস পর, আর কমপক্ষে সাত মাস পর সন্তানের জন্ম হয়। তাই লোকদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল—এই মহিলা স্বামীর অধিকারে খেয়ানত করেছে। তাদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হল—স্বামীর অধিকার আদায়ে এই মহিলা একনিষ্ঠ নয়। বিয়ের আগ থেকেই এই সন্তান তার পেটে। যেতে যেতে কথা উসমান رضي الله عنه পর্যন্ত পৌঁছল। এই ব্যাপারে যথারীতি মুকাদ্দমা দায়ের করা হল।

এই মহিলাকে খলিফা উসমান رضي الله عنه-র দরবারে উপস্থিত করা হল, যেন তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আলী رضي الله عنه-ও ছিলেন সেখানে। আর তিনিই ছিলেন খলিফার কাজি। তিনি বললেন, এই মহিলা বিয়ের ছ' মাস পরে সন্তান জন্ম দিয়েছে—শুধু এ কারণে তোমরা তাকে শাস্তি দিতে পারো না। স্বামীর সাথে খিয়ানতের অপবাদও দিতে পারো না।

আলী رضي الله عنه-র কথা শুনে সবাই বিস্মিত হল। জিজ্ঞাসা করল, কীসের ভিত্তিতে আপনি এ কথা বলছেন?

আলী رضي الله عنه বললেন, আল্লাহ سبحانه وتعالى ইরশাদ করেছেন—

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا﴾

'মহিলার গর্ভধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর সময় হল ত্রিশ মাস।'
[সূরা আহকাফ : ১৫]

অর্থাৎ গর্ভধারন এবং দুধপানের পুরো সময় হল ত্রিশ মাস [আড়াই বছর]।

আর সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে—

﴿وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

'মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দু' বছর দুধ পান করাবে।'
[সূরা বাকারা : ২৩৩]

আল্লাহ سبحانه وتعالى-র এই বাণী হিসেবে দুধ পান করানোর সময় হল দু' বছর, মানে চব্বিশ মাস। গর্ভধারণ ও দুধপানের পুরো সময় হল ত্রিশ মাস। আর এর থেকে চব্বিশ মাস হল দুধ পান করানোর সময়। তা হলে গর্ভধারণের বাকি থাকছে ছয় মাস। তাই বিয়ের ছ' মাসের মাথায়

কোনও মহিলা যদি সন্তান জন্ম দেয়, তা হলে সে শাস্তিযোগ্য হতে পারে না। সন্তান স্বামীর বলেই গণ্য হবে।

আলী رضي الله عنه-র দলিলের ভিত্তিতে ওই নারী প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি থেকে বেঁচে গেল।[৭৩]

হাফেজ ইবনে কাসির رحمه الله লেখেন, উল্লিখিত দুই আয়াত এবং সূরা লোকমানের আয়াত وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ দ্বারা আলী رضي الله عنه এই দলিল দেন যে, সন্তানপ্রসবের সর্বনিম্ন সময় হল ছয় মাস। ছয় মাসের মাথায় কোনও স্ত্রী যদি সন্তান জন্ম দেয়, তা হলে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। বরং সন্তান স্বামীর বলেই গণ্য হবে।

আলী رضي الله عنه-র প্রমাণ-উদ্ঘাটন শুদ্ধ ও শক্তিশালী। উসমান رضي الله عنه সহ সাহাবায়ে কিরামের একটি দল এই কথার ওপর একমত হয়েছেন। বরং মুসান্নাফে আব্দুররাজ্জাকের হাদিস [১৩৪৪৪] অনুসারে আমিরুল মুমেনিন উমর رضي الله عنه-রও এই মত ছিল।

৭৩. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৭/৩৫২ ; হাদিস ১৩৪৪৮। ঘটনাটি অন্যান্য হাদিসের কিতাব এবং তাফসিরের কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

খিয়ানতকারী সেক্রেটারীর বিচার

আয়াস বিন মুআবিয়া[৭৪] একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি তার যুগে কাজি ছিলেন। একব্যক্তি তার এক সেক্রেটারীর নিকট কিছু মাল আমানত রাখল। আমানত রেখে মক্কা গেল। কিছুদিন পর ফিরে এসে কাজির সেক্রেটারী থেকে তার মাল ফেরত চাইল। কিন্তু সে তার মাল ফেরত দিতে অস্বীকার করল।

কাজি আয়াসের নিকট এসে সে বিষয়টি তাকে জানাল। কাজি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাকে চিনি? আগে কি কখনও আমার নিকট এসেছ?

সে বলল, না।

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সেক্রেটারীর নিকট মাল আমানত রাখার সময় কাউকে জানিয়েছ?

সে বলল, না। এ ব্যাপারটা আর কেউ জানে না।

কাজি আয়াস : ফিরে যাও, এবং বিষয়টি গোপন রাখো। দু'দিন পর আমার নিকট এসো।

সে ব্যক্তি চলে গেল। কাজি আয়াস তার তার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমার নিকট বেশ কিছু মাল জমা হয়েছে। আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট আমানত রাখি। তোমার ঘর কি নিরাপদ?

৭৪. কাজি আয়াস বিন মুআবিয়া হাদিসের একজন নির্ভরযোগ্য রাবি ছিলেন। তার সূক্ষ্মদূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রবাদ বাক্যের মত ছিল। মুসলিম শরিফের মুকাদ্দমায় তার আলোচনা এসেছে। তিনি দীর্ঘ আয়ু পেয়ে ১২১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [সিয়ারু আ'লামিন্নুবালা : ৫/১৫৫]

সেক্রেটারী বলল, হ্যাঁ, নিরাপদ।

কাজি আয়াস বললেন, মাল রাখার জন্য জায়গা তৈরী করো। দু'দিন পর কয়েকজন লোক নিয়ে এসো। মালগুলো নিতে হবে।

দু'দিন পর ওই ব্যক্তি কাজি আয়াসের নিকট এল। কাজি সাহেব তাকে বললেন, যে সেক্রেটারীর নিকট মাল আমানত রেখেছিলে, তার নিকট গিয়ে তোমার মাল ফিরে চাও। তোমার মাল ফেরত দিলে তো ভাল। নচেৎ বলবে, এই বিষয়টি আমি কাজিকে জানাব।

সেক্রেটারীর নিকট এসে সে ব্যক্তি বলল, আমার মাল ফিরিয়ে দাও। নচেৎ কাজি সাহেবের নিকট গিয়ে সব জানিয়ে দেব। সেক্রেটারী তার মাল ফিরিয়ে দিল।

এরপর কাজির কথা অনুযায়ী সেক্রেটারী তার ঘরে মাল নেওয়ার জন্য উপস্থিত হল। কাজি সাহেব তাকে আচ্ছামত ধমকিয়ে বললেন, খেয়ানতকারী! আমার কাছেও এসো না![৭৫]

[৭৫] তরায়েফু মিনাত্তুরাসিল আরাবি

ঋণগ্রস্ত দায়মুক্ত হল

একব্যক্তিকে নিয়ে কয়েক ব্যক্তি কাজির দরবারে উপস্থিত হল। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনা কী?

তারা বলল, এই ব্যক্তি আমাদের নিকট ঋণগ্রস্ত। আমাদের ঋণ আদায়ের জন্য তাকে বলছি; কিন্তু সে আদায় করছে না।

ঋণ আদায়ের জন্য কাজি সাহেব তাকে নির্দেশ দিলেন।

সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ﷻ কাজি সাহেবের কল্যাণ করুন! আমার একটি ইমারত আছে। ভাড়ায় দিয়েছি। কয়েক দিন পরই ভাড়া পাবো। ভাড়া পেলেই তাদের সব ঋণ আদায় করে দেব।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে কাজি সাহেব পাওনাদারদের দিকে তাকালেন। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমাদের জানামতে ওর কোনও ইমারত বা সহায়-সম্পত্তি নেই। ও তো আমাদেরকে বিলম্বিত করার জন্য বলছে যে, তার ইমারত আছে। অথচ ও একজন গরিব ও হতদরিদ্র।

পাওনাদারদের কথা শুনে কাজি সাহেব ঋণগ্রহীতার দিকে মনোযোগ দিলেন। বললেন, এখন তুমি যেতে পারো। তোমার পক্ষে ফয়সালা হয়ে গেছে। তুমি ঋণ আদায় করবে না।

এ ফয়সালা শুনে পাওনাদাররা চমকে উঠল। বলল, এটা কীভাবে হতে পারে? এটা কি কোনও বিচার হল?

কাজি সাহেব বললেন, তোমরা নিজেরাই তো ঋণীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে যে, এর কোনও ইমরাত নেই। এ নিতান্তই গরিব। আর যখন কেউ দরিদ্র হয়ে যায়, তখন সে ঋণের টাকা কোত্থেকে আদায় করবে?

ন্যায়-বিচার দ্বারাই রাজ্য

খলিফা মনসুর আব্বাসীর[৭৬] যুগের ঘটনা। এক শাসক একব্যক্তির জায়গীর অন্যায়ভাবে কব্জা করে নিল। অভিযোগ নিয়ে সে ব্যক্তি খলিফার দরবারে উপস্থিত হল। বলল, আমিরুল মুমেনিন! আল্লাহ ﷻ আপনাকে নিরাপদে রাখুন। আমি কি আমার প্রয়োজন সরাসরি বলব, না কি কোনও উদাহরণ দেব?

খলিফা বললেন,

প্রয়োজনের কথা বলার আগে একটি উদাহরণই বলো!

তখন সে ব্যক্তি বলল,

কোনও শিশু যখন কোনও অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন মা থেকে বড় আর কোনও সাহায্যকারী তার থাকে না। যখন কিছুটা বোধশক্তি হয়, তখন অভিযোগ করে পিতার নিকট। কারণ, সে বোঝে, মা থেকে বাবাই তার সাহায্য বেশি করতে পারবে। এরপর যখন যৌবনে পৌঁছে তখন তার অভিযোগ নিয়ে যায় হাকিমের নিকট। কারণ, তার জানা থাকে, পিতা থেকে হাকিম অধিক শক্তিশালী। এরপর

৭৬. আবু জাফর মনসুর [১৩৬ হি.-১৫৮ হি.] ছিলেন দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা। তার ভাই আবু আব্দুল্লাহ সাফ্‌ফাহর ওফাতের পর তিনি সিংহাসনে বসেন। তিনিই আব্বাসি খেলাফত পাকাপোক্ত করেন এবং বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তির করেন। তার পুত্র জাফরের দিকে সম্পর্কিত করে তাকে আবু জাফর বলা হয়। বাদশাহ হারুন রশিদের স্ত্রী যুবায়দা ছিল জাফরের মেয়ে। মনসুরের পর তার পুত্র মাহদি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/৮৫৫-৮৮৯]

ধরে ডেকে সে তাকে পিছু পিছু আসার ইশারা করল। সে বুঝে গেছে, এ হল ইবাদতখানার চৌকিদার। তার পিছু পিছু চলল সে। কয়েকটি মোড় নেওয়ার পর গণকদের সরদারের সামনে পৌঁছল। কেউ তাকে দেখেনি। ইবাদতখানা থেকে বের হয় না সে। খুব কম লোকই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। দেশটার প্রকৃত শাসক এই গণক। তার বিরোধিতা করার সাহস কারও নেই। …

… তা ছাড়া তুমি বুদ্ধিমান এবং সাহসী। আলাপ-আলোচনার নিয়মও জানো। এখন তুমি কি এ কাজটি করতে আগ্রহী?

যুবক ইতিবাচক সাড়া দিল।

বড় গণক বলল, তা হলে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে যাও। তোমার পথের খরচপাতি পর্যাপ্ত পরিমাণ দেওয়া হবে।

যুবক সেখান থেকে যখন বের হল, তখন তার মুখে হাসির ফোয়ারা – সবচেয়ে বড় গণক সাক্ষাৎ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। এখন সময়

যখন বিবেক-বুদ্ধি বাড়তে থাকে, তখন তার সমস্যার কথা সুলতানের দরবারে পেশ করে। কারণ, সে জানে, সব মানুষের তুলনায় সুলতান অধিক শক্তিশালী। কিন্তু সুলতানের দরবারেও যখন সে বিচার পায় না, তখন আল্লাহ ﷻ-র দরজায় উপস্থিত হয়।

আমিও একটি মসিবতের সম্মুখীন হয়েছি। অভিযোগ নিয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আমার জানা আছে, মাটির ওপর আপনার থেকে শক্তিশালী আরেকজন নেই। আপনি যদি আমার সাথে ইনসাফ করেন, তবে তো ঠিক আছে। নচেৎ আমিও ইনসাফের জন্য আল্লাহ ﷻ-র দরজায় উপস্থিত হব।

খলিফা মনসুর বললেন, আমি তোমার সাথে ন্যায়ই করব।

সে জানাল, আপনার অমুক হাকেম অন্যায়ভাবে আমার জমিন দখল করে নিয়েছে। খলিফা ওই হাকেমকে জায়গীর ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর লিখে পাঠালেন, এই ব্যক্তির সুখশান্তির ব্যবস্থা করে দাও, এবং তার জীবিকা সন্তোষজনক করে দাও।

বলো তো দেখি, কয়টি আঙ্গুল

কাজি আয়াস বিন মুআবিয়ার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অসাধারণ। তার এই অনন্য গুণের চর্চা হত চারিদিকে। আদালতে বসে তিনি এতটা অসাধারণ ফয়সালা করতেন যে, সবাই বিস্মিত হয়ে যেত। তার এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। বড়দের যেমন গুণগ্রাহী থাকে, তেমন তাদের নিন্দুকেরও অভাব নেই। বেশ কিছু লোক তার সাথে শত্রুতা পোষণ করত। তার দোষ খুঁজে বেড়াত, যেন তাকে কলঙ্কিত করা যায়। অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পর তাদের হাতে একটি অস্ত্র এল—কাজি সাহেব ফয়সালা করার জন্য সময় নেন না, কিংবা ততটা চিন্তাভাবনাও করেন না। ঝটপট ফয়সালা করে ফেলেন। তার এই অনন্য গুণটাকেই দোষ হিসেবে প্রচার করতে লাগল। বলে বেড়াতে লাগল, একজন কাজির উচিত, উপস্থাপিত মুকাদ্দমাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাফিকির করা, তার গভীরে পৌঁছা। এরপর ফয়সালা দেওয়া। লোকদের মধ্যে এই বীজটা ছড়িয়ে দিল তারা। ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল—ফয়সালা করতে কাজি সাহেব সময় নেন না। খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলেন।

বিষয়টি কাজি সাহেবও জানতে পারলেন। তিনিও তাদের শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

খুবই আদব সহকারে কাজি সাহেব তাদেরকে তার মজলিসে ডাকলেন। যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। ভালভাবে পানাহার করালেন। এরপর কথাবার্তা শুরু করলেন। কথার ফাঁকে হঠাৎ তিনি হাত উঁচু করে বললেন, বন্ধুরা! বলো তো দেখি, কয়টি আঙ্গুল আছে?

উপস্থিত সবাই হাতের দিকে একবার তাকাল, এবং একবাক্যে বলল, পাঁচটি আঙ্গুল, জনাব! পুরো পাঁচটি।

তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। বললেন, বন্ধুরা! তোমরা এত জলদি জবাব দিলে কেন? এক দুই তিন চার পাঁচ গণনা করে একটু অপেক্ষা করতে; চিন্তাভাবনা করতে; একটু সময় নিয়ে জবাব দিতে!?

তারা বলল, কাজি সাহেব! এখানে দেরি করার বা চিন্তাভাবনা করার কী দরকার? যে বস্তুর সংখ্যা আমাদের জানা আছে, সেখানে অপেক্ষা করতে যাব কেন?

এখন কাজি সাহেব খুবই ঠাণ্ডাভাবে তাদের বললেন, যখন আমার নিকট মুকাদ্দমা আসে, তখন আমি উভয়পক্ষের কথা শুনেই বিষয়টির গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যাই। তা হলে ফয়সালা করতে বিলম্ব করব কেন?

এই উদাহরণ দিয়ে কাজি সাহেব তাদের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। হিংসুকদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের জানা হয়ে গেল, ফয়সালা করার ক্ষেত্রে কাজি সাহেব জলদি করেন না। বরং আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বদৌলতে কথার গভীরে তিনি সহজেই পৌঁছে যান, এবং অনতিবিলম্বে ফয়সালা করে দেন।

উপস্থিত লোকজন যখন সেখান থেকে বিদায় নেয়, তখন তারা তার বুদ্ধিমত্তার ভক্ত হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে যে কথা বলত, তা থেকে তারা ফিরে এসেছে।

১৪৭

১৪৮

কাজির বুদ্ধিমত্তায় চোর পাকড়াও

এক ব্যবসায়ী মাল চুরি হল। সন্দেহজনক দুই ব্যক্তিকে লোকজন কাজির দরবারে হাজির করল। বলল, এই দুই ব্যক্তির ওপর আমাদের সন্দেহ। তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না, চোর কে। এখন আদালতই ফয়সালা করবে যে, কে চোর?

কাজি সাহেব বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমার তৃষ্ণা পেয়েছে। পানি পান করার পর ফয়সালা করব। এরপর খাদেমকে পানি আনার নির্দেশ দিলেন। খাদেম তার হুকুম পালন করল। খুব সুন্দর ও উন্নতমানের একটি কাঁচপাত্রে করে পানি আনল। পাত্রটি হাতে নিয়ে কাজি সাহেব পানি পান করতে যাবেন। হঠাৎ তিনি হাত থেকে পেয়ালাটি ছেড়ে দিলেন। মাটিতে পড়েই পাত্রটি ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে গেল। পাত্রটি ভাঙ্গাতেই চমকে উঠল সবাই–হঠাৎ কী হল? চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। এরই মধ্যে কাজি দু'জনের একজনের জামার কলার ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জে উঠলেন, তুই-ই চোর!

সে বার বার অস্বীকার করে যাচ্ছিল–জনাব! আমি চোর নই। আমি চুরি করিনি। কিন্তু কাজি সাহেব তাকে বার বার ঝাঁকুনি দিয়ে বলে যাচ্ছেন, চুরি তুই-ই করেছিস!

অবশেষে সে তার অপরাধ স্বীকার করল–আসলে আমিই চুরি করেছি। এখন লোকজন, এবং চোর নিজেও জিজ্ঞাসা করল, আপনি চোর তো ধরে নিয়েছেন। কিন্তু কীভাবে নিশ্চিত হয়েছেন, তা আমাদের একটু বলুন। আপনার নিকট তো কোনও প্রমাণ ছিল না।

কাজি সাহেব বললেন, আসলে আমার পিপাসা লাগেনি। আমি জানি, চোরদের মন খুব শক্ত হয়। বুঝেশুনে আমি পানির পাত্রটি আনিয়েছি।

তোমাদের দুজনের মুখের দিকে আমার চোখ ছিল। আমি যখন পাত্রটি ফেলে দিলাম, তখন সেটার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার আওয়াজ হল। সে-আওয়াজে তোমার সাথিসহ সবাই চমকে উঠল, সবার মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল—কী ঘটেছে? কিন্তু তোমার অবস্থা ছিল একেবারে উল্টো। তোমার মধ্যে কোনও ভাবান্তর হল না। চেহারায় ভয় বা অস্থিরতার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। চোর-ডাকাতরা বড় বড় ঘটনায়ও ঘাবড়ায় না। ছোট একটি পেয়ালা ভাঙার শব্দ তো সামান্য ব্যাপার। কিন্তু সামান্য একটি ঘটনায়ও সাধারণ লোকজন যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। যেমন তোমার সাথি পেয়ালা ভাঙার আওয়াজে কেঁপে উঠেছে। এতে আমি চিনতে পেরেছি যে, তুমিই হলে আসল অপরাধী। এখন তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

খেয়ানতের গোমরফাঁক

একব্যক্তি সরকারি এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর নিকট একটি থলে আমানত রাখল। বলল, থলেটিতে দিনার আছে। এর পর সে অনেক দিন অনুপস্থিত ছিল। অনেকদিন ধরে যখন ওই ব্যক্তি ফিরে আসেনি, তখন সেই কর্মকর্তা একটি চাল চালল। খুব সাবধানে থলের নীচের সেলাই কাটল। থলে থেকে সবগুলো দিনার বের করে সেখানে দেরহাম ভরে রাখল। এরপর সেলাই করে থলেটি আগের মত করে দিল।

পনেরো বছর পর ওই ব্যক্তি ফিরে এল। ওই কর্মকর্তার নিকট গেল। তার আমানত ফেরত চাইল। কর্মকর্তা তার থলে তাকে ফেরত দিল। আগের মতই মুখ বাঁধা ছিল থলের।

ওই ব্যক্তি থলেটি খুলল। দেখতে পেল, এতে কোনও দিনার নেই। শুধুই দেরহাম। তা দেখে সে কেঁপে উঠল। বলল, এ থলে তো আমার নয়। আমার থলের মধ্যে তো দিনার ছিল, আর এটাতে দেরহাম। আমাকে আমার দিনারের থলে দাও।

কর্মকর্তা বলল, আরে ভাই! মনোযোগ দিয়ে দেখ। এটা তো সে-থলেই, যা তুমি আমার নিকট রেখেছিলে। এখনও সেটার মুখ বাঁধা। এই থলে তোমারই। আমি তোমাকে কোনওরূপ ধোঁকা দিইনি। আর এই ব্যক্তি তার দিনারের থলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এখানে যখন সে নিরাশ হল, তখন সে আমির উমর বিন হুবাইরার নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করল। উমর বিন হুবাইরা মুকাদ্দমাটি কাজি আয়াস বিন মুআবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

দিনারের মালিককে তিনি বললেন, তোমার মুকাদ্দমার আরজি বলো।

সে বলল, এই কর্মকর্তার নিকট আমানত হিসেবে আমি দিনারের থলে রেখেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে দেরহামের থলে দিচ্ছে।

কাজি আয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিন আগে দিয়েছ?

জবাবে সে বলল, পনেরো বছর আগে।

এরপর কাজি আয়াস ওই কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী বলো?

সে বলল, তার থলে তো মুখবাঁধা অবস্থায় আছে।

কাজি জিজ্ঞাসা করলেন, কত বছর ধরে?

কর্মকর্তা বলল, পনেরো বছর ধরে।

কাজি আয়াস খাদেমদের নির্দেশ দিলেন, থলের মুখটা খুলে দেরহামগুলো ছড়িয়ে দাও।

খাদেমরা তা-ই করল। থলের মুখ খুলে সবগুলো দেরহাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল।

ছড়ানো দেরহামগুলোর কিছু ছিল দশ বছর পুরোনো; কিছু পাঁচ বছর পুরোনো। কিছু তার আগেপিছের। কর্মকর্তাকে কাজি আয়াস বললেন, তুমি স্বীকার করেছ যে, থলেটি তোমার নিকট পনেরো বছর ধরে আছে। অথচ এর ভেতর পাঁচ বছর আগের দেরহামও আছে। এর অর্থ হল, এর মধ্যে অবশ্যই থলেটি খোলা হয়েছে। আর তখন দিনারগুলোকে দেরহাম দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে।

কাজি আয়াসের প্রমাণ অপরাধীকে তার অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করল। অবশেষে সে তার দোষ স্বীকার করল। সে একজন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হল। তার খেয়ানতের গোমরফাঁক হয়ে গেল।[৭৭]

---

[৭৭] তারিখে দামেশক-আলকবির : ১০/২২ ; ইবনে আসাকের, দারু এহইয়ায়ে তুরাছিল আরাবি

ছিঁড়ে গেল গোলামির জিঞ্জির

আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-র বর্ণনা। জুম্বা' বিন সালামা জুযামি رضي الله عنه-র এক গোলাম ছিল। তার নাম ছিল সুনদারা বা ইবনে সুনদার। একবার তিনি দেখতে পেলেন, সুনদারা তার এক দাসীকে চুমো খাচ্ছে। তিনি [রাগে এসে] গোলামের লিঙ্গ কেটে ফেললেন। তার কান এবং নাকও কেটে দিলেন।

অভিযোগ নিয়ে গোলাম রাসুল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল। তার এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি জুনবা' رضي الله عنه-কে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন–

'তুমি এ কাজ করতে গেলে কেন?'

তিনি বললেন, সে আমার এক দাসীর সাথে এই এই কাজ করেছে। রাসুল ﷺ তাকে সতর্ক করে বললেন–

'এ দাস-দাসীরা যে কাজ করার শক্তি রাখে না, তাদেরকে সে কাজের দায়িত্ব দিয়ো না। তোমরা নিজেরা যা খাও, তা থেকেই তাদের খেতে দাও। তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরও তা পরিধান করাও। তাদেরকে যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তা হলে তাদের বিক্রয় করে দাও। যে গোলামের ওপর তোমরা খুশি, তাদেরকেই তোমাদের নিকট রাখো। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টিকে [এরূপ বেদনাদায়ক] শাস্তি দিয়ো না।'

এরপর বললেন–

'যে গোলামকে বিকৃত করে দেওয়া হয়, বা আগুনে পোড়ানো হয়, সে আজাদ। [যে গোলামকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হয়,] সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আজাদকৃত গোলাম।'

ওই গোলামটিকে রাসুল ﷺ তখনই আজাদ করে দিলেন।

নিজের মুক্তির নির্দেশ শুনে গোলাম রাসুল ﷺ-এর নিকট আরজ করল–

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য ওসিয়্যত করুন!'

রাসুল ﷺ তার জন্য এই ওসিয়্যত করলেন–

'তোমার জন্য আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ওসিয়্যত করছি।' [তারা যেন তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করে।]

খুলাফায়ে রাশেদিন-সহ সকল মুসলমান তাদের নবীর ওসিয়্যত যথাযথভাবে পূরণ করেন। রাসুল ﷺ-এর ওফাতের পর সে আবু বকর রাযি.র নিকট গেল। তিনি সাধ্যানুসারে তার সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। তার ওফাত হলে উমর رضي الله عنه-র নিকট এসে বলল–

'[আমার ব্যাপারে] রাসুল ﷺ-এর ওসিয়্যত পালন করুন!'

উমর رضي الله عنه বললেন, হ্যাঁ! হ্যাঁ! অবশ্যই! অবশ্যই! এরপর বললেন–

'তুমি চাইলে আমার নিকট থাকতে পারো। সে-ক্ষেত্রে আমি তোমার জন্য তা-ই জারি করে দেব, যা জারি ছিল। তোমার চাহিদা অনুযায়ী কোথাও যেতে চাইলে তোমার জন্য লিখে দেব [যেন সেখানকার গভর্নর তোমার প্রতি লক্ষ রাখে]।'

সুনদারা বলল, মিসর যাওয়ার ইচ্ছা আমার। কারণ, সেটা খুবই উর্বর ও ফলনশীল এলাকা।

তার ইচ্ছা অনুসারে আমিরুল মুমেনিন মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-র নিকট লিখলেন–এ হল সুনদারা। তোমার নিকট যাচ্ছে। তার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর অসিয়্যত পুরোপুরি খেয়াল রেখো।'

মিসর পৌঁছলে সুনদারাকে আমর ইবনুল আস رضي الله عنه উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। সব ধরনের সুযোগসুবিধা করে দিলেন। একটি বিশাল

জায়গীর দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার মৃত্যুর পর সে-সব বাইতুল মালে যোগ করা হল।[৭৮]

বলার উদ্দেশ্য হল, এই গোলামের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর দেওয়া ওসিয়্যতের ফল এটা হল যে, নবীজি ﷺ-র মৃত্যুর পরও মুসলমানরা তার সাথে খুবই উত্তম আচরণ করে। প্রিয়নবীর ফয়সালাকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে।

[৭৮] নাটি উৎস হল– উসদুল গাবা : ১৭৫৯ ; আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহ ﷺ, ইবনুত্তালা' : ২/৬৪৮ ; মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ :৪/২৩৯ ; আলইসাবা : ৯২৪ ; ইবনে মাজাহ, কিতাবুদ্দিয়াত : ২৬৮০ ; আবু দাউদ :৪৫১৯ ; তবরানি : ৫/৩১০ প্রভৃতি কিতাব।

কাজির পদের পরীক্ষা

আয়াস বিন মুআবিয়াকে ডেকে উমর বিন হুবাইরা[৭৯] জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কুরআন পড়তে পারো?

আয়াস বিন মুআবিয়া : হ্যাঁ।

উমর বিন হুবাইরা : ফারায়েজের জ্ঞান আছে?

আয়াস বিন মুআবিয়া : হ্যাঁ।

উমর বিন হুবাইরা : অনারবদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ আছে?

আয়াস বিন মুআবিয়া : পড়ে রেখেছি।

উমর বিন হুবাইরা : আরবদের ইতিহাস পড়েছ?

আয়াস বিন মুআবিয়া : হ্যাঁ, পড়েছি।

উমর বিন হুবাইরা : আমার আশা, তোমাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ দেব। [তখন আমর বিন হুবাইরা শাসক ছিলেন।]

---

[৭৯] উমর বিন হুবাইরা ছিলেন বনু ফাযারা গোত্রের। কস্তুন্তুনিয়ার অভিযানের নেতৃত্ব খলিফা ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেক তার ওপর অর্পণ করেন। ১০৩ হিজরিতে তাকে ইরাকের ওয়ালি নিয়োগ করেন। কিন্তু খলিফা হিশাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন। ১০৭ হিজরিতে উমর বিন হুবাইরা মৃত্যুবরণ করেন। [সিয়ারু আ'লামিন্নুবালা, চতুর্থ খণ্ড] উমরের মতই তার পুত্র আবু খালেদ ইয়াজিদও 'ইবনে হুবাইরা' নামে পরিচিত ছিলেন। [উর্দু দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়া]

আয়াস বিন মুআবিয়া বললেন, আমার মধ্যে তিনটি এমন স্বভাব রয়েছে, যেগুলো থাকা অবস্থায় কাজির পদের জন্য উপযোগী হওয়া যায় না।

উমর বিন হুবাইরা : সেই স্বভাব-তিনটি কী কী?

আয়াস বিন মুআবিয়া : প্রথমটি হল, আমি কুৎসিত, যেমনটা আপনি দেখছেন। দ্বিতীয়টি হল, আমার প্রকৃতিতে তীক্ষ্ণতা রয়েছে। আর তৃতীয়টি হল, এই দায়িত্ব পালনে আমি অপরাগ।

উমর বিন হুবাইরা : তুমি অসুন্দর, তাতে কী? তোমাকে দিয়ে তো সুন্দরের প্রদর্শনী দেব না। আর তুমি বলেছ, এই দায়িত্ব পালনে তুমি অপারগ। কিন্তু আমি মনে করি, এ-ক্ষেত্রে তুমি লৌকিকতা করছ। নচেৎ কাজির পদের জন্য তুমি একেবারেই যোগ্য। আর তীক্ষ্ণ প্রকৃতির যে কথা বলেছ, তো কোঁড়া দিয়ে তা ঠিক করা যাবে। যাও! আমি তোমাকে কাজির পদে নিয়োগ দিলাম।

এরপর আমির উমর বিন হুবাইরা আয়াস বিন মুআবিয়াকে একশ দেরহাম দিলেন। এটাই ছিল তার জীবনের সর্বপ্রথম উপার্জন।[৮০]

১৫৫

[৮০] তারিখে দামেশক আল-কবির, ইবনে আসাকের : ১০/১৯

অপরাধী ধরার অভিনব কৌশল

একব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় তার হার এক আতরবিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখল। সফর থেকে ফিরে এসে আতরবিক্রেতা থেকে তার হার ফেরত চাইল। কিন্তু হার দিতে সে অস্বীকার করল।

এই ব্যক্তি খলিফার দরবারে গিয়ে আতরবিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। খলিফা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও কৌশলী। তাকে বললেন–

এখন তুমি চলে যাও। আতরবিক্রেতার দোকানের সামনে বসে থাকো। তবে আতরবিক্রেতার সাথে কথাবার্তা বোলো না। হারের জন্যও তাগাদা দিয়ো না। এরূপ তিন দিন করবে। চতুর্থ দিন আমি কয়েকজন ফৌজ নিয়ে সেখান দিয়ে যাব। তোমার নিকট গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ব। আন্তরিকভাবে তোমাকে সালাম করব। তবে তুমি আমার পরওয়া করবে না। স্বাভাবিকভাবে আমার সালামের জবাব দিয়ে সেখানেই বসে থাকবে। আমি কোনও প্রশ্ন করলে খুবই ঠাণ্ডাভাবে আমার কথার জবাব দেবে। অতিরিক্ত কথা বলবে না। আর আমি ফিরে আসার সময় আমাকে বিদায় জানাবে না। আমি ফিরে আসার পরই আতরবিক্রেতা নিজেই তোমাকে তোমার হার ফিরিয়ে দেবে।

নির্দেশ মুতাবিক চতুর্থ দিনও সে ব্যক্তি আতরবিক্রেতার দোকানের সামনে বসে রইল। এই সময় সৈন্যসামন্ত নিয়ে খলিফা সেখানে এসে পৌঁছলেন। ঘোড়া থেকে নেমে খলিফা বড়ই আন্তরিকতার সহিত তাকে সালাম দিয়ে বললেন, দোস্ত! এতদিন কোথায় ছিলে? অনেক দিন ধরে তোমাকে দেখছি না!

বন্ধকরাখা ব্যক্তি জবাব দিল, সহসাই আপনার নিকট যাব। এখন আমি অনেক ব্যস্ত।

খলিফা সেখান থেকে চলে গেলে আতর বিক্রেতা লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! তুমি যে হারের কথা বলছ, সেটার কোনও আলামত বলো। কারণ, আমার মনের ওপর জোর দিয়েও তোমার হারের কথা স্মরণ করতে পারছি না। সে আলামত বলল। আতরবিক্রেতা তালাশ করে সেটা বের করে তাকে ফিরিয়ে দিল। হারটি নিয়ে সেই ব্যক্তি খলিফার দরবারে উপস্থিত হল। ফৌজ পাঠিয়ে খলিফা আতরবিক্রেতাকে ধরিয়ে আনালেন। তাকে খেয়ানতের উপযুক্ত শাস্তি দিলেন।

১৫৯

ফয়সালা কার বিরুদ্ধে

বর্ণিত আছে, আদি বিন আরতাত[৮১] কাজি শুরাইহের দরবারে উপস্থিত হল।

কাজি শুরাইহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় আছ?

আদি বিন আরতাত : আপনার এবং আপনার দেয়ালের মধ্যখানে। আপনি আমার কথা শুনুন।

কাজি শুরাইহ : জনাব! মুকাদ্দমা শোনার জন্যই বসে আছি।

আদি বিন আরতাত : আমি এক মেয়েকে বিয়ে করেছি।

কাজি শুরাইহ : আল্লাহ ﷻ তোমাদের দুজনের মধ্যে মিল-মহব্বত রাখুন এবং নেক সন্তান দান করুন।

আদি বিন আরতাত : কিন্তু আমার শ্বশুরপক্ষ এই শর্ত দিয়েছে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তাদের বাড়ি থেকে আমার বাড়ি নিতে পারব না।

কাজি শুরাইহ : শ্বশুরপক্ষের শর্ত অনুযায়ী আমল করো।

আদি বিন আরতাত : কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে নিজ বাড়ি নিতে চাই।

কাজি শুরাইহ : শর্তের হক হল, তা রক্ষা করে চলা।

---

[৮১] আদি বিন আরতাত ফাযারি দামেশকি উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-র শাসনকালে বসরার আমির ছিলেন। তার মৃত্যুর পর আদি বিন আরতাতের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতে তিনি বিদ্রোহ করেন। পরিণতিতে মাসলামা বিন আব্দুল মালেকের সাথে যুদ্ধ হয়। এতে তিনি এবং তার পুত্র মুআবিয়া মৃত্যুবরণ করেন। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৫/৫৩]

আদি বিন আরতাত : কিন্তু আমি তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কাজি শুরাইহ : আল্লাহর হিফাজতে ও নিরাপত্তায় যাও।

আদি বিন আরতাত : আপনি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।

কাজি শুরাইহ : আমি ফয়সালা করে দিয়েছি।

আদি বিন আরতাত : ফয়সালা কার বিরুদ্ধে?

কাজি শুরাইহ : তোমার মায়ের ছেলের বিরুদ্ধে।

আদি বিন আরতাত : কার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে?

কাজি শুরাইহ : তোমার খালার বোনের ছেলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।

[প্রিয় পাঠক! ঘটনা বুঝে না এলে আবারও পড়ুন। মজা পাবেন।]

জারিরের দাবি ঠিক

জারির[৮৪] -র বর্ণনা। উমর -র খেলাফতকাল। ইরাক এবং অন্যান্য অনারব দেশে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। আমিরুল মুমেনিন আমাকে বললেন—

জারির! তুমি তোমার গোত্রের লোকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও। তুমি যদি তোমার গোত্রের লোকদের নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারো, তা হলে যুদ্ধলব্ধ মালের চার ভাগের এক ভাগ পাবে।

আমিরুল মুমেনিনের নির্দেশ পেতেই জারির যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন। কুফর ও ইসলামের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। ওই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। শত্রুরা চরমভাবে পরাস্ত হয়েছে। গনিমত হিসেবে অনেক মাল মুসলমানদের হাতে এল। তাদের সিপাহসালার ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস । তার নিকট জারির গনিমতের মালের এক-চতুর্থাংশ দাবি করলেন। তার দাবির বিবরণ লিখে সা'দ চিঠি পাঠালেন উমর রাযি.র নিকট।

জবাবে উমর লিখে পাঠালেন—

[৮৪] জারির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবের বাজালি ছিলেন বনু বাজিলা গোত্রের। নবীজি -এর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি তাকে যিল খালাসার মূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্ব দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। তিনি তার গোত্রের দেড়শ' লোক নিয়ে মূর্তিটি জ্বালিয়ে দেন। ৫১ হিজরি বা ৫৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার সুদর্শন চেহারার কারণে হযরত উমর রাযি. তাকে 'এ-উম্মতের ইউসুফ' বলে আখ্যায়িত করেন। [উসদুল গাবা : ১/৫২৯]

ন্যায়-বিচার দ্বারাই রাজ্য

খলিফা মনসুর আব্বাসীর[৭৬] যুগের ঘটনা। এক শাসক একব্যক্তির জায়গীর অন্যায়ভাবে কব্জা করে নিল। অভিযোগ নিয়ে সে ব্যক্তি

১৪৪ — ১৬০
পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুপস্থিত

৭৬. আবু জাফর মনসুর [১৩৬ হি.-১৫৮ হি.] ছিলেন দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা। তার ভাই আবু আব্দুল্লাহ সাফ্‌ফাহর ওফাতের পর তিনি সিংহাসনে বসেন। তিনিই আব্বাসি খেলাফত পাকাপোক্ত করেন এবং বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তির করেন। তার পুত্র জাফরের দিকে সম্পর্কিত করে তাকে আবু জাফর বলা হয়। বাদশাহ হারুন রশিদের স্ত্রী যুবায়দা ছিল জাফরের মেয়ে। মনসুরের পর তার পুত্র মাহদি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/৮৫৫-৮৮৯]

জারির রা. কে এই উম্মতের ইউসুফ বলতেন উমর রা.

জারিরের দাবি ঠিক

জারির[৮২] ﷺ-র বর্ণনা। উমর ﷺ-র খেলাফতকাল। ইরাক এবং অনান্য অনারব দেশে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। আমিরুল মুমেনিন আমাকে বললেন–

জারির! তুমি তোমার গোত্রের লোকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও। তুমি যদি তোমার গোত্রের লোকদের নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারো, তা হলে যুদ্ধলব্ধ মালের চার ভাগের এক ভাগ পাবে।

আমিরুল মুমেনিনের নির্দেশ পেতেই জারির ﷺ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন। কুফর ও ইসলামের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। ওই যুদ্ধে আল্লাহ ﷻ মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। শত্রুরা চরমভাবে পরাস্ত হয়েছে। গনিমত হিসেবে অনেক মাল মুসলমানদের হাতে এল। তাদের সিপাহসালার ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। তার নিকট জারির ﷺ গনিমতের মালের এক-চতুর্থাংশ দাবি করলেন। তার দাবির বিবরণ লিখে সা'দ চিঠি পাঠালেন উমর রাযি.র নিকট।

জবাবে উমর ﷺ লিখে পাঠালেন–

৮২. জারির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবের বাজালি ﷺ ছিলেন বনু বাজিলা গোত্রের। নবীজি ﷺ-এর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি তাকে যিল খালাসার মূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্ব দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। তিনি তার গোত্রের দেড়শ' লোক নিয়ে মূর্তিটি জ্বালিয়ে দেন। ৫১ হিজরি বা ৫৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার সুদর্শন চেহারার কারণে হযরত উমর রাযি. তাকে 'এ-উম্মতের ইউসুফ' বলে আখ্যায়িত করেন। [উসদুল গাবা : ১/৫২৯]

'জারিরের দাবি ঠিক। আসলেই আমি তাকে যুদ্ধলব্ধ মালের এক-চতুর্থাংশ দেওয়ার ওয়াদা করেছি। সে এবং তার গোত্রের লোকজন যদি মজদুরির জন্য যুদ্ধ করে থাকে, তা হলে তার দাবি মুতাবিক তাদের মজদুরি দিয়ে দাও। আর যদি এই যুদ্ধ তারা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, তার দীনের জন্য এবং তার রাসুলের জন্য করে থাকে, তা হলে সে-ও মুসলমানদের একজন। সে তা-ই পাবে, যা অন্য মুসলমানরা পাবে। তার ওপরও সেই হুকুম বর্তাবে, যা অন্য মুসলমানদের ওপর বর্তায়।'

আমিরুল মুমেনিনের জবাব সা'দ رضي الله عنه-র নিকট পৌঁছলে জারির رضي الله عنه-কে তিনি তা অবহিত করলেন। জারির বললেন–

'আমিরুল মুমেনিন ঠিকই বলেছেন। আমার তা প্রয়োজন নেই। আমিও মুসলমানদের একজন।'[৮৩]

[৮৩] আখবারুল আযকিয়া, ইবনুল জাওযি : ৫৩

মজলুমের অন্তরের কান্না

খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর[৮৪] রোগ কঠিন আকার ধারণ করল। এ সময় কাজি আহমদ বিন আবি দুআদ[৮৫] তার সাক্ষাতে গেলেন। কাজি আহমদ তার নিকট বসলেন। দেখতে পেলেন, খলিফার

[৮৪] আবু ইসহাক মু'তাসিম বিল্লাহ বিন হারুন রশিদ [২১৮ হি.-২২৭ হি.] ছিলেন অষ্টম আব্বাসি খলিফা। মামুন রশিদের পরই তিনি সিংহাসনে আসীন হন। বাগদাদ থেকে নব্বই মাইল উত্তরে দজলার পাড়ে তিনি নতুন রাজধানী নির্মাণ করান। তার নাম দিয়েছিলেন 'সুররা মান রাআ'। তবে অধিক ব্যবহারের ফলে শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সামাররা'র রূপ নেয়। ২২৩ হিজরিতে রোমীরা যবতরা এবং মালতিয়ায় [আনাতোলিয়ায়] লুটতরাজ করে। এক মজলুম নারী 'হে মু'তাসিম' বলে দোহাই দিলে মু'তাসিম তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কায়সারে রোম নওফেলের জন্মস্থান 'আমুরিয়া' অবরোধ করেন। ৫৫ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা পরাজিত হয়, এবং তিনি সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : প্রথম খণ্ড]

[৮৫] কাজি আহমদ বিন আবু দুআদ জাহমি মু'তাযেলি ১৬০ হিজরিতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। বড়ই দানশীল ছিলেন তিনি। একজন ভাষা-পণ্ডিতও ছিলেন। খলকে-কুরআনের মাসয়ালায় ইমাম আহমদ رحمه الله-কে হত্যা করার জন্য তিনি খলিফাকে পরামর্শ দেন। ইমাম আহমদ رحمه الله-কে কোড়া দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি অটল ছিলেন। মু'তাসিম, ওয়াসেক এবং মুতাওয়াক্কেলের যুগে কাজি আহমদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ২৩৭ হিজরিতে খলিফা মুতাওয়াক্কেল তাকে অপসারিত করে কয়েদ করে রাখেন। তার ধনসম্পদ জায়গির ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেন। সে-সময় কাজি আহমদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। ২৪০ হিজরিতে বাগদাদে তার মৃত্যু হয়। [সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ১১/১৬৯-১৭১ ; তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি]

চোখের মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে। তিনি আর ক্ষণিকের মেহমান। এই সময় তার প্রচণ্ড যন্ত্রণার কথা বললেন।

আহমদ বললেন, আমিরুল মুমেনিন! কয়েদখানায় হাজারো নিরাপরাধ লোক বড়ই কষ্টে পড়ে আছে। তাদের পরিবারের লোকজন বদদোয়া দিচ্ছে। আর মজলুমের বদদোয়া বিফলে যায় না। কতই না ভাল হত, যদি আপনি তাদের মুক্ত করে দিতেন। তা হলে তাদের মুখে বদদোয়ার পরিবর্তে আপনার জন্য দোয়া আসবে।

তার কথায় খলিফা সকল কয়েদিকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

কাজি আহমদ বললেন, আমিরুল মুমেনিন! এরা খালিহাতে নিজ বাড়ি যাচ্ছে। সাথে মালপত্র কিছুই নেই। কতই না ভাল হত, যদি তাদেরকে তাদের মাল ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হত, এবং সাথে কিছু দানও করা হত!

কাজি আহমদের কথায় খলিফার মধ্যে বেশ প্রভাব পড়ল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েদিদের মাল তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। সাথে সাথে তাদেরকে কিছু দান করাও হুকুম দিলেন।[86]

খলিফা [illegible] নিরপরাধ
মানুষকে ছেড়ে দেন ও দান করেন

৮৬.বাকাতুল উরুদিন্নাযরা

খুনের বদলা খুন

হাসান বসরির সূত্রে আসেম আহওয়ান বর্ণনা করেন–

একব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ধরে নবীজির ﷺ দরবারে উপস্থিত করল। সে তার এক নিকটাত্মীয়কে হত্যা করেছিল। মুকাদ্দমা শোনার পর নবীজি ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন–

তুমি কি দিয়ত [রক্তপণ] নেবে?

সে ব্যক্তি বলল, দিয়ত নিয়ে আমি তাকে মাফ করতে পারব না। বরং আমি খুনের বদলা খুন চাই।

নবীজি ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি হত্যাকারীকে মাফ করতে পারো?

সে বলল, না।

নবীজি ﷺ বললেন–

'ওকে নিয়ে যাও, এবং হত্যা করে ফেল।'

ওই ব্যক্তি যখন হত্যাকারীকে নিয়ে গেল, তখন তিনি বললেন–

'এ যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে, তা হলে এ-ও তার মত হল।'

এ কথা শুনে একব্যক্তি গিয়ে তাকে কথাটা জানাল; বলল, রাসুল ﷺ বলেছেন, তুমি যদি তাকে হত্যা করো,তা হলে তুমিও তার মত হবে।

এ কথা শুনে ওই ব্যক্তি বদলা না নিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। এবং নিজ বাড়ি চলে গেল। অথচ একটি মজবুত রশি গলায় বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

ইবনে কুতাইবা বলেন :

রাসুল ﷺ যে বলেছেন, "এ যদি তাকে হত্যা করে, তা হলে এ-ও তার মত হবে"–এ কথার মর্ম এটা নয় যে, এ ব্যক্তি যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে, তা হলে এ-ও তার মত গোনাহগার হবে। আর তা কীভাবেই বা হতে পারে–তার জন্য বদলা নেওয়া তো বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বরং এর মর্ম হল, রাসুল ﷺ বদলা নেওয়াটা অপছন্দ করেছেন। তার ইচ্ছা ছিল, সে যেন হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়। তিনি ইশারা-ইঙ্গিতে এ কথা বলেছেন, যেন বদলা নেওয়া ব্যক্তির ধারণা হয় যে, আমি যদি তাকে হত্যা করি, তা হলে আমিও তার মত গোনাহগার হব। তাই মাফ করে দেওয়াই উত্তম।

রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, এই ব্যক্তি হত্যাকারীকে কতল করে, তা হলে এ-ও হত্যাকারীর মত হবে। কারণ, হত্যাকারীও আগে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আর এও এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে। এতে হত্যা করার ব্যাপারে দুজনই সমান হবে। তবে প্রথম হত্যাকারীর হত্যা ছিল অন্যায়ভাবে। আর এর হত্যা হবে ন্যায়সঙ্গত–যা কিসাস তথা বদলা হিসেবে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ এইরূপ ইঙ্গিতমূলক কথা বলতেন।

শাসকের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান

বর্তমানে আমরা যে শহরকে ইস্তাম্বুল নামে জানি, তার আগের নাম ছিল কস্তন্তুনিয়া। উসমানি খেলাফতের রাজধানী। সেখানকার ঘটনা এটা। কাজি শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হামযা আদালতে বিচারকের আসনে আসীন। মুকাদ্দমা পেশ করা হল। সাক্ষীদের তালিকা দেখলেন কাজি সাহেব। তালিকায় তৎকালীন শাসক বায়োজিদের[৮৭] নামও রয়েছে। সামনে তাকালেন। দেখতে পেলেন, কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

হঠাৎ কাজি সাহেব ফয়সালা শোনালেন, বায়োজিদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। কারণ, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ঘোষণার সাথে সাথেই থমকে গেল আদালত। পিনপতন নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল পুরো মজলিস। বর্তমান শাসক তিনি। তারই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সবাই।

সুলতান বায়োজিদ সামনে এগোলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বিচারককে :

---

[৮৭] সুলতান প্রথম বায়োজিদ [১৩৮৯ খৃ.- ১৪০২ খৃ.] ছিলেন উসমানি সুলতানতের চতুর্থ শাসক। তার যুগেই কুস্তুন্তুনিয়ার প্রথম অবরোধ [১৩৯১ খৃ. – ১৩৯৮ খৃ.] হয়। বায়োজিদ 'ইয়ালরুম' [বিদ্যুৎ] উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নেকুপুলসের যুদ্ধে [১৩৯৬ খৃ.] তিনি ইউরোপের যৌথবাহিনীকে পরাস্ত করেন। পরের বছর তুর্কিরা ইউনানের দিকে অগ্রসর হয়। ১৪০০ খৃ. আমির তৈমুর আনাতোলিয়ার ওপর আক্রমণ করে। আঙ্গুরার যুদ্ধে [২০ জুলাই,১৪০২ খৃ.] বায়োজিদ পরাজিত হন এবং তৈমুরের হাতে বন্দী হন। বন্দী থাকা অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [ইনসাইক্লোপেডিয়া তারিখে আলম : ১/৬১-৬২]

আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি–আমার সাক্ষ্য কেন গ্রহণযোগ্য মনে করা হচ্ছে না?

শাসকের মান ও ভয় উপেক্ষা করে তার চোখে চোখ রেখে বললেন–

সাক্ষী জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে না। তাই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

শাসকের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে ইসলামি আদালতের মর্যাদা আরও উজ্জ্বল করে তুললেন কাজি সাহেব। প্রমাণ করে দিলেন, বিচারকের আসনে বসে ছোটবড় কোনও পার্থক্য করা যায় না।

শাসক ফয়সালা শুনলেন। মাথা নত করে নিলেন। নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করলেন। নির্দেশ দিলেন, প্রাসাদের সামনে তাড়াতাড়ি একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক। মসজিদের প্রথম কাতারে নিজের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে নিলেন। এরপর থেকে জামাআতে সালাত পড়ার ব্যাপারে আর কখনও তিনি অবহেলা করেননি।

প্রথম অপরাধে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন না

প্রথম চুরি

আবু বকর[৪৪] ﵁-র নিকট এক চোর আনা হল। অপরাধ প্রমাণ হলে তিনি চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। আবু বকর রাযি. ছিলেন খুবই নরম মনের মানুষ। তার দিকে তাকিয়ে চোর বলল, হে রাসুলের খলিফা! আমার ওপর দয়া করুন। আমাকে মাফ করে দিন। এর আগে আমি কখনও চুরি করিনি।

আবু বকর ﵁ বললেন–

‘আল্লাহর কসম, তুমি মিথ্যা বলছ! আল্লাহ ﷻ বান্দার প্রথম পাপ ও অপরাধে তাকে কখনও শাস্তি দেন না।’

---

৪৪. আবু বকর ﵁ ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রের। সপ্তম পুরুষ মুররা বিন কা’বে গিয়ে তার বংশ-পরম্পরা নবীজি ﷺ-এর বংশ-পরম্পরার সাথে মিলিত হয়। তার মূল নাম ছিল ‘আব্দুল কা’বা’ নবীজি ﷺ তার নাম ‘আব্দুল্লাহ’ রাখেন। নবীজির মেরাজকে তাৎক্ষণিক ও সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়ার ফলে তাকে ‘সিদ্দিক’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। জান্নাতের সুসংবাদ-পাওয়া দশ ব্যক্তির পাঁচ জনই তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবীজি ﷺ -এর সাথে হিজরত করেন। তাকে ‘গুহা-সঙ্গী’ বলা হয়। নবীজির ﷺ ওফাতের পর বনি সায়েদা গোত্রের আঙ্গিনায় মুহাজির এবং আনসাররা তার খেলাফতের ওপর বায়আত করেন। তিনি আরবভূমি থেকে ধর্মত্যাগের ফিতনার মূলোৎপাটন করেন। তার যুগেই ইরানি এবং রোমীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয় সূচিত হয়। সোয়া দু’ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ২৩ জুমাদাল উখরা, ১৩ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [আটলাসে সিরাতে নববী : ৩৫৭-৩৫৮]

আনাস বিন মালেক ﵁-র বর্ণনা। উমর ﵁-র নিকট এক চোর আনা হল। সে বলল–

'আল্লাহর কসম! এর আগে কখনও আমি চুরি করিনি।'

উমর রাযি. বললেন–

'তুমি মিথ্যা বলছ–উমরের প্রভুর কসম! আল্লাহ ﷻ বান্দার প্রথম অপরাধে কখনও ধরেন না।'

ওই মজলিসে আলী ﵁-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ﷻ বড়ই ধৈর্যশীল ও সহনশীল। তিনি তার বান্দাদের প্রথম পাপে শাস্তি দেন না। কারণ, তিনি দয়ালু, অনুগ্রহশীল।

উমর ﵁ ফয়সালা শোনালেন। চোরের হাত কাটা হল।

হাত কাটার পর আলী ﵁ চোরের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–

'তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ পর্যন্ত তুমি কতবার চুরি করেছ?'

সে বলল, একুশ বার।

যুবরাজের নতুন জীবন

১লা মে, ২০০৪ ঈ. শনিবার দিন সৌদি রাজধানীতে একটি বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা ঘটে। এই দেশটিতে এখনও–আলহামদুলিল্লাহ– ইসলামি শাস্তির বিধান কার্যকর রয়েছে। আর এই কারণেই ইসলাম-বিরোধী শক্তি এবং হিংসুকদের হিংসা সত্ত্বেও এখনও সেখানে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০০২ ঈ.-এর কথা। যুবরাজ ফাহদ বিন নায়েফ বিন সউদ বিন আব্দুল আজিজ তার এক বন্ধু মুনযির বিন সুলাইমানকে দেখল, তার ভাই যুবরাজ সুলতান বিন নায়েফের সাথে মারামারি করছে। তখন যুবরাজ ফাহদের বয়স সতেরো; আর অন্য দুজনের বয়স পনেরো করে। ভায়ের সাথে মারামারি করতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি কিশোর বয়সী যুবরাজ ফাহদ বিন নায়েফ। ক্লাশিনকোভ উঠিয়ে মুনযিরকে গুলি করল। তিনটি গুলি লেগেছিল। সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। যুবরাজকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করা হল। অন্যসব কয়েদির মত তাকেও জেলে পাঠানো হল। মামলা চলল উনিশ মাসের মত। যুবরাজ তার দোষ স্বীকার করল। সৌদি আইন অনুযায়ী প্রতিটি হত্যামামলা তেরোজন বিচারক রিভিউ করেন। ১৪ জুলাই, ২০০৩ ঈ. তারিখে ফয়সালা শোনানো হল–নিহতের উত্তরসূরীরা যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা না করে, তা হলে তলোয়ার দিয়ে হত্যাকারীর শিরচ্ছেদ করা হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস নেওয়া বিধিবন্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। হ্যাঁ, তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজকরণ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।' [সূরা বাকারা : ১৭৮]

ইসলামপূর্ব যুগে কিসাসের নির্দিষ্ট কোনও বিধান ছিল না। তাই শক্তিধররা যেভাবে পারত, দুর্বলদের ওপর জুলুম করত। জুলুমের একটি ধরন ছিল, এক ব্যক্তির হত্যার বিনিময়ে অনেক সময় হত্যাকারীর পুরো গোত্রকে তছনছ করে দেওয়ার চেষ্টা হত। নারীর পরিবর্তে পুরুষকে, এবং দাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হত। অনেকে আবার ধন-সম্পদের শক্তিতে নিহতের দুর্বল উত্তরসূরীদের মুকাদ্দমা দমিয়ে রাখত। কিন্তু আল্লাহ ﷻ এসব বিভেদ ও পার্থক্য তুলে দিয়েছেন। কানুন করে দিয়েছেন–কিসাসে শুধু হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। হত্যাকারী আজাদ হলে, কিসাস হিসেবে ওই আজাদ ব্যক্তিকেই, গোলাম হলে ওই গোলামকেই এবং নারী হলে ওই নারীকেই হত্যা করা হবে। নারীর জায়গায় পুরুষকে, গোলামের জায়গায় আজাদকে বা একের জায়গায় অনেককে হত্যা করা যাবে না।

শরিয়তের বিধানের অনুযায়ী আমল করে ন্যায়পাল বিচারকগণ ফয়সালা শোনালেন, নিহতের উত্তরসূরীরা যদি হত্যাকারীর রক্তপণ নেয়, কিংবা আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য মাফ করে দেয়, তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হত্যাকারীর শিরচ্ছেদ করা হবে।

এই মুকাদ্দমায় রাজপরিবারের কেউ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি; আর বিচারকরাও ন্যায়ের পথ থেকে সরে আসেননি–যেমনটা বিশ্বের অনেক দেশে আমরা দেখতে পাই। বরং তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকেই কিসাসের হুকুম জারি করলেন। কারণ, ইসলামি বিচারকদের

ভালভাবেই জানা আছে, কিসাসের মধ্যেই আল্লাহ ﷻ প্রকৃত জীবন রেখেছেন। তা কার্যকর করার মধ্যেই রয়েছে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা। এর ফলেই মানুষ শান্তির শ্বাস নিতে পারেন। যথার্থই বলেছেন আল্লাহ ﷻ–

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

'হে জ্ঞানীগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন রয়েছে–যেন তোমরা [হত্যা ও লুটতরাজ থেকে] বেঁচে থাক।' [বাকারা : ১৭৮]

এই ঘটনায় রাজপরিবারের সদস্য, বাদশাহ ফাহদের ভাইয়ের পৌত্র জড়িত ছিল, তাই মুকাদ্দমাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রকাশ থাকে, যুবরাজের পিতামহ শাহ সউদ বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন সৌদি আরবের দ্বিতীয় শাসক। নিহত মুনযির বিন সুলাইমানও ছিল একটি উঁচু খান্দানের সদস্য। বনু তামিমের সাথে গিয়ে তার বংশ-পরম্পরা মিলিত হয়, যাদের প্রশংসা নবীজি ﷺ করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবও ওই গোত্রের ছিলেন। মামলা চলাকালে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিই চেষ্টা করেছিলেন, নিহতের উত্তরসূরীরা যেন রক্তপণ নিয়ে যুবরাজকে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু নিহতের পিতা সব ধরনের প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলেন। যদিও বিষয়টি ছিল সৌদি এক যুবরাজের; কিন্তু এর মধ্যে নিহতের পরিবারের ওপরও কোনওরূপ চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। আর কাজিদের ওপরও নয়। তাই আদালত স্বাধীনভাবে তাদের বিচারকার্য আদায় করে। ১লা ডিসেম্বর ২০০৩ ঈ. তারিখে সুপ্রিমকোর্টও আপিলকোর্টের রায় বহাল রাখে।

মুকাদ্দমা চলাকালে যুবরাজকে রিয়াদের সংশোধনকেন্দ্রে রাখা হয়। সেখান থেকে রিয়াদ সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। এই সময় তাকে বিশেষ কোনও সুবিধা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র একবার তার পিতা নায়েফ বিন সউদ তার সাথে দেখা করে। স্মর্তব্য, হত্যাকারী ছিল শাহ সউদের পৌত্র।

সুপ্রিমকোর্ট আদেশ লিখল, ১লা মে, ২০০৪ ঈ. সকালবেলায় হত্যাকারীর শিরচ্ছেদ করা হবে। ওই দিন ছিল শনিবার। রিয়াদের যুবরাজের জন্য জীবনের কঠিনতম দিন। সকাল সকালই লোকজন

কিসাসের ময়দানে উপস্থিত হল। যুবরাজও ছিল। বিভিন্ন বড় বড় গোত্রের প্রধানরাও ছিলেন। যুবরাজকে আগেই জানানো হয়েছে, শনিবার দিন তাকে হত্যা করা হবে।

সকাল আটটায় পুলিশের গাড়ি থেকে তাকে নামানো হল। পায়ে বেড়ি। দেহে কয়েদিদের পোশাক। ভোরবেলায়ই রিয়াদের গভর্নর সালমান[৮৯] বিন আব্দুল আজিজ তার অফিসে নিহতের পিতা এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। জানালেন, হত্যাকারী থেকে আজ বদলা নেওয়া হচ্ছে। আরও জানালেন, আপনাদের মুকাদ্দমায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আর রাজপরিবার থেকেও কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তবে আমি আপনাদের জানাতে চাইব, ক্ষমা করার কী ফযিলত রয়েছে ইসলামে। আপনারা যদি ক্ষমা করে দেন, তা হলে এটা আপনাদের একটি মহান কীর্তি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কিসাস নিতে চান, তা হলে সেটার পুরো অধিকার আপনাদের আছে। আমির সালমানের অফিস থেকে কিসাসের ময়দান খুব একটা দূরে নয়। এদিকে একদিন আগে যুবরাজের মা নিহতের ঘরের সামনে বাইরে বসে ছিলেন। মামলা চলাকালে নিহতের মায়ের সাথে তিনি ছ'বার যোগাযোগ করেছিলেন। রাজি করাতে চেয়েছিলেন–আল্লাহর ওয়াস্তে যেন তার ছেলেকে মাফ করে দেন। কিন্তু নিহত মুনযিরের মা হত্যাকারীকে মাফ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

শুক্রবার পুরো দিন নিহত মুনযিরের পিতামাতা বাড়ি ছিলেন না। পিতা সুলাইমান বিন আব্দুল আজিজ কাজির বয়স ষাট। বাদশাহ সউদ ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। জাপানি একটি পেট্রোল কোম্পানীতে চাকরি করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। তার চার ছেলে তিন মেয়ে। বড় ছেলের নাম তামিম। তাই তার উপনাম আবু তামিম। তিনি পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। সেগুলো সৌদি পত্রিকায় প্রচার হয়।

---

৮৯. এখন তিনি সৌদির বাদশাহ

এটা কোনও ফিল্ম বা ড্রামা নয়–বাস্তব সত্য। সকাল দশটার মত হয়ে গেছে। আপস বা মাফের সব আশা শেষ হয়ে গেছে, তখন যুবরাজকে ধীরে ধীরে হত্যার জায়গায় নেওয়া হল। সিকিউরিটি অফিসাররা তার বাহু ধরে রেখেছে।

সকাল দশটা বাজছে। নিহতের পিতা সুলাইমানকে আদালতের কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি হত্যাকারীকে চেনেন?

তিনি, তার চাচাত ভায়েরা এবং গোত্রের লোকজন সাক্ষ্য দিল, এ-ই হত্যাকারী যুবরাজ। এদিকে জল্লাদ খোঁপ হতে তলোয়ার বের করল। যুবরাজ চিৎকার করে উঠল : আবু তামিম! আল্লাহ ﷻ-র দিকে চেয়ে আমাকে মাফ করে দিন!

পত্রিকার প্রতিনিধিদের সুলাইমান জানালেন, আগের পুরো সময়টা আমি শুধু, এবং শুধুমাত্র কিসাসের ওপর জোর দিয়েছিলাম। আমার চাচাত ভাই আব্দুর রহমান আরেকবার আমাকে বলেছিল, পাঁচটা মিনিট চিন্তা করে দেখ। আমি ভাবতে থাকলাম। পাঁচ মিনিট পর পুলিশ চীফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী সিদ্ধান্ত নিলে? আমি বললাম, কিসাস নেওয়া হোক। তিনি জল্লাদকে ইশারা করলেন। এই সময় গোত্রের কয়েকজন আমাকে পরামর্শ দিল, আরেকবার ইস্তেখারা করে নাও; আল্লাহ ﷻ-র সাথে পরামর্শ করে নাও। এর আগে আমি দু'বার ইস্তেখারা করেছি। তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাকে বদলাই নিতে হবে। শেষমুহূর্তে আবার ইস্তেখারা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

হত্যার জায়গা থেকে কয়েক মিটার দূরে ক্বিবলার দিকে মুখ করলাম। নীচে মুসাল্লা ছিল না। প্রিয়জনদের একজন নিজের রুমালটা সেজদার জায়গায় বিছিয়ে দিলেন। আধা ঘণ্টা সালাত আদায় করতে থাকলাম–আল্লাহ ﷻ-র সাথে পরামর্শ করতে থাকলাম। [এদিকে লোকজন সুলাইমানের দিকে তাকিয়ে ছিল।] সালাত শেষ করে আমি আমার ছেলে তামিমকে বললাম, তোমার মায়ের সাথে মোবাইলে কথা বলাও। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কী মত? সে বলল, যে সিদ্ধান্তই তুমি নেবে, তাতে আমি একমত। এরপর আমি আমার ছেলে

তামিমকে এবং ভাই আব্দুর রহমানকে ডেকে বললাম, ইস্তেখারার সালাতের পর মাফ করার জন্য আমার মনটা সায় দিচ্ছে। তারা বলল, শেষ সিদ্ধান্ত তো তোমারই। তবে আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য মাফ করে দেওয়াই ভাল। হতে পারে, এর বদৌলতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ আমাদের মাফ করে দেবেন।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। যুবরাজ মাথা নত করে আছে। তলোয়ার উঠানোর জন্য জল্লাদ ইশারার অপেক্ষায় আছে। এ সময় সুলাইমান কাজি চিৎকার করে বললেন, যাও! আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। কেউ আমাকে বাধ্য করেনি; আর আমি অর্থের লোভীও নই। হ্যাঁ, তোমার উচিত কুরআন হিফজ করা এবং বাকি জীবনটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আনুগত্যে কাটিয়ে দেওয়া।

সুলাইমান কাজি মাফ করার ঘোষণা করার সাথে সাথে লোকদের মধ্যে খুশির ঢেউ খেলে গেল। আল্লাহু আকবার! ধ্বনিতে পুরো ময়দান কেঁপে উঠল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির কত বার যে মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছে!

প্রকৃত মাহাত্ম্য তো আল্লাহ ﷻ-রই। যার কানুন কার্যকরী করার জন্য কিসাসের রায় দেওয়া হয়েছে; আবার তারই সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমার ঘোষণা করা হয়েছে। যুবরাজ ফাহদ নতুন জীবন পেল। মানুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। সুলাইমান কাজি আগে বাড়লেন। যুবরাজকে গলায় লাগালেন। যুবরাজ ফাহদ সুলাইমান কাজির মাথায় চুমো খেল। নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জা প্রকাশ করল। বার বার তার শোকরিয়া আদায় করল–তিনি মাফ করে দেওয়ার ফলে সে নতুন জীবন পেল। ওয়াদা করল, বাকি জীবনটা সে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে কাটাবে। মানুষের সেবা করাই হবে তার কাজ।

মাফ না পেয়ে নিরাশ হয়ে যুবরাজের মা অস্থির ও অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একজন মা-র যে রকম হওয়ার কথা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। মাফি পাওয়ার সাথে সাথে যুবরাজ ফাহদ বেড়িপরা অবস্থায় সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের সাথে হাসপাতাল গেল। মাফ পাওয়ার পরও আইনি কিছু প্রক্রিয়া আদায়

করতে হয়। তাই বেড়িসহই যুবরাজকে হাসপাতালে মায়ের নিকট নেওয়া হল। তাকে দেখে মা বিস্ময় প্রকাশ করলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, কী ফয়সালা হল? তাকে যখন জানানো হল, নিহতের উত্তরসূরীরা তাকে মাফ করে দিয়েছে, তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বার বার আল্লাহ ﷻ-র এবং কাজি সুলাইমানের পরিবারের শোকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।

আইন অনুযায়ী যুবরাজকে আরেকবার আদালতে যেতে হল। নিহতের উত্তরসূরীদের শপথবাক্যপাঠপূর্বক আদালতে বয়ান দিতে হল যে, কোনওরূপ চাপে পড়ে তারা মাফ করেনি।

পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী সুলাইমান দিয়তের একটি বিরাট অংক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাজপরিবার তাকে সত্তুর মিলিয়ন রিয়াল দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। কোনও কোনও পত্রিকার মতে, বিশ মিলিয়ন। সত্তুর হোক বা বিশ, অংকটা বিরাট ছিল, সন্দেহ নেই। এই বিরাট অংকের অর্থ নিহতের পিতা এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, আমি আমার ছেলের রক্ত বেচতে পারি না।

যুবরাজ ফাহদের পিতা নায়েফ বিন সউদ পত্রিকার প্রতিনিধিদের জানান–যেদিন আদালতের হুকুম কার্যকর হওয়ার কথা, সেদিন সকালবেলায় আদালতের এক কর্মকর্তা ফোনে আমাকে জানালেন যে, আমি যেন আদালতে পৌঁছি। কারণ, আজ ফয়সালা কার্যকর হবে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঘরের সবাই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। যুবরাজের মা তো গভীর চিন্তায় বেহুঁশ হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। আমি রিয়াদের গভর্নর হাউসে পৌঁছলাম। তারা আমাকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে থাকলেন। একজন পিতা হিসেবে আমার মনের অবস্থা তখন কেমন ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধুমাত্র অলৌকিক কিছুই এখন আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারে। সুলাইমান কাজি ক্ষমা করে আত্মোৎসর্গের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এদিকে যুবরাজ ফাহদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিহত মুনযিরের ইসালে-সওয়াবের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে। যার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত সে পেতে থাকবে। অতীতকর্মের জন্য সে

আত্মগ্লানিতে ভুগছিল। লজ্জা প্রকাশ করছিল। বলছিল, ভবিষ্যতে সে একজন আদর্শ মুসলমানের জীবন যাপন করবে। মাফ করে দেওয়ার পর সুলাইমান কাজির সাথে রিয়াদের গভর্নর সালমান বিন আব্দুল আজিজ আবার সাক্ষাৎ করলেন। তার মানবীয় আবেগকে তিনি অভিবাদন জানালেন।

এ সময় যুবরাজদের সাথে অনেকেই এসে এই মহৎ কাজের ব্যাপারে নিজ নিজ মনোভাব ও মন্তব্য প্রকাশ করল। তা ছাড়া, সৌদি আরবে ইসলামি শাস্তির বিধান কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলল, আজকের ঘটনা প্রমাণ করে দিল, এই দেশে এখনও ইনসাফ সবার জন্য। যুবরাজ আব্দুর রহমান বিন সউদ বিন আব্দুল আজিজ বলল, রাষ্ট্রের ভিত্তি হল শরিয়তের নিয়মনীতির ওপর। আজ হক এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হল। হকদাররা তাদের হক পেয়ে গেল। নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ-র শোকরিয়ার পর সুলাইমান কাজি এবং তার পরিবারের লোকজনই এর বেশি হকদার, যারা শেষমুহূর্তে ক্ষমার ঘোষণা করে একজন যুবরাজের জান বাঁচিয়ে দিল। তারা বললেন, রিয়াদের গভর্নর আমির সালমান বিন আব্দুল আজিজও শোকরিয়ার হকদার। শরিয়তের কানুন তিনি সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর করেছেন। এতে কেউ বাধাও দেয়নি বা চাপও সৃষ্টি করেনি।

মোটকথা, আরও অনেক আমির ও সরদার এসে এই মহান কাজের কারণে নিহত মুনযিরের পিতা সুলাইমান কাজির শোকরিয়া আদায় করলেন। যারা ইসলামের সোনালি বিধানগুলোকে সেকেলে বলে, ঘটনাটি তাদের ওপর বজ্রপাতের মত কাজ করল। মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ ﷻ যে-সব বিধান নাযেল করেছেন, সেগুলো যে সার্বজনীন এবং সত্য, তা প্রমাণ করার দরকার নেই। ইসলামি ইতিহাসবিদ ছাড়াও দুনিয়ার সকল ন্যায়বাদী ইতিহাসবিদরা স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ ﷻ-র বিধান সবগুলোই মানবপ্রকৃতিবান্ধব। এগুলোর মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায় ও সাম্যতার নিশ্চয়তা।

“যেপর্যন্ত খলিফা ও প্রজাকে সমান দেখবে না সেপর্যন্ত সে বিচারক নয়”—

এই অন্যায়-অত্যাচারের কালো যুগে কেউ কি দেখেছে যে, এক যুবরাজের ওপর জল্লাদের তলোয়ার ঝুলছে, আর সে নিজ অপরাধের ফলে নিহতের পরিবারের নিকট নিজের জীবনের ভিক্ষা চাইছে? খুনখারাবির এই যুগে কি এমন দৃশ্য কেউ দেখেছে যে, রাজপরিবারের এক যুবক ন্যায় ও ইনসাফের মঞ্চের ওপর বসে অপেক্ষা করছে, তার শিরচ্ছেদ করা হবে? আর নির্বিকার হয়ে রাজপরিবারের সবাই নিষ্পলক তাকিয়ে আছে, কিন্তু সুপারিশের জন্য একপা'ও আগে বাড়ার সাহস পাচ্ছে না?

না! না! পৃথিবীর ইতিহাসের দূরদূরান্তে তালাশ করেও এমন দৃশ্য দেখা যাবে না। হ্যাঁ, যদি এমন দৃশ্য দেখা যায়, তবে ইসলামের সোনালি ইতিহাসেই দেখা যায়।

একদিকে শাসক ও খলিফা। লোকজন আলোচনা করে তাকে নিজেদের আমির নিয়োগ করে। খুশিমনে সবাই তাকে আমিরুল মুমেনিন বলে ডাকে। এই শাসকের প্রতিপক্ষ হলেন উবাই বিন কা'ব رضي الله عنه। মুকাদ্দমা আদালতে যায়। যায়দ বিন সাবেত কাজি হন। মুকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছে উবাই বিন কা'ব رضي الله عنه-র পক্ষ থেকে, খলিফাতুল মুসলেমিনের বিরুদ্ধে। বাদী-বিবাদী উভয়ই কাজির সামনে উপস্থিত। আমিরুল মুমেনিনের সম্মানের জন্য কাজি দাঁড়িয়ে যান। বাদীর নিকট দাবি করে, আমিরুল মুমেনিন কসম করলে তাকে দায়মুক্ত করে দাও। খলিফা তা শুনে ব্যথিত হন; বলেন–

'এটা হল প্রথম জুলুম।'

এরপর বাদীর পাশে বসে কাজিকে বলেন–

'যে পর্যন্ত তুমি উমর এবং একজন সাধারণ প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কাজির পদের উপযুক্ত নও।'

এমনটা হবে না-ই বা কেন? ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তি তো ইসলাম প্রথম দিন থেকেই রেখেছে। নিয়মনীতির একটি সরল দাগ টেনে সবাইকে সেটার বাধ্য করে দিয়েছে। ওই দাগ লঙ্ঘনকারী অপরাধী–চাই সে বাদশাহ হোক বা ফকির, ধনী হোক বা গরিব, পদস্থ কর্মকর্তা

হোক বা অজানা কেউ, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত। শরিয়তের সীমালঙ্ঘনকারী বড় বা ছোট, যে-ই হোক, সবাই সমান শাস্তিযোগ্য। ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ, হাজারো ঘটনা বাদ দিন, শুধু একটি ঘটনাই পড়ুন, আর বুঝতে চেষ্টা করুন—ন্যায় ও সাম্য ইসলামে কতটা মহান।

ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে বুখারি ও মুসলিমে। বর্ণনা করেছেন আয়েশা ﵂। মক্কাবিজয়ের সময়ের ঘটনা। বনু মখজুমের এক নারী চুরি করল। ধরা পড়ল। কুরাইশরা চিন্তিত হল, শরিয়তের আইন মুতাবিক এখন তো তার হাত কাটা হবে। আলোচনায় বসল তারা—কী করা যায়? রাসুল ﷺ-এর দরবারে এর জন্য কে সুপারিশ করবে? সবার চোখ গেল উসামা বিন যায়দ রাযি.র দিকে। অত্যাধিক ভালবাসেন নবীজি তাকে। তাই তো তাকে বলা হয় حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ 'রাসুলের প্রিয়পাত্র'। কুরাইশদের অনুরোধে তিনি গেলেন নবীজির দরবারে। সুপারিশ করলেন। নবুওয়্যতের আদালত থেকে গর্জন এল—

'আল্লাহ ﷻ-র নির্ধারিত একটি শাস্তির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করার সাহস দেখাচ্ছ!?'

এরপর লোকদের সমবেত করলেন। বললেন—

'লোকসকল! তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে, তারা শুধু এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যেকার সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করত, তখন তার ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর হত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত, তা হলে নিশ্চিতই আমি তার হাত কেটে দিতাম।'

এরপর ওই মখজুম গোত্রের মহিলাটির হাত কেটে দেয়া হল।

আল্লাহর কসম! ন্যায় ও সাম্যতার এই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মনীতি যদি বিশ্বের সকল দেশে কার্যকর হত, তা হলে পুরো দুনিয়ার প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যা আসত শান্তি ও নিরাপত্তার দোলনায় চড়ে। শান্তি ও নিরাপত্তার নামের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শক্তিধর শাসকরা যে দুর্বল

জনগণের ওপর তাদের রক্তপিপাসু পাঞ্জা গেড়ে যাচ্ছে, মানবাধিকার ও নারী-অধিকার নামে শয়তানি যে নৃত্য তার নাচছে, জুলুম-অত্যাচারের সে-দৃশ্য আর জনগণকে দেখতে হত না।

যুগের এই ফেরআউনদের কি এখনও বোধোদয় হয়নি যে, নিজেদের বানানো নিয়মনীতি ফেলে দিয়ে আল্লাহ ﷻ-র পাঠানো নিয়মনীতিগুলো কার্যকর করবে? যা তাদের অন্যায়ের তীরে রক্তাক্ত সমাজে শান্তির মলম হয়ে সমাজকে সুস্থ করে তুলবে? ন্যায় ও ইনসাফের শক্তির ভয়ে শক্তিশালীরা তাদের সীমা লঙ্ঘন করবে না? বরং দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য তারা উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত হবে?

রাগের সময় বিচার করা যাবে না

রাগের সময় বিচার করবেন না

নিশাপুর এবং আহওয়াযের কাজি ছিলেন মুসা বিন ইসহাক। খুবই স্পষ্টভাষী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাকে কখনও হাসতে দেখা যায়নি। একবার এক মহিলা তার নিকট এসে বলল–

'কাজি সাহেব! দু' ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করা আপনার জন্য জায়েয নয়।'

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

মহিলা বলল, কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

'কাজি যখন রাগে থাকে, তখন দু'জনের মধ্যে ফয়সালা করবে না।'[৯০]

এ কথা শুনে কাজি মুসা বিন ইসহাক মুচকি হেসে ফেললেন।[৯১]

তার মৃত্যু হয় আহওয়াযে।

---

[৯০] বুখারি : হাদিস ৭১৫৮ ; মুসলিম : হাদিস ১৭১৭ ; আবু দাউদ : ৩৫৮৯ ; তিরমিযি : ১৩৩৪ ; নাসাঈ : ৮/২৩৭

[৯১] দেখুন, কিতাবুল আযকিয়া : ২৪৫ ; সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ১৩/৫৮১

অপরাধীর প্রতিশোধে সহমর্মিতা দেখান আলী (রা.)

হত্যাকারীর প্রতি সহমর্মিতা

চল্লিশ হিজরির সতেরোই রমজান জুম'আর দিন আলী বিন আবু তালেব ﵁-কে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম মুরাদি নামক এক দুর্ভাগা ফজরের সালাতের সময় তলোয়ারের আঘাতে আহত করে। হত্যাকারীকে সাথে সাথেই ধরা হল। তিনি হাসান-হুসাইন ﵄-কে বললেন, এই ব্যক্তিকে তো বন্দী করলে। কিন্তু আমি মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে হত্যা করো না। আমি মারা যাওয়ার পর তাকে হত্যা করো। আর যদি বেঁচে যাই, তা হলে শুধুমাত্র আহত করার বদলা নেওয়া হবে। জানের বদলা জান। আমি যদি মারা যাই, তা হলে ওকে মেরে ফেলবে। আর যদি বেঁচে থাকি, তা হলে তার বিচার আমি করব। হে বনি আব্দুল মুত্তালেব! আমি মুসলমানদের খুন করতে চাই না। সাবধান! আমার হত্যাকারী ছাড়া আর কাউকে হত্যা কোরো না। হে হাসান! সাবধান! আমার হত্যাকারীকে খণ্ড-বিখণ্ড কোরো না!

বিষমাখা তলোয়ার দিয়ে আলী ﵁-কে আহত করেছিল তার শত্রু। তার পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়িছিল। বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শত্রুদের পক্ষ হতে মরণাঘাত আসার পরও তিনি প্রতিশোধমূলক ফয়সালা করেননি। বরং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের আঁচল আঁকড়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! সোনালি ফয়সালার এটাও ছিল একটি ঝলক, যা আপনি দেখলেন।

উম্মে সিনানের খোলামেলা আলোচনা

মুআবিয়া ﵁-র শাসনকাল। মদিনার শাসক মারওয়ান[৯২]। তার কঠোরতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সবার। কিন্তু মুআবিয়া ﵁-র নিকট অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার সাহস কারও ছিল না। একবার একটি বালককে মারওয়ান কোনও অপরাধে বা কোনও বাহানায় বন্দী করল। তার দাদি ছিলেন উম্মে সিনান বিনতে খাইসামা। তিনি মারওয়ানের নিকট গেলেন। তার পৌত্র যে নিরাপরাধ, তা, এবং নিজের দুর্বলতার কথা মারওয়ানকে জানালেন। কিন্তু মারওয়ান তার কোনও কথাই শুনল না।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি মুআবিয়া ﵁-র নিকট উপস্থিত হলেন। মুআবিয়া ﵁ জিজ্ঞাসা করলেন–

বিনতে খাইসামা! কী কারণে আমার নিকট আসার কষ্ট করা হল? তুমি কি সে নয়, যে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের দুশমনদের উত্তেজিত করত?

উম্মে সিনান বললেন–

---

[৯২] মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া ছিলেন উসমান ﵁-র চাচাত ভাই। তার পিতা হাকাম ছিল আবু সুফয়ান বিন হারবের চাচাত ভাই। দ্বিতীয় হিজরিতে মারওয়ানের জন্ম হয়। মরজে-রাহেতের যুদ্ধে [৬৪ হিজরি] খলিফা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ﵁-র সিপাহসালার জাহ্‌হাক বিন কায়সকে পরাজিত করে দামেশকে উমাইয়্যা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার বিধবা স্ত্রী উম্মে খালেদকে বিবাহ করেন। ৬৫ হিজরির রমজান মাসে উম্মে খালেদের ইঙ্গিতে দাসীরা মারওয়ানকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি ; এটলাসে সিরতে নববী]

'হে আমিরুল মুমেনিন! আব্দে মানাফের সন্তানরা পবিত্র চরিত্র এবং অনন্য গুণে ভূষিত হয়েছে। তারা জেনে না-জানার ভাণ করে না; সহনশীলতার পর বোকামি করে না; ক্ষমা করার পর বদলা নেয় না। আর অন্যদের তুলনায় আপনিই আপনার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষার অধিক হকদার।'

মুআবিয়া ﵁ : নিশ্চয়ই আমরা তদ্রূপ। কিন্তু তুমি কি সে নও, যে তার কবিতায় আলী মুরতাজার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছে, এবং তার প্রতিপক্ষকে উপহাস করেছে?

এরপর তিনি তার কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালেন।

উম্মে সিনান : কবিতাগুলো আমারই। কিন্তু আমি আশা করছি, আলী রাযি.র পর আমাদের জন্য আপনি শ্রেষ্ঠ খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

মুআবিয়া ﵁-র পাশেই বসা ছিল এক দরবারি। সে আরও কিছু কবিতা পাঠ করে শোনাল, যেগুলোয় আরও কড়া শব্দ ছিল। মুআবিয়া রাযি.র মন মলিন হয়ে গেল। তা দেখে উম্মে সিনান বললেন–

'আমিরুল মুমেননি! আপনার এ ধরনের সাথিরাই মুসলমানদেরকে আপনার থেকে নারাজ করে রেখেছে। এরা যেসব কথা বলে, সেগুলোকে তাদের স্বার্থমূলক ও খোশামদ মনে করে উপেক্ষা করুন। তাদেরকে আপনার কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। এ ধরনের সাথিদের থেকে যদি আপনি বেঁচে থাকতে পারেন, তা হলে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ছাড়াও মুমিনদের অন্তরেও আপনার জায়গা হবে।'

মুআবিয়া ﵁ : আসলেই কি তুমি এসব কবিতা বলেছিলে?

উম্মে সিনান বললেন– 'আল্লাহর কসম! বেঁচে থাকতে আলী আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নেই। এখন আপনি আমাদের জন্য অন্য লোকদের তুলনায় বেশি প্রিয়।'

উম্মে সিনান আরও বললেন – আমি অন্যদের মত নই, যারা মুখে প্রশংসা করে, আর পশ্চাতে নিন্দা করে। আমার মনে যেটা জায়গা করে নিয়েছে, আমি সেটাই বলেছি।

মুআবিয়া ؓ : 'অন্যদের' দ্বারা তুমি কাদের বোঝাচ্ছ?

উম্মে সিনান : মারওয়ান বিন হাকাম এবং সাঈদ ইবনুল আ'স, যারা আপনাকে এবং আপনার হুকুমতকে বদনাম করছে।

মুআবিয়া ؓ : আমাকে ভালবাসার ও ভক্তি করার কারণ কী?

উম্মে সিনান : আপনার ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং আপনার ক্ষমা ও মার্জনা।

মুআবিয়া ؓ : এখানে আসা হল কী কারণে?

উম্মে সিনান : মদিনার শাসক মারওয়ানের অভিযোগ নিয়ে এসেছি। সে ইনসাফ সহকারে শাসনও করে না, এবং শরিয়ত অনুযায়ী ফয়সালাও করে না। মুসলমানদের ভুলত্রুটির পিছনে পড়ে থাকে। তাদের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। তার ওপর সবাই বিরক্ত। সে আমার নাতিকে জেলে ফেলে রেখেছে। আমি তার নিকট গেলাম; কিন্তু সে আমার কোনও কথাই শুনল না। উল্টো রেগে গিয়ে আমাকে ভালমন্দ শোনাল।

আমিও সবচেয়ে তিক্ত জবাবের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছি।

এখন আমি বাধ্য হয়ে আপনার নিকট এসেছি, যেখানে মারওয়ান থেকে বেশি ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায়।

উম্মে সিনানের কথা শুনে মুআবিয়া ؓ কেরানিকে নির্দেশ দিলেন, উম্মে সিনানের নাতিকে মুক্ত করার নির্দেশ লিখে যেন তাকে দেওয়া হয়।

উম্মে সিনান বললেন : আমিরুল মুমেনিন! আমার পাথেয়ও শেষ হয়ে গেছে; আমার সওয়ারিও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি কীভাবে বাড়ি যাব?

মুআবিয়া ؓ তাকে সওয়ারির জন্য একটি উট এবং পাথেয় হিসেবে পাঁচ হাজার দেরহাম দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[৯৩]

---

[৯৩] ঘটনাটি ইতিহাসের বিভিন্ন বইতে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার বর্ণনার বেশিরভাগই নেওয়া হয়েছে ইবনে আসাকির রচিত তারিখে দামেশক আলকাবির ৭৪/১৮২ থেকে।

চৌকিদারের দায়িত্ববোধ

আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ-র পর তার ভাই আবু জাফর মনসুর খলিফা হবেন। তিনি যখন জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করছিলেন, তখনকার ঘটনা। একবার তিনি এক মনযিলে অবস্থান করলেন। এখানে যারাই থাকে, তাদের থেকে দু' দেরহাম করে নেওয়া হয়। চৌকিদার বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি টেক্স আদায় না করবেন, এখানে থাকতে পারবেন না।

মনসুর বললেন, আমি হলাম বনি হাশেম গোত্রের। আবুল আব্বাসের ভাই। টেক্স মাফ করে দাও।

চৌকিদার বলল, শাসকের নির্দেশে আমি অপরাগ।

মনসুর বললেন, আমি রাসুল ﷺ-এর চাচাত ভাইদের একজন।

চৌকিদার বলল, যেটা আইন, সেটার বাইরে আমি কীভাবে যেতে পারি?

মনসুর বললেন, আমি কুরআন জানি। আমি আলেম, ফকিহ এবং ফরায়েযের বিষয়ে পারদর্শী। দু' দেরহাম কী! এমন সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা বলব, যা হাজার হাজার দেরহাম থেকে বেশি মূল্যের।

চৌকিদার বলল, সবই ঠিক আছে। কিন্তু সুলতানতের আইনে আমি কারও সাথে ব্যতিক্রম আচরণ করতে পারি না। তাই এ ব্যাপারে আমাকে অপারগ মনে করুন।

একজন সামান্য চৌকিদার তার দায়িত্ব পালনে এমন ব্যক্তিরও পরওয়া করেনি, যিনি বনু হাশেম গোত্রের; আলেম ও ফকিহ। এবং কিছুদিন পরই তিনি খলিফা হতে যাচ্ছেন। আজও কি চাকরিজীবি বা অন্যরা এমন ন্যায় ও সাম্যতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করেন?[৯৪]

---

[৯৪] দেখুন, না-কাবেলে ফরামুশ ওয়াকেআত, মুহাম্মদ দীন ফাওক-রচিত : ১৩৯

খলিফা মনসুরের সত্যপ্রিয় পরামর্শক

মুবারক বিন ফুযালা ছিলেন খলিফা মনসুরের পরামর্শকদের একজন। একদিন তিনি খলিফা মনসুরের নিকট বসা ছিলেন। এ সময়ে খলিফা মনসুর একব্যক্তিকে তার অপরাধের কারণে মৃত্যুর শাস্তির নির্দেশ দিলেন। মুবারক বললেন–

আমিরুল মুমেনিন! আমি ইমাম হাসান রাযি. হতে শুনেছি, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে–আল্লাহর ওপর কারও কোনও বদলা পাওয়ার থাকলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। তখন শুধু তারাই দাঁড়াবে, যারা কাউকে হত্যা হতে মুক্তি দিয়েছে। আর এর অপরাধও এমন কঠিন নয়। ক্ষমা ও মার্জনার ফল সব সময় ভাল হয়।

মনসুর নির্দেশ দিলেন, একে মুক্ত করে দেওয়া হোক।

তদ্রূপ আরেক ব্যক্তিকে সাজা দেওয়ার জন্য খলিফার সামনে উপস্থিত করা হল। সে বলল, আমিরুল মুমেনিন! বদলা নেওয়া থেকে মাফ করে দেওয়া উত্তম। আমরা আপনার জন্য দোয়া করি–আল্লাহ ﷻ যেন আপনাকে পদস্খলন বা কষ্টের সম্মুখীন না করেন এবং আপনাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন।

মনসুর তার অপরাধ মাফ করে দিলেন।[৯৫]

৯৫. তারিখুল খুলাফা : ১৪৪

ইলম প্রচারের স্বার্থে কাজির পদ গ্রহণে অস্বীকার

যুফার বিন হুযাইল বিন কায়স বিন সালম আলখায়রি আলবসরি নামক এক ফকিহ ছিলেন স্পেনে। হিশাম বিন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসনামলে, ১১০ হিজরিতে তার জন্ম। যে দশ ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা رحمه الله-র ফিকহ সংকলনে সহায়তা করেছিলেন, তিনি তাদের একজন।

ইমাম যুফার رحمه الله-কে তার কালের শাসকের পক্ষ থেকে কাজির পদ গ্রহণ করার জন্য বলা হল। তিনি এ বলে অস্বীকার করেন যে, ওখানে তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে; পাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর এখানে তো দীনি মাসয়ালা পড়া আর পড়ানো। এখানে শুধুই সওয়াব। তাই কাজির পদ হতে আহকামে শরিয়তের ইলমের প্রচার করাকে আমি উত্তম মনে করি।

শাসক এতে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। শাসকের পক্ষ থেকে কোনও না কোনও বাহানায় দু'বার তার বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। আরও অনেকভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। তারপরও তিনি সে-পদ গ্রহণ করেননি।[৯৬]

৯৬. হাদায়েকুল হানাফিয়া : ২/১০৯

এক বিধবার নির্ভয় ফরিয়াদ

আব্বাসি খেলাফত। বাগদাদের সিংহাসনে আছেন মামুনুর রশিদ[৯৭]। যার ন্যায়বিচার ও দানশীলতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ন্যায়ের প্রতীক নওশেরওয়াঁ এবং দানের প্রতীক হাতেম তাইয়ের কথা। মামুনুর রশিদের বড় পুত্র শাহযাদা আব্বাস শিকার খেলছে। তায়েফাতুন্নমলের কাছে। অস্তয়মান সূর্য অস্তরাগের লালিমা ছড়িয়ে দিচ্ছে দজলা নদীর ওপর। তাই বুঝি সুকণ্ঠ পাখিরা শোকগাঁথা গাইছে করুণ সুরে। এ সময়ে আব্বাসের চোখে পড়ল এক নারী। অনিন্দ্য সুন্দরী। কলসে করে পানি তুলছে নদী থেকে।

৯৭.আবুল আব্বাস মামুনুর রশিদের আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ। পিতা হারুনুররশিদই মামুন উপাধি দিয়েছেন। ১৭০ হিজরিতে যে রাত মামুনের জন্ম হয়, সে-রাতেই খলিফা হাদি বিন মাহদি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার ভাই হারুন তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। ১৯৩ হিজরিতে হারুনের মৃত্যু হলে আমিনুররশিদ তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। ১৯৮ হিজরিতে আমিনুররশিদকে হত্যা করা হয় এবং মামুনুররশিদের খেলাফতের ওপর বায়আত হয়। অথচ তিনি তখন মারভ ছিলেন। সেখানেই ২০০ হিজরিতে ইমাম আলী রেজাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু ২১৫ সালে তার মৃত্যুর ফলে খেলাফত আব্বাস-পরিবারের মধ্যেই থেকে যায়। খলিফা মামুনের নির্দেশে মুহাম্মদ বিন মুসা 'আলজাবর' এবং 'আলমুকাবালা' নামক দুটি বই লেখেন, যা ছিল এলজাবরার [বীজগণিতের] ভিত্তি। মামুন সানজারের [ইরাকের] ময়দান ও কূফার মরুভূমির পরিধির পরিমাপ করান, যা ছিল প্রায় ২৪ হাজার মাইল। মামুনের খেলাফতকালেই খলকে কুরআনের ফিতনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ২১৮ হিজরিতে মামুনুর রশিদের মৃত্যু ঘটে। [তারিখুল ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : প্রথম খণ্ড]

জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি! কোন গোত্রের? এমন নির্জন জায়গায়, যেখানে পাহাড় এবং জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই, সেখানেও কি এমন সুন্দরের সৃষ্টি হয়?

কথা শেষ করে দেখল নারীর দিকে। আত্মমর্যাদায় ঘা খেয়েছে সে। ক্রোধ ফুটে উঠল তার মুখে। তাচ্ছিল্যভরে তার প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করে সামনে এগোল সে।

পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের নেশা শাহযাদার মাথায়। নির্দেশ দিল, এই দাম্ভিক নারীর জাতগোত্র জেনে নাও। আর আমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দাও।

নারীর পিছনে পিছনে রওয়ানা হল শাহযাদার লোক। শিকার মুলতবি করে শাহযাদা তাঁবুতে ফিরে এল। নীরবে বসে রইল। মধ্যরাত পর্যন্ত অস্থিরতায় কাটাল–একবার তাঁবুর বাইরে, আবার ভেতরে। এ সময় এক চাকর এল। জানাল :

নারীটি বারামেকা গোত্রের। নাম মুগিরা বিনতে আজার। দু'সন্তানের জননী। হুসাইন বিন মুসার বিধবা স্ত্রী। আপনজন কেউ বেঁচে নেই। আছে শুধু এই দু' সন্তান। বিয়ের প্রস্তাবে তার ওপর যেন কেয়ামত নেমে এসেছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি সে। বলেছে–

হারুন আমাদের জানগুলো শেষ করে দিয়েছে। এখন মামুন আমাদের ইজ্জতের পিছনে পড়ে আছে। কিন্তু আব্বাস যেন এ কথা মনে রাখে, এই ভাঙ্গাচুরা ঝুঁপড়ির সামনে এলে দু'হাত দিয়েই তার যুবরাজগিরি পিষে ফেলব!

দুনিয়ার চেহারা থেকে রাতের পর্দা সরে গেল। বারামেকা গোত্রের ধ্বংসের আক্ষেপ নিয়ে সুবহে সাদেক উদয় হল। তায়েফাতুন্নামলের একটি ছোট কুটিরে ফজরের সালাত আদায় করে ছোট শিশুকে বুকে লাগিয়ে আদর করল মুগিরা বিনতে আজার। আদর করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় পয়গাম এল শাহযাদা আব্বাসের। দূত বলে গেল–

শাহযাদার ক্রোধ তোমার জানমাল মাটিতে মিশিয়ে দেবে। এই বাড়িটি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। দু' ঘণ্টার অবকাশ দেওয়া হল তোমাকে। বাড়ি খালি করে দাও।

এ কথা শুনে মুগিরা এগিয়ে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আব্বাস যেন সে কথা ভুলে যায়, যখন আমার দাদা জাফরের মাথা তার দাদা হারুনের সামনে রাখা হয়েছিল, এবং এই নিরাপরাধকে হত্যা করে বারামেকা পরিবারকে দু' দুটি দানার জন্য মুখাপেক্ষী করে দিয়েছিল। কিন্তু বারামেকার স্ত্রীরা আব্বাসিদের জুলুম-অত্যাচার যেভাবে সহ্য করে এসেছে, ইতিহাস তা ভুলতে পারবে না।

এতটুকু বলে মাথার ওপর একটি সাদা চাদর দিয়ে সন্তান-দুজনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এল মুগিরা।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ। মামুনুর রশিদের দরবার। পিতার পাশেই বসে আছে যুবরাজ আব্বাস। আমির-উজির সবাই নীরব। এই সময় সেখানে উপস্থিত হল মজলুমা মুগিরা। যে চেহারা দেখে চাঁদও লজ্জিত হত, সেখানে আজ দুর্বলতার চিহ্ন। রাজদরবারে হাজির হয়ে বলল–

এক বিধবার বাড়ি, শুধু এ কারণে যে, সে তার ইজ্জত রক্ষা করতে চায়, সুলতানতে আব্বাসিয়ার জন্য মুবারক হোক। কিন্তু মামুনুর রশিদ! একদিন সেই বাদশাহকেও মুখ দেখাতে হবে, যার সুলতানত কখনও শেষ হবে না। এক জালেমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি। ইনসাফ করো!

দরবারে উপস্থিত সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু খলিফার উপস্থিতিতে তার সাথে কথা বলার সাহস কারও নেই।

মামুনুর রশিদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন , সেই জালেমের নাম বলো! কে সে?

তিরস্কারের হাসি দেখা দিল মুগিরার মুখে; বলল, শাহযাদা আব্বাস, যে রাজসিংহাসনে আপনারই পাশে বসে আছে।

মুসলমানদের অবস্থা আজ করুণ। কিন্তু এই দুর্বল জাতি এককালে এতটা শক্তিশালী ছিল যে, এতটুকু শুনতেই ক্রোধে লাল হয়ে গেল মামুনের চেহারা। চোবেদারকে নির্দেশ দিলেন–আব্বাসকে ওই নারীর পাশে দাঁড় করাও। যেন বাদী-বিবাদীর মধ্যে কোনও ফরক না থাকে।

শাহযাদা আব্বাস নীরব ছিল। প্রশ্নের জবাবে এক-আধটু বলে চুপ হয়ে যেত। আর মুগিরা তার ইতিকথা বলে গেল নির্ভীকভাবে। তার চেহারা থেকে টপকে পড়ছিল যেন নিষ্পাপতার খুন। সে আরও বলল–

আব্বাস! তুমি মামুনের পুত্র এবং সুলতানতের মালিক। কিন্তু আমার এ দু'হাত সে-সময়ের অপেক্ষায় ছিল, যদি তুমি তোমার ভাবনা নিয়ে আগে বেড়ে আমার নিকট আসতে, আমি তোমার ঘাড় মটকে দিতাম। আব্বাসিরা বারামেকা গোত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের ইজ্জত এমন দৌলত, যার ওপর আমরা আব্বাসি সুলতানত কুরবান করে দেব।

মুগিরার এমন সাহসী কথা শুনে উজিররা সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, এই ভয়শূন্য কথা শাহী আদবের পরিপন্থী। আদব রক্ষা করে কথা বলো!

মামুন বললেন, ওকে বাধা দিয়ো না। যা তার মুখে আসে, তা বলার অধিকার তার আছে। তার সততাই তাকে এতটা নির্ভয়ে কথা বলার সাহস জুগিয়েছে। আর আব্বাসের দুর্বলতাই আব্বাসকে বোবা বানিয়েছে।

তখনই পাঁচ থলে আশরাফি মুগিরার পায়ের কাছে রেখে দিলেন মামুনুর রশিদ। তার কুঠির তাকে শুধু ফিরিয়েই দেননি; 'কসরে আব্বাস' নামক একটি শাহী মহলও তাকে দান করে দরখাস্ত করলেন, সে যেন শাহযাদা আব্বাসের অপরাধ মার্জনা করে দেয়।[৯৮]

---

৯৮. ঘটনাটি জনাব মুহাম্মদ দীন ফাওক রচিত 'না-কাবেলে ফরামুশ ওয়াকেআত' [১৬৫-১৬৭] থেকে গৃহীত, এবং সামান্য পরিবর্তনসহ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উজিরের দূরদর্শিতা

আব্বাসি খলিফা মামুনের খেলাফতকাল। তার চাচা ইবরাহিম তার বিরুদ্ধে খেলাফতের দাবি করে বসলেন। তাকে বন্দী করার জন্য মামুন এক লক্ষ দেরহাম পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ইবরাহিম আত্মগোপন করলেন। অবশেষে গ্রেফতার হলেন। এটা হিজরি ২১০ সালের কথা। মামুনের সামনে উপস্থিত করা হল। তাকে ভালমন্দ বলার পর তিনি পরামর্শকদের দিকে তাকালেন। বললেন, এর ব্যাপারে আপনাদের মত কী?

সবাই একযোগে বলে উঠল : কতল।

কিন্তু তার উজির আহমদ বিন আবু খালেদ সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তার জন্য সুপারিশ করলেন। বললেন, বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে হত্যার হুকুম–ইতিহসে এর বহু নজির পাওয়া যাবে। কিন্তু আমিরুল মুমেনিন! যদি আপনি ক্ষমা করে দেন, তা হলে তা ইতিহাসে আপনার উদারতা ও মার্জনার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মাথা নত করে মামুন একটি কবিতা পড়লেন, যার মর্ম ছিল :

আমার ভাই আমিনকে আমার জাতিই হত্যা করেছে। যদি তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করি, তা হলে উল্টো তা আমারই ওপর এসে পড়বে।

এ কবিতাটি পড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। এর পর মাফিনামা জারি করলেন, এবং এই ফয়সালার জন্য আল্লাহ ﷻ-র শোকরিয়া আদায় করলেন।

শরিয়তের হক ও শিষ্টাচারের হক

আব্বাসি তৃতীয় খলিফা মাহদি। কূফার জন্য একজন কাজির খোঁজ করলেন। যিনি আলেমে-দীন হবেন, ফকিহ হবেন, মুত্তাকি ও পরহেজগার হবেন, এবং বিচারকার্যে কারও পরওয়া করবেন না। যেন ন্যায় ও ইনসাফের দাবি ভালভাবে পূরণ করতে পারেন। লোকজন তাকে শরিক বিন আব্দুল্লাহর[৯৯] কথা বলল–এমন ব্যক্তি তিনিই। খলিফা তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি চাই, আপনি কূফার প্রধান কাজির পদটি অলংকৃত করেন।

শরিক বিন আব্দুল্লাহ বললেন, কাজি হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আর আমি এই পদ গ্রহণও করব না।

মাহদি প্রশ্ন করলেন, এর কারণ কী?

শরিক বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, ইনসাফের দাবি পুরো করতে পারব না। হতে পারে, ফয়সালা করতে গিয়ে আমি ভুল করে বসব। কারণ, আমি মানুষ বই কিছু নই। ফলে আল্লাহ ﷻ আমার ওপর নারাজ হয়ে যাবেন। আমাকে জাহান্নামের পথিক হতে হবে। আর দ্বিতীয় কারণ

[৯৯].কাজি শরিক বিন আব্দুল্লাহ বিন সিনান নখ'য়ি ৯৫ হিজরিতে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে তারা কূফায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ফকিহ ছিলেন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইয়াহইয়া বিন মুঈন তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য করতেন। তিনি কূফা এবং আহওয়াযের কাজির দায়িত্ব পালন করেন। ১৭৭ বা ১৭৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ৮/২০০-২১১]

হল, আমি যখন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করব, তখন সেগুলো মানানো যাবে না।

মাহদি বললেন, দেখুন! উভয়পক্ষের কথা শোনার পর আপনি আপনার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সত্যের পক্ষে ফয়সালা করবেন। তারপরও যদি ভুল হয়ে যায়, তা হলেও হাদিস হিসেবে আপনি একটি সওয়াব পাবেন। আর যদি সঠিক ফয়সালা হয়, তা হলে দুটি সওয়াব পাবেন। আল্লাহ তো তখন ধরবেন, যখন আপনি জেনেশুনে অন্যায় ফয়সালা করবেন।

আর হুকুম কার্যকর করার ব্যাপারে আমি ওয়াদা করছি, আপনার সকল ফয়সালা কার্যকর করা হবে। এমনকি আমার বিরুদ্ধে হলেও।

এরপর খলিফা খুবই আগ্রহ নিয়ে বললেন–

আপনারা যারা আলেমে-দীন এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তারা যদি এই পদ কবুল না করেন, তা হলে এর জন্য লোক আসবে কোত্থেকে? এই পদের জন্য কি জালেম ও জাহেল ও গোমরাহদের মনোনীত করব? আপনি যদি আমার কথা না মানেন, তা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ-র দরবারে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে–ময়দানে হক থেকে আপনি পালিয়েছিলেন কেন?

এই নিশ্চয়তা দেওয়ার পর কাজি শরিক কূফার কাজির পদ গ্রহণ করতে রাজি হলেন। সে-সময়ে কূফার গভর্নর ছিলেন খলিফার চাচা মুসা বিন ঈসা।

শরিক তার দায়িত্ব বুঝে নিলেন। সকালে মজলিসে বসতেন। মুকাদ্দমা পেশ হত। উভয়পক্ষ আসত। সাক্ষীর কথা শোনা হত। হক ও ইনসাফ অনুযায়ী ফয়সালা করা হত। কোনও রকম চাপ, ঘুষ বা সুপারিশের কল্পনাও ছিল না। আর কাজি শরিক থেকে এ ধরনের কিছু আশা করাও সম্ভব ছিল না।

কূফায় ফোরাত নদীর কিনারায় একটি সুন্দর বাগান ছিল। এর মালিক ছিল কূফার একজন সাধারণ ব্যক্তি। বাগানের পাশেই ছিল কূফার গভর্নর মুসার বাড়ি। মুসার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোনওভাবে যদি বাগানটা

কেনা যায়, তা হলে বাড়িটা আরও খোলামেলা করা যাবে। তাই বাগানের মালিককে প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি যেন বাগানটি বিক্রয় করেন। কিন্তু বাগানের মালিক তা বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

কিছুদিন পর সে মারা গেল। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে ছিল কয়েকজন ছেলে এবং এক মেয়ে। মুসা আবার প্রস্তাব পাঠালেন, বাগানটি তিনি কিনতে চান। এর জন্য বিরাট অংকের অর্থও প্রস্তাব করলেন। ছেলেরা তাদের অংশ বেচতে রাজি হল। কিন্তু মেয়েটি অস্বীকৃতি জানাল। তাকে অনেক বোঝানো হল, চাপ সৃষ্টি করা হল। সে বলল, যে জমিন আমার বাবা বেচতে রাজি হননি, সেটা বেচতে আমিও প্রস্তুত নই। আমার ভায়েরা তাদের অংশ বিক্রয় করেছে, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমার অংশ আমি কোনও অবস্থায়ই বেচব না।

তার অংশের চারপাশে সে দেওয়ার টেনে দিল। গভর্নর মুসা বিন ঈসার বাসনা ছিল, যে-কোনওভাবেই হোক, ওই অংশটিও তার মহলের আওতায় এসে যাক। তাই সে তাকে বিরাট অংকের টাকার প্রস্তাব করল। কিন্তু মেয়েটা তা-ও প্রত্যাখ্যান করল। যখন সকল চেষ্টা শেষ হয়ে গেল, আর ইতিপূর্বে মেয়েটির ওপর চাপও সৃষ্টি হয়েছিল, তখন গভর্নর চাকরদের নির্দেশ দিলেন, তার দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেলে জমিনটা যেন তার প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। তা-ই করা হল। এদিকে মেয়েটি কূফার গভর্নর মুসা বিন ঈসার বিরুদ্ধে কাজি শরিকের আদালতে মামলা দায়ের করল।

গর্ভনরের বিরুদ্ধে সমন জারি করলেন কাজি শরিক। আদালতে ডেকে পাঠালেন তাকে। আদালতে উপস্থিত হয়ে যেন তার অবস্থানের ব্যাখ্যা করে। গভর্নর আদালতে গেলেন না। গভর্নর হয়ে আদালতে গিয়ে একজন সাধারণ মেয়ের সাথে আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়াবেন–এটাকে নিজের জন্য মানহানিকর মনে করলেন। তিনি পুলিশ চীফকে ডেকে তাগাদা দিয়ে বললেন, গিয়ে কাজিকে বোঝাও; আর বলো, কোনও সাক্ষী ছাড়া একজন মেয়ের কথা সে কীভাবে মেনে নিল?

পুলিশ চীফ আদালতে উপস্থিত হল এবং গর্ভনরের অবস্থানের ব্যাখ্যা করল। কাজি বললেন, তোমাকে নয়, আমি গভর্নরকে ডেকেছি। সে নিজে তার ব্যাখ্যা করতে হবে। একজন পুলিশ পাঠিয়ে সে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। বাস্তবতা হল, আদালতকে তোমাদের পরামর্শ দেওয়া আদালতের কাজে হস্তক্ষেপের শামিল। আদালত অবমাননা বলে গণ্য। যেহেতু তুমি আদালতের কাজে হস্তক্ষেপ করেছ, তাই তোমাকে জেলে যেতে হবে। এ কথা বলে তিনি আদালতের পুলিশদের নির্দেশ দিলেন তাকে বন্দী করার জন্য। তারা পুলিশ চীফকে জেলখানায় নিয়ে গেল।

পুলিশ চীফের কী পরিণতি হয়েছে, তা জানতে পেরে গভর্নর আরও খেপে গেলেন–এত বড় স্পর্ধা কাজির, আমার পুলিশ অফিসারকে জেলে পাঠায়! শহরের গণ্যমান্যদের ডেকে পাঠালেন, তারা গিয়ে কাজিকে বোঝাবেন যে, গভর্নর সাধারণ কোনও ব্যক্তি নন যে, তার সাথে অন্যসব লোকের মত ব্যবহার করা যাবে। বরং তার সাথে বিশেষ রকম ব্যবহার দেখাতে হবে। তাদের একটি দল কাজির নিকট গেল। কাজিকে গর্ভনরের পয়গাম জানাল এবং তার অসন্তোষের কথাও বলল।

কাজি শরিক জবাব দিলেন, আদালতের দৃষ্টিতে কোনও তফাৎ নেই–সবাই সমান। তোমরাও আদালতের কাজে হস্তক্ষেপ করে আদালতের অবমাননা করেছ। তাই তোমাদেরও জেলে পাঠানো হচ্ছে।

আদালতের পুলিশ তাদের বন্দী করে জেলখানায় নিয়ে গেল।

গভর্নর যখন তা জানতে পারলেন, তখন তার কপালে চিন্তারেখা ফুটে উঠল–আমাদের বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে এরূপ আচরণ করার সাহস একজন কাজি পায় কোথায়? তিনি তার পুলিশ ফোর্স নিয়ে সোজা জেলখানায় চলে গেলেন, এবং পুলিশ চীফ-সহ সবাইকে মুক্ত করে দিলেন।

এদিকে জেলার সোজা কাজি শরিকের নিকট গেল এবং সবকিছু জানাল।

কাজির শরিক বললেন, এই পদটি আমি চাইওনি; আর কাজি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও আমার ছিল না। খলিফা আমাকে জোর করেছেন। আমি এই শর্তে এই পদ গ্রহণ করেছি যে, আমার সব ফয়সালা কার্যকর করা হবে। কাজি তার কিতাবাদি ও জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন। সওয়ারির ওপর আরোহণ করে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলেন।

এদিকে গভর্নর জানতে পারলেন, কাজি শরিক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। চিন্তিত হলেন তিনি। ভালভাবেই জানা আছে তার, খলিফা যদি সবকিছু জানতে পারেন, তা হলে আমার গভর্নরগিরি শেষ। কুফার বাইরে গিয়ে তিনি কাজি শরিককে ধরলেন। তাকে রাজি করানোর জন্য সব রকম চেষ্টা করলেন। ওয়াদা করলেন, কাজি সাহেব যা বলবেন, তা-ই হবে।

কাজি সাহেব বললেন, এক শর্তে ফিরে যাব।

গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন, সেই শর্তটি কী?

কাজি বললেন, যত লোককে তুমি জেল থেকে বের করেছ, সবাইকে আবার জেলে পাঠাতে হবে। আর তোমাকে আদালতে ওই মহিলার পাশে দাঁড়াতে হবে।

গভর্নর সবগুলো শর্ত মেনে নিলেন। যাদের যাদের মুক্ত করেছিলেন, গভর্নর তাদের সবাইকে আবার জেলে পাঠালেন। নিজে গিয়ে আদালতে পেশ হলেন।

বয়ান শোনার পর কাজি ফয়সালা শোনালেন, যে দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, সেটাকে আগের মত করে বানিয়ে দেবে। তার জমিন তাকে ফেরত দেবে। আর জমিন বিক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

গভর্নর ফয়সালা মেনে নিলেন। কাজি সাহেব তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পাঠালেন, আদালত অবমাননার কারণে যাদের যাদের বন্দী করা হয়েছে, তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। সকল কয়েদিকে মুক্ত

করে দেওয়া হল। মহিলাকে তার জমিন ফিরিয়ে দেওয়া হল। হক ও ইনসাফ আবার প্রতিষ্ঠিত হল।

পরের দিন কাজি শরিক গর্ভনরের দরবারে উপস্থিত হলেন। গভর্নর তাকে স্বাগত জানালেন। পাশে বসালেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কাজি শরিক বললেন–

'আমি এসেছি এজন্য যে, আমার উপযোগী কোনও কাজ বা সেবা থাকলে তার নির্দেশ দিন। আমি তা পালন করব।'

তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন গভর্নর। যেন বলছেন–কাল আমার সাথে কী আচরণ করেছ। আর আজ কী বলছ? কাজি শরিক বললেন–

যা আমি গতকাল করেছি, তা ছিল শরিয়তের হক। সেটা কার্যকরী করা আমার দায়িত্ব ছিল। আর আপনি হলেন শহরের হাকেম; শাসক। আপনার ইজ্জত ও সম্মান করাও আমার দায়িত্ব। এটা হল শিষ্টাচারের হক।

কুরআনের সূরার বিনিময়ে বিয়ে

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন সাহল বিন সা'দ সায়েদি[১০০] رضي الله عنه। নবীজির ﷺ দরবারে এসে এক মহিলা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার নিকট আমি এসেছি, যেন নিজেকে আপনার জন্য দান করতে পারি। আপনি আমাকে বিয়ে করে নিন। নবীজি ﷺ তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নীচু করে নিলেন। জবাব দিলেন না। ওই মহিলা যখন দেখতে পেল, তার কথা নবীজির ﷺ মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, তখন সে চুপ হয়ে গেল। সেখানেই বসে পড়ল, এবং নবীজির ﷺ জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করল–

'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী না হন, তা হলে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন।'

রাসুল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন–

'তোমার নিকট [মোহর হিসেবে দেওয়ার মত] কিছু আছে কি?'

সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! আমার নিকট কিছুই নেই।

রাসুল ﷺ বললেন–

---

[১০০] খযরজ বংশের বনু সায়েদা গোত্রের ছিলেন হযরত সহল বিন সা'দ رضي الله عنه। তার নাম ছিল 'হুজন'। নবীজি ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন সহল। তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। ৯৭ হিজরিতে ৮৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মদিনার শেষ সাহাবিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। [উসদুল গাবা :২/৫৭৫-৫৭৬]

‘পরিবারের লোকজনের নিকট যাও! দেখ, কিছু পাও কি না।’

ওই ব্যক্তি বাড়ি গেল। এরপর ফিরে এসে বলল

‘না, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই পাইনি।’

রাসুল ﷺ তাকে আবার পাঠিয়ে বললেন,

‘দেখ! অন্তত একটি লোহার আংটি হলেও পাও কি না।’

সে ব্যক্তি আবার বাড়ি গেল। ফিরে এসে বলল

‘আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসুল! লোহার কোনও আংটিও পাওয়া যায়নি। তবে এটা আমার লুঙ্গি। এর অর্ধেকটা একে [এই মহিলাকে মোহর হিসেবে] দিচ্ছি।’

রাসুল ﷺ ইরশাদ করলেন–

‘সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে করবে কী? তুমি যদি পরে নাও, তা হলে তার জন্য কিছুই থাকবে না। আর যদি সে পরে নেয়, তা হলে তোমার জন্য থাকবে না।’

রাসুল ﷺ-এর কথা শুনে সে ব্যক্তি নীরব হয়ে বসে পড়ল। একটি লম্বা সময় পেরিয়ে গেলে মনোকষ্ট নিয়ে সে উঠে রওয়ানা হল। তাকে ফিরে যেতে দেখে রাসুল ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন–

‘কুরআনের কতটুকু তোমার স্মরণ আছে।’

সে বলল, আমার এই এই সূরাগুলো স্মরণ আছে।-এ কথা বলে সে কয়েকটি সূরার নাম বলল।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন–

‘সেগুলো কি মুখস্থ পড়তে পারো?’

সে বলল, জী-হ্যাঁ।

রাসুল ﷺ বললেন–

‘যাও! কুরআনের যেটুকু তোমার মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে এই মহিলার সাথে তোমাকে বিয়ে দিলাম।’ [বাড়ি গিয়ে তাকে শিখিয়ে দেবে।][১০১]

[১০১].বুখারি : হাদিস ৫০৮৭ ; মুসলিম : ১৪২৫ ; মুয়াত্তা : ২/৩ ; নাসাঈ : ৬/১১৩ ; আবু দাউদ : ২/২৩৬

লাভজনক বিক্রি

আনাস বিন মালেক[১০২] رضي الله عنه-র বর্ণনা। আবু তালহা[১০৩] رضي الله عنه-র অনেকগুলো বাগান ছিল। এর ফলে তিনি মদিনার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মসজিদে নববীর একেবারে সামনে 'বায়রুহা' নামক বাগানটি ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। মাঝেমধ্যে নবীজি ﷺ ওই বাগানে যেতেন। সেটার মিঠাপানি পান করতেন।

আনাস رضي الله عنه বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল–

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾

'যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে, ততক্ষণ তোমরা মোটেই কল্যাণ পাবে না।' [সূরা আলে ইমরান : ৯২]

---

১০২. আনাস বিন মালেক বিন নযর رضي الله عنه ছিলেন খযরজের শাখাগোত্র বনু নাজ্জারের। আনাস رضي الله عنه ছিলেন রাসুর ﷺ-এর খাদেম। হিজরতের সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি বহু হাদিস রেওয়ায়াত করেন। নবীজি ﷺ তার সন্তানাদি ও ধনসম্পদের জন্য দোয়া করেছিলেন। ফলে তার ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা ছিল ৮০। ৯১ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। বসরায় মৃত্যুবরণ করা সাহাবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবি। [উসদুল গাবা : ১/ ২৯৪-২৯৭]

১০৩. আবু তালহা رضي الله عنه-র নাম ছিল যায়দ বিন সহল। তিনি ছিলেন আনসারি গোত্র বনু নাজ্জারের। হিজরতের পর হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ رضي الله عنه-র সাথে নবীজি ﷺ তার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। উহুদের যুদ্ধে নবীজি ﷺ -কে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি ৩৫-টি আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হন। তার স্ত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবি হযরত উম্মে সুলাইম رضي الله عنها। ইনি ছিলেন আনাস বিন মালেক رضي الله عنه-র মাতা। ৩১ বা ৩৪ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ৬/১৭৮]

তখন আবু তালহা رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾

'যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে, ততক্ষণ তোমরা মোটেই কল্যাণ পাবে না।' [সূরা আলে ইমরান : ৯২]

আর আমার সবচেয়ে প্রিয় বাগান হল বায়রুহার বাগান। এই বাগানটি আমি আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় দান করছি। আশা করি, আমি পরকালে এর সওয়াব ও কল্যাণ পাব। তাই আল্লাহ ﷻ-র হুকুম মুতাবিক আপনি যেখানে উপযোগী মনে করেন, ব্যয় করুন।

আবু তালহা رضي الله عنه-র এই বিশাল দানের কথা শুনে নবীজি ﷺ বলে উঠলেন–

'বাহ্‌! খুবই উত্তম! বেশ লাভজনক ব্যবসা! বেশ লাভজনক ব্যবসা! তুমি যা বললে, আমি শুনেছি। আমার মত হল, এই বাগানটি তোমার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও।'

তালহা رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রস্তাব অনুযায়ীই আমি কাজ করব। [অর্থাৎ আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে দেব।] বাগানটি তিনি নিজের আত্মীয়স্বজন এবং চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।[১০৪]

---

১০৪. বুখারি শরিফ : হাদিস ১৪৬১ ; মুসলিম শরিফ : ৯৯৮

সদকার মধ্যে হাদিয়া

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, বারিরা رضي الله عنها [আয়েশা رضي الله عنها-র আজাদকৃত দাসী]র ঘটনা থেকে তিনটি সুন্নাত শেখা গেছে।

একটি হল : সে যখন আজাদ হল, তখন তাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। [সে যদি চায়, তার স্বামী মুগিসের সাথেই থাকতে পারে। আবার চাইলে, আলাদাও হতে পারে। অর্থাৎ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে।]

দ্বিতীয়টি হল : রাসুল ﷺ [বারিরার ব্যাপারে] বলেছেন–

'ওলা-র মালিক সে, যে আজাদ করে।'

অর্থাৎ আজাদকৃত দাস-দাসী মারা যাওয়ার পর তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হবে, যে তাকে আজাদ করে। আরবের লোকরা এ ধরনের সহায়-সম্পদ বেচে খেত। কিন্তু রাসুল ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। এবং 'ওলা'র [আজাদকৃত দাস-দাসীর পরিত্যাজ্য সম্পত্তির] উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন আজাদকারীকে।

তৃতীয়টি হল : যে মাল সদকা হিসেবে কেউ পেয়েছে, সে মাল তার জন্য এমন কাউকে হাদিয়া হিসেবে দেওয়া জায়েয আছে, যার জন্য সদকা খাওয়া জায়েয নয়।

একবার রাসুল ﷺ ঘরে গেলেন। সেখানে পাতিলে কিছু গোস্ত রাঁধা হচ্ছিল। রাসুল ﷺ-এর সামনে রুটি এবং ঘরের তরকারি আনা হল। তা দেখে রাসুল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন–

'[চুলোর ওপর] হাঁড়িতে গোস্ত রাঁধা হতে দেখলাম না!?'

জবাব এল, আপনি ঠিকই বলছেন, হে আল্লাহর রাসুল! কিন্তু সে-গোস্ত তো সদকা হিসেবে বারিরা পেয়েছে। আর সদকা আপনার জন্য হালাল নয়। [তাই আপনাকে তা দেওয়া হয়নি।]

এ কথা শুনে নবীজি ﷺ ইরশাদ করলেন–

'সেটার তার জন্য সদকা। কিন্তু আমাদের জন্য তো হাদিয়া।'[১০৫]

এর দ্বারা বোঝা গেল, সদকা হিসেবে পাওয়া মাল যদি সম্পদশালীকে, কিংবা এমন কাউকে হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়, যার জন্য সদকা খাওয়া জায়েয নয়, তা হলে তা জায়েয।

---

[১০৫]. আল-মুআত্তা, কিতাবুন্নিকাহ : ২/২১ ; বুখারি : হাদিস ৫০৯৭ ; মুসলিম : হাদিস ১০৭৫ ; নাসাঈ : ৬/১৬৪

বায়ু নির্গত হইলে যেভাবে সাহাবায়ে
কেরাম ব্যক্তিকে লজ্জা থেকে বাঁচাতেন সাহাবীরা

মুসলমান ভাইকে লজ্জা থেকে বাঁচানো

মুজাহিদ رحمه الله বর্ণনা করেন—একবার সাহাবায়ে কিরামের সাথে রাসুল ﷺ বসা ছিলেন। হঠাৎ বায়ুর দুর্গন্ধ এল। তিনি বললেন—

'যার বায়ু বেরিয়েছে, সে গিয়ে অজু করে আসুক।'

কিন্তু লজ্জায় সে ব্যক্তি ওঠেনি।

রাসুল ﷺ আবারও বললেন, যে ব্যক্তির বায়ু বেরিয়েছে, সে গিয়ে অজু করে আসুক। কারণ, হক বিষয়ে আল্লাহ ﷻ লজ্জা বোধ করেন না।

ওই সাহাবিকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য আব্বাস রাযি. প্রস্তাব দিলেন—

'হে আল্লাহর রাসুল! আমরা সবাই গিয়ে যদি অজু করে আসি তা হলে কেমন হয়?'

এই প্রস্তাবটি পছন্দ করা হল এবং তা-ই করা হল।

ইমাম শা'বি رحمه الله বলেন, এক ঘরে উমর رضي الله عنه বসা ছিলেন। সাথে জারির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه-ও ছিলেন। আরও কয়েকজনও বসা ছিলেন। এ সময় উমর رضي الله عنه দূষিত বায়ুর গন্ধ অনুভব করলেন। বললেন, আমরা সবাই গিয়ে অজু করে আসি না কেন! যার বায়ু নির্গত হয়েছে, শুধু তাকেই কষ্ট দেব কেন?

জারির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বললেন, হে আমিরুল মুমেনিন! এক ব্যক্তির কারণে কি এত লোক অজু করবে?

উমর رضي الله عنه বললেন—

'আল্লাহ তোমাকে রহম করুন! জাহেলিয়্যাতের যুগেও তুমি সরদার ছিলে। আর ইসলামের মধ্যেও একজন উত্তম সরদার।'

অর্থাৎ যদি শুধুই বায়ু-নির্গত হওয়া ব্যক্তিকে অজুর জন্য বাধ্য করা হয়, তা হলে সে লজ্জিত হত। তার মনে ব্যথা পেত। তাই সবাই অজু করে নেবে। তা হলে সে-ব্যক্তিও লজ্জা থেকে বেঁচে যাবে, আর সবাই অজুর সওয়াবও পাবে।[১০৬]

---

[১০৬] ঘটনাদুটি আল্লামা ইবনুল জাওযি বর্ণনা করেছেন তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আখবারুল আযকিয়া'য় [পৃ. ৫৬]।

অপরাধী ধরার অভিনব পদ্ধতি

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আসবাগ বিন নাবাতা। তিনি বলেন, আলী رضي الله عنه-র দরবারে এক যুবক এসে কয়েক ব্যক্তি সম্বন্ধে অভিযোগ করল যে, এরা আমার পিতার সাথে ব্যবসায়িক সফরে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসার পর তাদের সাথে আমার পিতা ছিলেন না। এ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, তোমার পিতা পথেই মারা গেছে। আমরা তাকে দাফন করে দিয়েছি। এরপর আমার পিতার মালপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, মারা যাওয়ার সময় তোমার পিতার কোনও মাল ছিল না। অথচ আমার বেশ ভালভাবেই জানা আছে, আমার পিতা যখন তাদের সাথে রওয়ানা হন, তখন তার নিকট অনেক মাল ছিল। আমিরুল মুমেনিন! এই মুকাদ্দমাটি আমি কাজি শুরাইহ-র নিকটও পেশ করেছিলাম। তিনি তাদের থেকে কসম নিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন। সেই ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমার পিতার হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা যায়।

মুকাদ্দমাটি নিয়ে আলী رضي الله عنه অনেক চিন্তাফিকির করলেন। পুলিশদের এবং অন্য ব্যবসায়ীদের ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। সিপাহিদের একদিকে ডেকে নিয়ে বললেন, এদের নিয়ে যাও। কিন্তু একসাথ হতে দেবে না। আলাদা আলাদা খোঁজ নিতে হবে। কারও সাথে কারও কথা বলার অনুমতি নেই।

এরপর আলী রাযি. তার রেজিস্টারকে ডাকলেন। আর অপরাধীদের থেকে একজনকে ডাকলেন। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বলো! যে যুবক মুকাদ্দমা দায়ের করেছে, তার পিতা তোমাদের সাথে কোনদিন বের হয়েছে? কোন কোন জায়গায় তোমরা অবস্থান করেছ?

তোমাদের সফর কেমন ছিল? যুবকের পিতার কী রোগ হয়েছিল? তার মারা যাওয়ার কারণ কী ছিল? তার মাল কোথায়? মারা যাওয়ার পর তাকে গোসল দিয়েছে কে? দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হয়েছে কীভাবে? তার জানাযার সালাত কে পড়িয়েছে? কোন জায়গায় তাকে দাফন করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব প্রশ্ন, এবং ওই আসামীর জবাবগুলো একটি ডায়েরিতে লিখে রাখল ওই রেজিস্টার। এরপর আলী রাযি. সজোরে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন। তার সাথে সাথে উপস্থিত ব্যক্তিরাও বলে উঠল। এদিকে অন্য অপরাধীরা যখন তাকবির শুনল, তাদের ধারণা হল, তাদের সাথি সম্ভবত সব বলে দিয়েছে। এরপর প্রথম ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে দ্বিতীয় আসামী ডাকলেন। তাকেও প্রথম আসামীকে করা প্রশ্নগুলো করলেন। এভাবে তৃতীয়জনকেও ডেকে প্রশ্ন করলেন।

তিনজনের বয়ান মিলিয়ে দেখা গেল, তাতে অমিল রয়েছে। ফলে তাদের অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। আলী رضي الله عنه তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা বুঝে ফেলেন। এরপর তিনি প্রথম অপরাধীকে ডেকে বললেন–

'আরে আল্লাহর দুশমন! তোমার আর তোমার সাথিদের বয়ান শোনার পর তোমার ধোঁকা এবং মিথ্যা আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন সত্য ছাড়া অন্য কিছু তোমাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।'

এ কথা বলে তাকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আবার 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দিয়ে উঠলেন। উপস্থিতরাও তার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠল। বাকি দু' সাথি যখন এটা দেখল, তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল–তাদের সাথি তাদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেছে নিয়েছে। এরপর আলী رضي الله عنه দ্বিতীয় আসামীকে ডাকলেন। তাকেও ধমকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথি সত্য সত্য বলে গেছে। এখন তুমি যদি সত্য না বল, তা হলে তোমার পরিণতি সম্বন্ধে ভেবে নাও।

আলী ﷺ-র কথা শুনেই সে বলে উঠল–

'হে আমিরুল মুমেনিন! আল্লাহর কসম! তাদের কাজটা আমি অপছন্দ করেছিলাম। [কিন্তু তারা আমার কথা শোনেনি। এবং ওই যুবকের পিতাকে মেরে ফেলেছে।]

এভাবে একে একে তিন অপরাধীই নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করে নিল। আলী ﷺ তাদের ওপর মালের জরিমানা ধার্য করে দিলেন, এবং তাদের থেকে নিহতের কিসাস নিলেন।[১০৭]

[১০৭].দেখুন, 'আত্ তুরুকুল হিকামিয়্যা ফিস্সিয়াসাতিশ্শরইয়্যা', ইবনে কাইয়্যেম রচিত : ৬৫

আলী ﷺ-র দূরদর্শিতা

একটি বিস্ময়কর বিরল ধরনের মুকাদ্দমা উমর ﷺ-র আদালতে পেশ হল। এক আনসারি যুবক এসে বলল, জনাব! আমি অমুক মহিলার সন্তান। কিন্তু তিনি আমাকে তার সন্তান হিসেবে মানতেই চাচ্ছেন না।

জিজ্ঞাসা করা হল, এর কোনও প্রমাণ কি তোমার নিকট আছে?

যুবক বলল, এর কী প্রমাণ আমি দিতে পারি!

ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ব্যাপারটা কী?

সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলল যে, আমার তো বিয়েই হয়নি।

এদিকে কয়েকজন এসে উমর ﷺ-র আদালতে সাক্ষ্য দিল যে, এই নারীর কখনও কারও সাথে বিয়েই হয়নি। তা হলে এ সন্তান তার হল কী করে? মিথ্যা বলে এই ছেলেটি খামোখা প্রমাণ করতে চাইছে যে, সে এই মহিলার সন্তান। এটা নির্জলা মিথ্যা অপবাদ।

এ সব শোনার পর আমিরুল মুমেনিন নির্দেশ দিলেন, এই যুবকের ওপর শরিয়তের 'হদ' কার্যকরী করা হোক। এ সময় আলী ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। মুকাদ্দমা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তাকে সব জানানো হল। এই মুকাদ্দমা সম্পর্কিত সবাইকে ডেকে তাদেরকে নিয়ে আলী ﷺ মসজিদে নববীতে বসলেন। এরপর মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যুবক কি তোমার ছেলে নয়?

মহিলা বলল, এই যুবক আমার ছেলে নয়।

আলী ﷺ যুবককে বললেন, যুবক! তুমিও ঠিক সেভাবে তাকে মা বলতে অস্বীকার করো, যেভাবে সে তোমাকে ছেলে মানতে অস্বীকার করেছে।

যুবক বলল, হে আল্লাহর রাসুলের চাচাত ভাই! আমি যখন জানি, ইনি আমার মা, তখন আমি এ কথা কীভাবে বলি!?

আলী ﷺ বললেন, এই মহিলাকে মা বলতে তুমি অস্বীকার করো। আর আজ থেকে আমি তোমার পিতা, এবং আমার পুত্র হাসান-হুসাইন তোমার ভাই হবে।

যুবক বলল, হ্যাঁ; এই মহিলাকে আমি মা মানতে অস্বীকার করছি।

এরপর আলী ﷺ মহিলার অভিভাবকদের বললেন–

'এই মহিলা সম্বন্ধে আমার কথা কি মেনে নেওয়া হবে?'

অভিভাবকরা বলল, হ্যাঁ! হ্যাঁ! কেন নয়? বরং আমাদের ব্যাপারেও আপনি যে নির্দেশ দেবেন, আমরা তা মেনে নেব।

তাদের কথা শুনে আলী ﷺ বললেন, হে কুম্বর! [তার এক গোলামের নাম।] এই উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে তুমি সাক্ষ্য থেকো, আমি এই অপরিচিতা মহিলার বিয়ে এই যুবকের সাথে করে দিলাম। তুমি গিয়ে দেরহামের থলে নিয়ে এসো।

দেরহামের থলে এনে কুম্বর আলী ﷺ-র সামনে রাখলেন। চারশ' আশি দেরহাম ছিল সেখানে। ওই মহিলাকে মোহরানা হিসেবে দেরহামগুলো দিয়ে যুবককে বললেন–

'তোমার স্ত্রীর হাত ধরো। এরপর যখন আমাদের নিকট আসবে, তখন যেন তোমার মধ্যে বাসর রাতের চিহ্ন দেখা যায়।'

এ কথা বলে আলী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। মহিলাটি বলে উঠল, আল্লাহ! আল্লাহ! আবুল হাসান! এই যুবক তো আমার জন্য জাহান্নামের টুকরা হয়ে যাবে। এ তো, আল্লাহর কসম! আমার ছেলে! এখন আমি মেনে নিচ্ছি। আপনার সামনে স্বীকার করছি যে, এ আমার ছেলে।

আলী ﷺ বললেন, কী করে এ তোমার ছেলে হতে পারে? এইমাত্রই তো তুমি তাকে ছেলে মানতে অস্বীকার করেছ? আবার সাক্ষীও এনেছ?

মহিলা বলল, আসলে এর পিতা ছিল একজন হাবশি। আমার ভায়েরা তার সাথে আমাকে বিয়ে দেয়। তার থেকে এ ছেলে আমার গর্ভে আসে। কিছুদিন পর তার পিতা আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় শহিদ হয়। এরপর যখন আমার সন্তানের জন্ম হয়, তখন তাকে আমি অমুক গোত্রে পাঠিয়ে দিই। সেখানেই সে প্রতিপালিত হয়। এরপর আমি তাকে সন্তান মানতে অস্বীকার করি।

পুরো কাহিনী শুনে আলী ﷺ বললেন, আমি হলাম আবুল হাসান। [হাসানের পিতা।] কীভাবে আমি অন্যের পিতা হতে পারি?

এরপর আলী ﷺ ওই যুবককে ওই মহিলার সাথে পাঠিয়ে দিলেন। আর তার থেকেই তার বংশ সাব্যস্ত করে দিলেন।[১০৮]

---

১০৮. দেখুন, 'আত্ তুরুকুল হিকামিয়্যা ফিস্সিয়াসাতিশ্শরইয়্যা, ইবনে কাইয়্যেম রচিত : ৬২

যে পা মেলে সে হাত মেলে না

প্রায় এক শতাব্দী আগের ঘটনা। শায়খ সাঈদ হলবি দামেশকের এক মসজিদে বসে পড়াচ্ছেন। ঘটনাক্রমে ওই দিন তার পায়ে কোনও কষ্ট ছিল। তাই পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন। আর নিয়ম হল, উস্তাদ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসেন, আর শাগরেদেরা উস্তাদের সামনে বসে। তাই উস্তাদের মুখ ছিল দরজার দিকে; পিঠ কিবলার দিকে। আর পা-গুলো ছিল দরজার দিকে ছড়ানো।

সে-কালে মিসরের খদিবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী পাশার পুত্র ইবরাহিম পাশা পুরো দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে রেখেছিল। সন্ত্রাসী এবং জল্লাদ হিসেবে এক ডাকে তাকে সবাই জানত। সে ছিল শামের গভর্নর। তার নির্মমতার কাহিনী সবার মুখে মুখে চর্চা হত। তার মনে জাগল, আমি সাঈদ হলবির ক্লাসে গিয়ে বসি, এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করি। দরজার দিক থেকে এল সে। সবার ধারণা ছিল, শত কষ্ট হলেও, এমন পরিস্থিতে তার পা গুটিয়ে নেবেন। সামান্য সময় গুটিয়ে রাখলে তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু তিনি সামান্যতমও নড়েননি। পড়াও বন্ধ করেননি, এবং পা-ও গুটাননি। সেভাবেই পা ছড়িয়ে রাখলেন। পায়ের দিক থেকে এসে ইবরাহিম দাঁড়িয়ে রইল।

তার শাগরেদেরা বলেন, আমরা ভয়ে কাঁপছিলাম–না জানি কী হয়! আমাদের চোখের সামনেই আমাদের শায়খ শহিদ হয়ে যাবেন? না কি তাকে লাঞ্ছিত করা হবে? বেঁধে নিয়ে বলা হবে–চলো!?

রাজপুত্র দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পড়ালেন। সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। পা-ও গুটাননি। কিন্তু আল্লাহ মালুম, শায়খ সাঈদ হলবির

চিন্তা ও দৃষ্টিতে কী প্রভাব ছিল, ইবরাহিম কিছুই বলেনি। কোনওরূপ তিরস্কার করেনি, অভিযোগ করেনি। কিছুক্ষণ থাকার পর চলে গেল।

শোনা কথা, সে গভর্নর তার এতটা ভক্ত হয়ে গেল যে, সে গিয়ে আশরাফির একটি বিরাট বোঝা তার গোলামের মারফত পাঠিয়ে বলল, শায়খকে গিয়ে আমার সালাম দেবে; বলবে, এই সামান্য নজরানা যেন কবুল করে।

জানেন, তিনি কী জবাব দিয়েছেন? সোনার হরফে লেখার মত কথা, যা সব সময় ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের বাদশাহকে সালাম বলবে। আর বলবে, যে পা মেলে, সে হাত মেলে না। হয়ত নিজের পা মেলবে, নয় তো হাত। একটাই করা যেতে পারে। যখন আমি পা ছড়িয়ে ছিলাম, তখনও আমি বুঝতাম, এখন আমি হাত মেলতে পারব না।

‘যে পা মেলে, সে হাত মেলে না।’

এই শব্দেই ইতিহাসে তার কথাটি বর্ণিত রয়েছে।[১০৯]

১০৯. মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী রচিত ‘পা জা সুরাগে জিন্দেগি’

ওয়াদা রক্ষার অনুপম ঘটনা

হুরমুজান[১১০] ছিল ইরানের একটি বাহিনীর সিপাহসালার। একবার মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছিল। তখন মুসলমানদের কর দেবে বলে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এরপর আবার বিদ্রোহ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে এল। এবারও পরাস্ত হল। তাকে বন্দী করা হল। উমর ﷺ ছিলেন আমিরুল মুমেনিন। তার নিকট তাকে পাঠানো হল। সে যখন উমর ﷺ-র দরবারে পৌঁছয়, তখন তার মাথায় ছিল নকশা করা মুকুট; দেহে রেশমি পোশাক; কোমরে নকশা করা তলোয়ার। আর অমূল্য অলংকার তো ছিলই। আমিরুল মুমেনিন তখন মসজিদে নববীতে ঘুমোচ্ছিলেন। একাকী। মাথার নীচে পাগড়ি; হাতে ছড়ি। হুরমুজানকে দেখে লোকজনও জমায়েত হল। ফিসফিস করে কথা বলছিল তারা। তাদের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমিরুল মুমেনিনের। তাকে দেখেই তিনি বললেন, এ-ই কি হুরমুজান?

---

[১১০] ইরানিদের নামকরা সরদার ছিল হুরমুজান। কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সে আহওয়ায চলে যায়। ইসলামি বাহিনী তাকে আবারও পরাজিত করে। এবং কর দেওয়ার শর্তে আপস করে নেয়। তৃতীয়বার পরাজিত হয়ে সে তসতর পৌঁছে কিল্লা বন্ধ করে দেয়। এরমধ্যে আবু মুসা আশআরি ﷺ-র বাহিনী তসতর শহর কব্জা করে নেয়। তখন হুরমুজান এ-শর্তে আত্ম-সমর্পণ করে যে, তাকে ফারুকে আজমের নিকট পাঠানো হবে। চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে বড়ই জাঁকজমকের সাথে খলিফার দরবারে সে উপস্থিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফার সামনে সে-সব ফিকে হয়ে যায়। পানি পান করার বাহানায় সে নিরাপত্তা নিয়ে নেয় এবং উমর ﷺ-র দাওয়াতে ইসলাম কবুল করে। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/৩৯৯-৪০১]

লোকেরা বলল, হ্যাঁ।

আমিরুল মুমেনিন বললেন–

'জাহান্নামের আগুন হতে আমি আল্লাহ ﷻ-র নিকট আশ্রয় চাই, তারই সাহায্য চাই। সকল প্রশংসা তার, যিনি ইসলামের মাধ্যমে একে [হুরমুজানকে] এবং এর বাহিনীকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছেন। মুসলমানগণ! এই দীনকে তোমরা মজবুতভাবে আঁকড়ে রাখো। তোমাদের নবীর দিক-নির্দেশনা গলার সাথে মিলিয়ে রাখো। দুনিয়া যেন তোমাদের ধোঁকা দিতে না পারে। কারণ, এই দুনিয়া পুরোটাই ধোঁকা আর ধোঁকা।'

হুরমুজানকে নিয়ে আসা দল বলল, আমিরুল মুমেনিন! এ আহওয়াযের শাসক। এর সাথে মতবিনিময় করুন।

আমিরুল মুমেনিন বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার এই পোশাকে থাকবে, ততক্ষণ আমি তার সাথে মত বিনিময় করতে পারি না।

হুরমুজান তার পোশাক পরিবর্তন করে সাধারণ পোশাক পরে এল।

আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন–

'বার বার ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণ কী? এর সপক্ষে তোমার নিকট কোনও দলিল আছে?'

হুরমুজান বলল–

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার উজর শোনার আগেই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলবেন।'

আমিরুল মুমেনিন বললেন, ভয় পেয়ো না। তোমার উজর শোনা হবে।

এরপর হুরমুজান পানি চাইল। পানি আনা হল। পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে বলল, আমার ভয় হচ্ছে, পানি পানরত অবস্থায়ই আমাকে মেরে ফেলবেন।

আমিরুল মুমেনিন বললেন, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। যতক্ষণ না তুমি পানি পান করে নিচ্ছ, তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না।

এ কথা শুনতেই হুরমুজান হাত থেকে পেয়ালা ছেড়ে দিল। পানি পড়ে গেল। বলল, এই শর্ত মুতাবিক আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন না। কারণ, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

হুরমুজানের এই চাতুর্য ও ধোঁকায় উমর رضي الله عنه খুবই ক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু আনাস رضي الله عنه বলে উঠলেন, আমিরুল মুমেনিন! এ সত্য বলেছে। কারণ, আপনি বলেছেন, যতক্ষণ না সে তার পুরো ব্যাপারটা না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আর যতক্ষণ না পানি পান করে নেবে, তাকে কোনও বিপদে ফেলা হবে না।

লোকজন আনাস رضي الله عنه-র কথা সমর্থন করল।

উমর رضي الله عنه বললেন, হুরমুজান! তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। কিন্তু আমি তোমাকে ধোঁকা দেব না। এই শিক্ষা ইসলামে নেই।

ওয়াদা রক্ষা এবং উত্তম ব্যবহারের ফল হল—হুরমুজান মুসলমান হয়ে গেল। আমিরুল মুমেনিন তার জন্য বার্ষিক দু' হাজার মুদ্রা ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। সে মদিনায় বসবাস করতে লাগল।[১১১]

১১১. ইতিহাসের বিভিন্ন বইয়ে ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার বর্ণনার বেশিরভাগই মুহাম্মদ রেজার 'আলফারুক উমর ইবনুল খাত্তাব সানিল খুলাফায়ে রাশেদিন' থেকে নেওয়া হয়েছে। দেখুন পৃ. ২৪১

ঈসায়িদের আবেগের প্রতি সম্মান

এক ঈসায়ি পাদরির সাথে উমর رضي الله عنه বাইতুল মাকদেস [জেরুজালেম] প্রবেশ করলেন। তার পাথেয় ছিল মাত্র একটি লাল উট; তার ওপর একটি থলের মধ্যে রাখা ভাজা যব, অপর থলের মধ্যে কিছু খেজুর, পানির একটি মশক এবং কাঠের একটি পেয়ালা। সাথে একটি গোলাম ছিল। মদিনা থেকেই তার সফরসঙ্গী ছিল সে। তিনি এবং গোলাম পালাক্রমে উটের ওপর আরোহণ করে এসেছেন।

ফারুকে আজম এবং পাদরি যখন বাইতুল মাকদেসে অবস্থান করছিলেন, তখন সালাতের আজান দেওয়া হল। গির্জার মধ্যেই সালাত আদায়ের জন্য পাদরি অনুরোধ করল। কিন্তু খলিফা তা করলেন না। কারণ, এরূপ করলে খুবই সম্ভাবনা আছে, তার এই সালাতকে প্রমাণ হিসেবে ধরে নিয়ে মুসলমানরা ধীরে ধীরে সেটার ওপর কব্জা করে বসবে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আবেগ ও তাদের ইবাদতখানা হিফাজত করার উদ্দেশ্যে খলিফাতুল মুসলেমিন গির্জায় না পড়ে, গির্জার বাইরে সালাত পড়েছেন।[১১২]

অন্য ধর্মের উপাসনালয়ের আবেগের সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন উমর ফারুক (রাঃ)

১১২. মাশাহিরে ইসলাম : ৫

শর্ত রক্ষা করা

আব্দুর রহমান বিন গানাম[১১৩] বর্ণনা করেন, একদিন আমি আমিরুল মুমেনিন উমর ফারুক ﵁-র নিকট বসা ছিলাম। এতটা কাছাকাছি বসা ছিলাম যে, আমার হাঁটু তার হাঁটুর সাথে মিলে ছিল। এই সময় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হল; আরজ করল–

আমিরুল মুমেনিন! একে আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের সময় এই শর্ত আমি মেনে নিয়েছি যে, তাকে তার পিত্রালয়ে রাখব–আমার বাড়ি নেব না। কিন্তু এখন আমার সঙ্গতি তাদের থেকে ভাল। এখন কি আমি তাকে নিজের বাড়ি নিতে পারি? [যখন সে যেতে অস্বীকার করছে।]

আমিরুল মুমেনিন জবাব দিলেন, যে শর্তের ওপর একে বিয়ে করেছ, সেটা রক্ষা করা তোমার জন্য আবশ্যক।

সে বলল–

'[যদি এমনই হয়,] তবে তো পুরুষদের ধ্বংস অনিবার্য। কোনও নারী তার স্বামীকে ছাড়তে চাইবে না, কিন্তু [যখন নিজের শর্তের ওপর জিদ করে বসবে, তখন না চাইলেও নিজের স্বামীকে] সে ছেড়ে দেবে।'

---

[১১৩] আব্দুর রহমান বিন গানাম আশআরির পিতা সাহাবি ছিলেন। আবু মুসা আশআরি ﵁-র সাথে তিনি হিজরত করেন। লাইস এবং ইবনে লেহইয়ার মতে আব্দুর রহমানও সাহাবি ছিলেন। ইমাম তিরমিযি ﵀ বলেন, তিনি নবীজি ﷺ-কে দেখেছিলেন। লোকদের দীন শেখানোর জন্য তাকে হযরত উমর ﵁ ফিলিস্তিন প্রেরণ করেন। ৭৮ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ৪/৪৫-৪৬]

আমিরুল মুমেনিন বললেন–

'মুসলমানরা তাদের অধিকার শেষ হওয়ার সময়[ও] আরোপিত শর্তই রক্ষা করবে।'[১১৪]

---

[১১৪] আকযিয়াতুল খোলাফায়ির রাশেদীন : ১/৬৪ ; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৬/২২৭ ; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩/৪৯৯

সুলতান মাহমুদের অনুপম ন্যায়-বিচার

সুলতান মাহমুদের[১১৫] এক ভাগ্নে ছিল। এক বিবাহিতা নারীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ওই নারীর স্বামী তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু সে তার কোনও কথাই শুনল না। কাজি, উজির বা আমির, কেউ ওই গরিব স্বামীর কথা শুনল না। অবশেষে সে সাহস করে নিজেই সুলতান মাহমুদের নিকট গেল। খুবই সাহসিকতার সাথে নিজের দুঃখের কথা তাকে জানাল। সুলতান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

আমি তোমার সাথে ইনসাফ করব। তবে এটা কাউকে জানতে দেবে না। সে আবার গেলে তুমি সোজা আমার কাছে চলে আসবে।

দারওয়ানদেরও বাদশাহ তাগিদ দিয়ে বললেন, এই ব্যক্তি এলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে–সে যে অবস্থায়ই থাকুক।

---

১১৫. সুলতান মাহমুদ গজনুভী সিংহাসনে বসেন ৩৮৭ হিজরি মুতাবিক ৯৮৮ খৃস্টাব্দে, তার পিতা নাসেরুদ্দিন সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর। তুর্কিস্তান, খোরাসান, আফগানিস্তান এবং বর্তমান পাকিস্তান তার সুলতানতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আনন্দপালকে পরাজিত করেন। তা ছাড়া তিনি কাংরা, মথুরা, কন্নৌজ এবং সোমনাথের ওপর আক্রমণ করে সকল হিন্দু রাজাদের পরাজিত করেন। ১০২১ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবকে গজনী সুলতানতের মধ্যে শামেল করে নেন। ১০৩০ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [ইনসাইক্লোপেডিয়া তারিখে আলম : ১/৭৯-৮০]

যথারীতি শাহযাদা এসে গেল। সে-ব্যক্তিকে তার বাড়ি থেকে বের করে তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বসল। সে সুলতান মাহমুদকে অবহিত করল। সুলতান নিজে এলেন। নিজ চোখে সবকিছু দেখার পর তলোয়ারের এক আঘাতেই তার ভাগ্নের শিরচ্ছেদ করে দিলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে তিনি পানি চাইলেন এবং দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন।

বাদশাহর ভগ্নিপতি জেলখানায়

এক আরব আমির হিন্দুস্তানে এক বাদশাহর নিকট এল। আরব আমিরের নাম ছিল সাইফুদ্দিন। হিন্দুস্তানের বাদশাহ তার শুধু আপ্যায়নই করেননি, বরং কিছুদিন পর তিনি তার এক বোনকে ওই আমিরের সাথে বিয়েও দিলেন। নাম ছিল তার ফিরোজা। বড় ধুমধামে বিয়ে হল। এরপর তাকে গুজরাট, জুনাগড়সহ বিরাট এলাকার জায়গীর দিল। কিন্তু সেই বুদ্ধু এই বিশাল নিয়ামতের মূল্যায়ন করেনি। বিশ দিন পর যখন শাহি মহলে ঢুকতে গেল, তখন অনুমতি বা অবগতির কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। ভাবখানা, আমি হলাম বাদশাহর ভগ্নিপতি—আমার আবার অনুমতি বা অবগতির কী দরকার? দারোয়ান তাকে বাধা দিল—অনুমতি ছাড়া ভেতরে যাওয়া যাবে না। কিন্তু আমির তাকে ঝাড়ি মেরে ভেতরে ঢুকতে চাইল। যাওয়ার জন্য যখন জবরদস্তি করল, তখন দারোয়ান তার মাথার চুল ধরে বাইরে টেনে আনল। আমির তাকে লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করল। এতে সে রক্তাক্ত হল। এই অবস্থায়ই সে বাদশাহর নিকট গেল। সব কথা তাকে জানাল। বাদশাহ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর বললেন, অপরাধ এতটাই কঠিন যে, বাদশাহ নিজেও মাফ করতে পারবে না। কাজির নিকট গিয়ে তোমার মুকাদ্দমা দায়ের করো। কাজি কামালুদ্দিন ছিলেন শহরের প্রধান কাজি। মুকাদ্দমা তার নিকট গেল। তিনি সব শুনলেন। আর যেহেতু আমির সাইফুদ্দিন তার কৃতকর্মের কথা অস্বীকার করেনি, তাই তাকে এক রাত কয়েদখানায় রাখলেন। শাহযাদি ফিরোজা, আমির সাইফুদ্দিনের স্ত্রী এবং বাদশাহর বোন, ভায়ের ভয়ে স্বামীর জন্য কয়েদখানায় বিছানা বা খাবার পাঠানোর সাহস করেননি। পরের দিন কাজি সাহেব তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন।[১১৬]

---

১১৬. তারিখে দেহলী : ১৭২

এই নারীকে মারল কে

হানজালা কাতেব[১১৭] বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে শরিক ছিলাম। এক নিহত মহিলার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া হল। সেখানে লোকজন জমা হয়ে ছিল। তা দেখে রাসুল ﷺ ইরশাদ করলেন—

'যুদ্ধবাজদের সাথে তো এই নারী যুদ্ধ করেনি!'

এই উক্তি দ্বারা রাসুল ﷺ একটি নিয়মনীতির দিকে ইঙ্গিত করলেন। মুজাহিদদের জানালেন, যখন এই মহিলা তোমার বিপক্ষে লড়েনি, তখন তাকে হত্যা করা হল কেন?

এরপর খালেদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه-র নিকট এই পয়গাম দিয়ে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন—

'অপ্রাপ্ত বয়স্কদের এবং মজদুরদের হত্যা করবে না।'[১১৮]

আবু দাউদে রয়েছে, তায়েফের যুদ্ধে এক নিহত মহিলার পাশ দিয়ে রাসুল ﷺ-এর যাওয়া হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

---

১১৭. হানযালা বিন রবি' তমিমি رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর কাতেবে-ওহি ছিলেন। তাকে হানযালা উসাইদিও বলা হয়। কারণ, উসাইদ বিন আমর বিন তমিম তার প্রপিতামহ ছিলেন। নবীজি ﷺ তাকে তায়েফবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কুরকেসিয়া [ইরাক] চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ২/৮৪-৮৫]

১১৮. আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] : ২/৮০৩ ; ইবনে মাজা : ২/৯৪৮ ; আহমদ : ৪/১৭৮ ; ইবনে হযম : ৭/৭৪২ ; ইবনে হিব্বান : ৭/১৪১

'একে হত্যা করেছে কে?'

একব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তাকে হত্যা করেছি। গনিমতের মাল হিসেবে একে আমি পেয়েছিলাম। আমার পিছনে তাকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের পরাজয় দেখতে পেয়ে সে আমার তলোয়ারের দিকে ঝাঁপ দিল—আমাকে হত্যা করার জন্য। তার মনোভাব বুঝতে পেরে আমি তাকে কাবু করে মেরে ফেলেছি।

এ কথা শুনে রাসুল ﷺ বিরূপ কোনও মন্তব্য করেননি। নিহত মহিলাকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন।[১১৯]

বোঝা গেল, মহিলা যদি শত্রুতামূলক আচরণ করে, তা হলে তাকে হত্যা করা যাবে।

[১১৯] মারাসিলে আবি দাউদ : ৩৬-৩৭

ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহর নিন্দাকারীকে ক্ষমা

আব্দুল্লাহ[১২০] তার ভাই মুনযির খলফ মুহাম্মদের পর ৮৮৮ ঈ. সালে স্পেনের আমির হন। সিংহাসনে বসার পরই তিনি অধিকাংশ কয়েদিকে মুক্ত করে দেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের। তাদের সহায়-সম্পদও ফেরত দেন।

শায়খ সুলাইমান ইবনুল বাগা একবার আমির আব্দুল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছিল। সৃভাগত উদারতার কারণে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ৯০০ ঈসাব্দে সুলাইমান আমির আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি নিন্দামূলক কবিতা লেখেন। পুরো দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ওই কবিতায় সুলতানকে খচ্চর এবং উজিরদের খচ্চরের রাখাল হিসেবে পেশ করা হয়।

দেখুন, একজন সত্যবাদী, ন্যায়-পরায়ণ ও স্নেহ-পরায়ণ শাসক তার বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কবিতা লেখকের সাথে কীরূপ ফয়সালা করেন। তিনি সুলাইমানকে ডেকে এনে বললেন—

[১২০] আমির আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ তার ভাই মুনযিরের মৃত্যুর পর ২৭৫ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ২৫ বছর রাজত্ব পরিচালনা করেন। এর বেশিরভাগ সময়ই বিদ্রোহ দমনে কেটে যায়। তার এগারো পুত্রের মধ্যে মুতাররফ এবং মুহাম্মদ ছিল বড়। নানা কারণে মুহাম্মদ বন্দী ছিল। পিতার অনুপস্থিতিতে মুতাররফ মুহাম্মদকে হত্যা করিয়ে ফেলে। এরপর উজির আব্দুল মালেককে হত্যা করায়। মুহাম্মদ এবং আব্দুল মালিকের কিসাস হিসেবে বাদশাহ আব্দুল্লাহ মুতাররফকে হত্যা করেন। নিহত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর পুত্র আব্দুর রহমান তার দাদার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খলিফা আব্দুর রহমান নাসের নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি, ২/১৪৪-১৪৯]

সুলাইমান! আমার দান মন্দ মাটিতে পড়েছে, তাই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি প্রশংসাযোগ্যও নই, নিন্দাযোগ্যও নই। কারণ, আমার জন্য দুটোই বরাবর। বিদ্রোহ অনেক বড় অপরাধ। কিন্তু আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। যদিও এই মাফ করার কোনও সুফল আসেনি। কিন্তু আমি প্রতিশোধ নেওয়া থেকে ক্ষমা করাকে প্রাধান্য দিই। আমার নিন্দামূলক কবিতাগুলো আমার সামনে পড়ো। এককেটি ছন্দের বিনিময়ে আমি তোমাকে এক হাজার মুদ্রা দেব। খচ্চর তো তারপরও একটা উপকারী প্রাণী। তুমি আমার ওপর যতবড় অপবাদ দিতে, তোমার ওপর আমি ততবেশি অনুগ্রহের বোঝা চাপিয়ে দিতাম।

আমির আব্দুল্লাহর পায়ে লুটিয়ে পড়ল সুলাইমান। অজোরে কাঁদতে লাগল সে। মাফও চাইতে লাগল।

আমির তাকে মাফ করে দিলেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত সে বাদশাহর অনুগত এবং বিশ্বস্ত থাকল।[১২১]

---

১২১. দেখুন, 'না-কাবেলে ফরামুশ ওয়াকেআত' : ২৩৩ [কিছুটা পরিবর্তিত]

বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার পরিণতি

একবার এক বাদশাহ চাকরবাকর নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটি শিশু দেখতে পেলেন। শিশুটিকে দেখে তার বেশ মায়া হল। নির্দেশ দিলেন, একে আমার পরিবারের লোকদের নিকট সোপর্দ করা হোক; তাকে প্রতিপালন করা হোক।

শিশুটি রাজার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে লাগল।

পরিবারের লোকদের নিকটও শিশুটি ভাল লাগল। তার নাম রাখা হল আহমদ ইয়াতিম। বড়ই ধীমান ও বুদ্ধিমান ছিল সে। পড়ালেখা এবং আনুগত্যে অনন্য ছিল। বাদশাহর মৃত্যুর সময় এলে তিনি তার ছেলেদের ডেকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর এর প্রতি ভালভাবে খেয়াল রাখবে। কোনওকিছুর অভাব যেন তার না হয়।

পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা পিতার ওসিয়্যত পুরোপুরি পালন করল। আহমদ ইয়াতিমের প্রতি আগের থেকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল। পড়ালেখার জন্য আলাদা শিক্ষক রাখা হল। আহমদ ইয়াতিমের যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেল। আল্লাহপ্রদত্ত গুণের অধিকারী ছিল সে। ধীরে ধীরে সে উন্নতির সোপানগুলো বেয়ে উঠতে লাগল। তার প্রতি নতুন বাদশাহর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাই তাকে নিজের বিশেষ সেবকদের মধ্যে নিয়ে নিলেন। ব্যক্তিগত সব কাজে তার থেকে পরামর্শ নিতে শুরু করলেন। এভাবে কিছুদিন গেল। আহমদ ইয়াতিমের কার্যক্রম আরও ভাল হতে লাগল। মহলের চাকরদের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হল তাকে। এখন সে পুরো মহলের নওকরদের জিম্মাদার। স্বাধীনভাবে সবখানে যেতে পারে।

একদিন বাদশাহ আহমদ ইয়াতিমকে বললেন, আমার খাস কামরা থেকে অমুক জিনিসটা নিয়ে এসো। আহমদ যখন খাস কামরায় গেল, তখন বাদশাহর খাস দাসীকে এক নওকরের সাথে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখতে পেল। পাপকর্মে লিপ্ত দাসী তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করল, যেন তার ওপর রহম করা হয়; তার গোপন ব্যাপারটা যেন গোপন রাখা হয়। দাসী ছিল সুন্দরী। সে তাকে প্রলোভিত করার জন্য বলল, আমি তোমার সব ধরনের সেবা করতে প্রস্তুত। আহমদ বলল, আল্লাহ পানাহ! কী ধরনের কাজ করছ তুমি! আমি আমার আমিরের খেয়ানত করি কীভাবে? তিনি তো আমার সাথে এই এই ভাল আচরণ করেছেন। আমাকে মাটি থেকে আসমানে তুলেছেন। এ ধরনের কাজ তো খবিস লোকেরা করে।

সে দাসীকে নসিহত করল। তাওবা-ইসতেগফার করতে বলল। এরপর সেখান থেকে চলে এল। তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে এল, চিন্তা কোরো না। তোমার কথা গোপন থাকবে।

এদিকে দাসী চিন্তায় পড়ে গেল—যদি আহমদ বলে দিল!

সন্ধ্যার সময় নিয়মমত যখন বাদশাহ ভেতরে এলেন, তখন দাসী নিজের কাপড় ছিঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে চেহারার ওপর হাত মারতে মারতে বাদশাহর নিকট গেল। বাদশাহ তখন একাকী ছিলেন। নিজের খাস দাসীকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে মেরেছে কে? কাঁদছ কেন?

দাসী কলা-কৌশলে ভঙ্গিমা করে বলল, আহমদ ইয়াতিম আমার দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়েছি। নইলে তো সে জোর করে আমাকে কলঙ্কিত করত।

শোনার সাথে সাথে বাদশাহ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। বললেন, এ ধরনের ব্যক্তির একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। এখনই তাকে হত্যা করা চাই।

রাত হয়ে গেছে। তাই তার ইচ্ছাটাকে সকাল পর্যন্ত মুলতবি করা সমীচীন মনে করলেন। এদিকে আহমদ মহলের সবার প্রিয়পাত্র ছিল। সবাই তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। সবার সামনে হত্যা করা ঠিক

হবে না। এতে অযথাই মহলে কানাঘুষা শুরু হবে। ভাবলেন, গোপনেই হত্যা করতে হবে। তা হলে লোকজন তার অপরাধের ব্যাপারটা জানতে পারবে না। বাদশাহ নিজেই পরিকল্পনা করলেন। নিজের এক খাস ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, যে-ব্যক্তির হাতে করে আমি তোমার নিকট একটি থাল পাঠাব, তাকে কতল করে ওই থালে করেই তার মস্তক আমার নিকট নিয়ে আসবে।

তার খাস খাদেম মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল।

কয়েক দিন পর বাদশাহ আহমদ ইয়াতিমকে ডেকে বললেন, স্টোররুমে যাও। সেখান থেকে একটি থাল নিয়ে অমুক ব্যক্তির নিকট যাও। বলবে, বাদশাহ পাঠিয়েছেন। যা-কিছু সে দেবে, তা নিয়ে আসবে।

বাদশাহর হুকুম পালন করে আহমদ ইয়াতিম থাল নিয়ে জল্লাদের দিকে রওয়ানা হল। পথে কয়েকজন নওকরকে দেখল, তারা বিবাদ করছে। তারা তাকে ফয়সালা করার জন্য বলল। সে বলল, আমি তো বাদশাহর কাজে যাচ্ছি। ফেরার পথে ফয়সালা করব। তারা বলল, ফয়সালা এখনই হওয়া দরকার। এ কাজে আমরা আরেকজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে থাল নিয়ে এলে তুমি তা বাদশাহর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ো।

যুক্তিযুক্ত কথা। তারা এক চাকরকে ইশারা করে বলল, সে যেন থালাটি নিয়ে অমুক ব্যক্তির নিকট যায়। সে যা দেয়, তা নিয়ে যেন ফিরে আসে।

দেখুন! এ ছিল সেই চাকর, যার সাথে ওই দাসী অপকর্মে লিপ্ত ছিল। থালা নিয়ে সে খাস খাদেমের নিকট গেল।

হত্যা করার জন্য ওই খাস খাদেম বিশেষ জায়গার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। যেন কারও কানেও খবর না পৌঁছে। চাকরকে সাথে নিয়ে সে ওই জায়গায় পৌঁছল। তলোয়ার দিয়ে শিরচ্ছেদ করে তার মাথাটি থালের ওপর রেখে ভালভাবে ঢেকে নিল। এরপর বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল।

থালার ওপর থেকে বাদশাহ কাপড় সরাল। সেখানে আহমদ ইয়াতিমের মাথা নয়, অন্য নওকরের মাথা ছিল। তিনি বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আহমদ ইয়াতিম কোথায়? জানানো হল, অমুক জায়গায়। তাকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন তিনি। আহমদ ইয়াতিম এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা কাজে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম–বলেছিলাম, থালা তুমি নিজে নিয়ে যাবে। তুমি নিজে গেলে না কেন?

ভেতরে ভেতরে এতসব হচ্ছে–আহমদ ইয়াতিমের জানা ছিল না। নওকরদের মধ্যেকার বিবাদ এবং তাদের ফয়সালার কথা বলে বলল, আমি সেখানে ব্যস্ত ছিলাম।

কী মনে এল বাদশাহর। আহমদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি অমুক নওকর এবং তার কোনও অপরাধ জানো? আহমদ বলল, হ্যাঁ। অমুক দাসীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সে আমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে–যেন আমি তা গোপন রাখি।

সব কিছু জানার পর বাদশাহ দাসীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আর আহমদকে আরও এখতিয়ার দেওয়া হল। বাদশাহর মনে তার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল।

এ হল বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্তের ফল।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ-র কথা সত্য–

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

‘কুচক্রান্তকারীদের কুচক্রান্তের পরিণতি তাদেরই ঘিরে ধরে।’ [সূরা ফাতির : ৪৩]

শেষ ফয়সালা আল্লাহ ﷻ-র হাতে

ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেকের[১২২] নিকট এক বিদ্রোহীকে আনা হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনার পর তিনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। এদিকে বিদ্রোহীর মুখ থেকে এ কথাটি বেরিয়ে এল–

‘অতি শীঘ্রই আল্লাহ ﷻ আমার মুক্তির উপায় বের করে দেবেন। কারণ, প্রতিদিন তার নিজের বান্দার ব্যাপারে হুকুম হয়।’

ইয়াজিদ বললেন–

‘আল্লাহর কসম! আমি তোমার শিরচ্ছেদ করবই! যাও, ওকে নিয়ে হত্যা করো।’

সিপাহিরা তাকে হত্যা করার আয়োজনে লেগে গেল। যখন তাকে হত্যা করতে যাবে, তখনই এক বুযুর্গ তাবে'য়ি হাইছাম বিন আসওয়াদ নখ'য়ি সেখানে উপস্থিত হলেন। ইনি ছিলেন কূফার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি; নামকরা বক্তা, কবি এবং নির্ভরযোগ্য রাবি।

[১২২] উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ [৭২০-৭২৪ খৃ.] উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله-র পর সিংহাসনে বসেন। এক শত দিন তিনি তার অনুসরণে চলেন। এরপর রাজকীয় প্রথায় চলতে শুরু করেন। তার শাসনকালেই স্পেনের গভর্নর সামাহ বিন মালেক খাওলানি ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ করেন। তবে তিনি তলুশার সামনে ডিউক জুদোর সাথে যুদ্ধের সময় শহিদ হন। খলিফা ইয়াজিদের পর তার ভাই হিশাম বিন আব্দুল মালেক খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। [ইনসাইক্লোপেডিয়া তারিখে আলম : ১/১৪]

ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেক তাকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্রোহীকে দেখে তিনি বললেন–

আমিরুল মুমেনিন! এই অপরাধী আমাকে দিয়ে দিন।

ইয়াজিদ তার দিকে তাকিয়ে বললেন–

'ও আপনার।'

বিদ্রোহী যখন সেখান থেকে বের হচ্ছিল, তখন বলছিল–

'খলিফা আল্লাহর ওপর অস্বীকার করেছিল, [এবং একব্যক্তিকে হত্যা করার কসম করেছিল।] কিন্তু আল্লাহ ﷻ চাননি যে, তাকে হত্যা করা হোক।'

শেষ ইচ্ছে, খাওয়া

নাযুক নামক এক বাদশাহর নিকট একব্যক্তিকে আনা হল। তাকে হত্যা করার নির্দেশ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরই শিরচ্ছেদ হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার শেষ ইচ্ছে কী?

সে বলল, পেটভরে খাওয়া।

নির্দেশ হল। খানা আনা হল। সে ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল আর হাসছিল। সিপাহিরা বলল, তুমি তো বেশ লোক! কিছুক্ষণ পর তোমাকে হত্যা করা হবে–আর তুমি কিনা হাসছ!

সে বলল, সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সামান্য সময়ের মধ্যেই আমার মুক্তি হওয়া সম্ভব।

তার কথা শেষ হতে না হতেই শোরগোল উঠল–বাদশাহ মারা গেছেন। এরপর ওই ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেওয়া হল।

নিরঅপরাধ মানুষদের হত্যাকারী-
এবং অপরাধীদের

সে-কাজির জন্য ধ্বংস

ইউসুফ কুফি বলেন, তাওয়াফের সময় আমি একব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, সে এই দোয়া করছে–

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও! তবে তুমি আমাকে মাফ করবে বলে মনে হয় না।

আমি তার নিকট গেলাম। বললাম–

আল্লাহ ﷻ-র ক্ষমা এবং মার্জনা থেকে নিরাশ হচ্ছ–কী বিস্ময়ের কথা!

সে বলল, আমি এক বিরাট পাপ করে ফেলেছি। তাই ক্ষমা পাওয়ার আশা আমার নেই।

তাকে বললাম, সে-পাপটা কী? আমাকে বলো।

তার যে ঘটনা সে আমাকে শোনাল, তা ছিল অনেকটা এই রকম–

ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ যখন মুসেলের বিদ্রোহ দমন করেন, তখন তার সাথে আমিও ছিলাম। শুক্রবার দিন ছিল। আমরা অনেক লোক মেরেছি। শহর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি। এ সময় শাসকের পক্ষ থেকে ঘোষণা হল–যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে বসে পড়বে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। ওই বাড়ি, এবং ওই বাড়িতে যা-কিছু আছে, সেগুলো হিফাজতের জিম্মাদারি নেওয়া হচ্ছে। তাই কেউ বাড়ি থেকে বের হবে না।

অসংখ্য লোক নিজ নিজ বাড়িতে চুপসে বসে পড়ল। তখন আমি নওজোয়ান। ক্ষমতা ও শক্তির নেশা আমার ওপর ছেয়ে আছে। একটি বাড়ি বাছাই করলাম। তলোয়ার নাচাতে নাচাতে সে-বাড়িতে ঢুকে

পড়লাম। দু' সন্তান নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার। স্বামী এগিয়ে এল। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইল। তলোওয়ারের এক আঘাতে তাকে মেরে ফেললাম। তার স্ত্রী চিৎকার করে উঠল। আমার নিকট নিরাপত্তা চাইতে লাগল। আমি বললাম, ঘরে অর্থকড়ি এবং সোনারূপা যা আছে, আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। এই বাড়ির লোকজনকে আমার বেশ সম্পদশালী মনে হচ্ছে। এখান থেকে অনেক সম্পদ হাতে আসবে বলে আসা রাখছি। সে মহিলা ভেতরে গেল। সাতটি দেরহাম নিয়ে ফিরে এল।

আমি বললাম– এ তো একেবারেই কম। আরও আনো!

সে বলল–

এ ছাড়া ঘরে আর কোনও অর্থকড়ি নেই যে তোমাকে দেব।

তার চোখের সামনে তলোয়ার নাচিয়ে বললাম,

দুর্ভাগিনী! এখনই ভেতরে গিয়ে মাল নিয়ে আয়। তা না হলে তোর এক ছেলেকে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব!

ওই মহিলা হাত জোড় করে মিনতি করতে লাগল। বলল, ঘরে শুধু এ-ই আছে।

তার কথা আমার বিশ্বাস হল না। এ সময়ে তার এক ছেলে সামনে এগিয়ে এল। তলোয়ারের এক আঘাতে তাকে মেরে ফেললাম। এরপর ওই মহিলাকে আবার বললাম–

এখনও সময় আছে। যা আছে, সব নিয়ে এসো। নইলে তোমার অন্য ছেলেকেও মেরে ফেলব। আমার নির্মমতা দেখে ওই মহিলা বলল, আমার ওপর দয়া করো। আমার নিকট আমার স্বামীর দেওয়া একটি বস্তু আছে। আমি তা-ই নিয়ে আসছি।

ভেতরে গিয়ে সে স্বর্ণের একটি বর্ম নিয়ে এল। এমন সুন্দর বর্ম আমি জীবনে কখনও দেখিনি। হাতে নিয়ে তা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। সেই বর্মে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল–

'যখন কোনও আমির এবং আশপাশের লোকজন জুলুম শুরু করে, দুনিয়ার কাজিরা তাদের ফয়সালায় বাড়াবাড়ি শুরু করে, তখন এই দুনিয়ার কাজির জন্য আসমানের কাজির পক্ষ হতে ধ্বংস; শুধুই ধ্বংস।'

এই কবিতাটি পড়ার পর আমার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল; দেহ অসাড় হয়ে গেল। অত্যন্ত লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আল্লাহ চাইলে ফাঁসির আসামীও বেঁচে যান

আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মুক্তির পরওয়ানা

ইমাম ইবনে হজমের[১২৩] পিতার নাম ছিল আবু উমর আহমদ[১২৪]। খলিফা মনসুরের যুগে তিনি উজির ছিলেন। একবার তিনি মনসুরের নিকট বসা ছিলেন। মনসুরের নিকট প্রজাদের দরখাস্ত পেশ করছিলেন। আর তিনি তা পড়ে হুকুম লিখে যাচ্ছিলেন। এক মায়ের দরখাস্ত এল। নিজের ছেলের মুক্তি চেয়ে।

মনসুরের দৃষ্টিতে এ-ছেলে ছিল অনেক বড় অপরাধী। কাছেধারেই তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। দরখাস্তটি সামনে এলে তার কথা মনে পড়ল খলিফার। রাগের একাশেষে পৌঁছে গেলেন। উজিরকে বললেন—

আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে।

---

১২৩. আবু মুহাম্মদ আলী বিন আহমদ বিন সাঈদ ইবনে হজম উন্দুলুসি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেমে দীন, ফকিহ, ইতিহাসবিদ এবং কবি। ৩৮৪ হিজরিতে কর্ডোভায় তার জন্ম হয়। তার প্রপিতামহ খৃস্টান থেকে মুসলমান হন। জীবনের শুরুভাগে ইবনে হজমকে বন্দীজীবনও কাটাতে হয়। তওকুল হামামাহ, আলমুহাল্লা, রিসালাতুন ফি ফজলিল উন্দুলুস, আল-ইহকাম, কিতাবুল ফছল এবং কিতাবুল আখলাক ওয়াসি্সয়ার তার প্রসিদ্ধ রচনা। তার লেখা কিতাবের সংখ্যা হল ৪০০-টি, যেগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮০ হাজার। ৪৫৬ হিজরিতে ইবনে হজমের মৃত্যু হয়। [উর্দু দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া : ১ম খণ্ড]

১২৪. মুহাম্মদ বিন আবু আমের ছিলেন উন্দুলুসের দ্বিতীয় হিশামের প্রধান উজির। তিনি 'হাজেবুল মনসুর' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৪০০ কিতাব রচনা

তিনি কলম হাতে নিলেন। দয়ার ভিক্ষা চাওয়া দরখাস্তের ওপর লিখতে চাইলেন–

يُصْلَبُ 'তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক।' কিন্তু কলম লিখল يُطْلَقُ 'তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক।'

লেখার পর কাগজটি উজিরের দিকে এগিয়ে দিলেন। কলম হাতে নিয়ে উজির পুলিশ অফিসারকে লিখলেন– খলিফা মনসুরের নির্দেশ মুতাবিক এই ব্যক্তিতে মুক্ত করে দেয়া হোক।

উজিরকে জিজ্ঞাসা করলেন খলিফা, কী লিখছ?

তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। এ কথা শোনার পর খলিফার কপালে ভাঁজ পড়ল। বললেন–

কে এই হুকুম দিল?

কাগজের পাতাটা উজির তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, লেখার সময় আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তো তাকে ফাঁসি দেওয়ার কথা লিখতে চেয়েছিলাম।

তিনি আবারও লিখলেন। এবারও লিখতে চেয়েছিলেন, يُصْلَبُ 'তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক।' কিন্তু আবারও কলম লিখল يُطْلَقُ 'তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক।'

উজির তার থেকে হুকুমনামা নিয়ে এক নজর দেখে পুলিশকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন। খলিফা মনসুর সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তার মুক্তির পরওয়ানা লেখা হচ্ছে। এতে তার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। বললেন–

এ হুকুম দিল কে?

উজির তার দস্তখতের ওপর আঙ্গুল রাখলেন। মনসুর তার লেখা চিনতে পারলেন। তারই হাতের লেখা। তিনি আবার কাগজ নিলেন। লিখতে চাইলেন, يُصْلَبُ 'তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক।' কিন্তু এবারও লেখা হল يُطْلَقُ 'তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক।' তার থেকে কাগজটা

নিয়ে উজির পুলিশকে হুকুমনামা লিখতে শুরু করলেন। এবারও মনসুর তাকালেন উজিরের লেখার দিকে–কী লেখা হচ্ছে। কয়েদির মুক্তির পরওয়ানা লেখছিলেন উজির। এবার তো খলিফার রাগ চরম পর্যায়ে গেল। নিজের হাতের লেখা শব্দ يُطْلَقُ দেখে তার মাথা নত হয়ে গেল। বললেন–

হ্যাঁ, আমার না চাওয়া সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। যাকে আল্লাহ ﷻ মুক্ত করতে চান, আমি তার মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারি না।

বাদশাহ ন্যায়-প্রিয়তা

সুলতান মালেক শাহ সলজুকি[১২৫] রাজধানী নিশাপুরে অবস্থান করছিলেন। বিভিন্ন শহর ঘুরে দেখতে বের হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তখন ছিল রমজান মাস। শেষ দশক চলছিল। সিদ্ধান্ত নিলেন, রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বের হয়ে পড়বেন। রমজান মাসের ২৯ তারিখ রাত। সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে চাঁদ দেখতে গেলেন। মুসাহিবরাও ছিল সেখানে। চিৎকার করে উঠল তারা, হুজুর! চাঁদ দেখা গেছে। সুলতান নিজেও চাঁদ দেখেননি; দায়িত্বশীলদেরও কেউ দেখেনি। কিন্তু বাদশাহর ইচ্ছা ও বাসনা জেনে তারা তাকে নিশ্চয়তা দিল, চাঁদ দেখা গেছে। তাই বাদশাহর পক্ষ থেকে হুকুম হল—আগামী কাল ঈদ।

তখন মুফতি ও প্রধান কাজি ছিলেন ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলি[১২৬]। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি ঘোষককে ডেকে বললেন, তুমি এভাবে ঘোষণা করো—

১২৫. মালিক শাহ ছিলেন সুলতান আলেপ্প আরসালান সলজুকির পুত্র। ৪৬৫ হিজরির ১০ই রবিউল আওয়াল মুতাবিক ১০৭৩ ঈসাব্দে সিংহাসনে বসেন। রাজধানী নিশাপুর হলেও বাগদাদ, মক্কা-মদিনা এবং বাইতুল মাকদেসেও তার খুতবা পাঠ করা হয়েছে। ৪৮৮ হিজরির ১৫ই শাওয়াল মুতাবিক ১৮ই নভেম্বর, ১০৯২ ঈসাব্দে ৩৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদের খলিফা নিয়োগ ও অব্যহতি সব তার ইচ্ছাধীন ছিল। তার মৃত্যুর পর সলজুকি সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। মালিক শাহর উজির ছিলেন নিজামুল মুলক তুসি। তিনি তার কালের একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। হাসান বিন সাব্বাহ নামক এক বাতেনী ফিদাঈ তাকে শহিদ করে দেয়।

১২৬. ইমামুল হারামাইন ছিলেন নিজামুল মুলক তুসির মজলিসের একজন রুকন। তার নাম ছিল আব্দুল মালেক; উপাধি জিয়াউদ্দিন, উপনাম আবুল মা'আলি

'আবুল মা'আলি বলছেন, আগামী কালও রমজান মাসের অর্ন্তভুক্ত। যে আমার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতে চায়, তার জন্য আগামী কাল রোজা রাখা আবশ্যক।'

প্রধান কাজির এই ঘোষণা অপবাদকারীরা বিকৃতভাবে খলিফার নিকট পৌঁছাল। শুধু তা-ই নয়; বরং তারা আরও বেড়ে বলল, সুলতান সম্বন্ধে আবুল মা'আলির ধ্যান-ধারণা সুবিধের নয়। জনসাধারণ তার ভক্ত। যদি সুলতানের নির্দেশ মুতাবিক আগামী কাল ঈদ না হয়, তা হলে বড়ই লাঞ্ছনা এবং অপমানের কথা। ব্যক্তি হিসেবে সুলতান মন্দ ছিলেন না। তাই ইমামুল হারামাইনের ঘোষণা অপছন্দ হলেও নির্দেশ দিলেন, তাকে যেন সসম্মানে উপস্থিত করা হয়। ফিতনা সৃষ্টিকারীরা আবার বলল, যে ব্যক্তি সুলতানের নির্দেশের সম্মান করে না, সে সম্মানের যোগ্য নয়। সুলতান বললেন, যতক্ষণ না সরাসরি তার সাথে কথাবার্তা হয়, তার থেকে বিষয়টি জানা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন মহান ব্যক্তির সম্মানে তফাৎ আসা চাই না।

কাজি সাহেব যখন সরকারি পয়গাম পেলেন, তখনই তিনি রওয়ানা হয়ে চলে এলেন। দরবারের উপযোগী পোশাক পরিধান করতে গিয়ে বিলম্ব করেননি—পাছে বিলম্বের কোনও অপব্যাখ্যা করা হয়। রাজপ্রাসাদের দরজায় দারোয়ান তাকে বাধা দিল—দরবারি পোশাক না পরে ভেতরে যাওয়া নিষেধ। এদিকে হিংসুকরা সুলতানকে জানাল—ইমামুল হারামাইন আগেই হুকুমের অবাধ্য হয়েছে। এখন আরেকটি গোস্তাখি করেছে—সাধারণ পোশাক পরিধান করে

এবং খেতাব ছিল ইমামুল হারামাইন। ৪১৯ হিজরির ১৮ই মহররম মুতাবিক ১০২৮ খৃস্টাব্দে তার জন্ম হয়। মদিনায় তিনি পাঠ দান করতেন। সেখানে তিনি ফতোয়া লিখতেন। সেখান থেকেই তাকে ইমামুল হারামাইন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নিজামুল মুলক নিশাপুরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তাকে প্রধান মুদারসির হিসেবে নিয়োগ দেন। সকল ধর্মীয় কার্যক্রম, বক্তৃতা ও ফতোয়ার সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। অনেক উঁচু মানের লিখক ও সূফি ছিলেন। ১০৫৮ খৃস্টাব্দ মুতাবিক ৪৭৮ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে নিশাপুরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাজদরবারে এসে গেছে। এ কথা শুনে সুলতানের মন কিছুটা খারাপ হল। তবে তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দেওয়া হল।

প্রধান কাজি দরবারে পৌঁছতেই সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, যেনতেন পোশাকে এলেন কেন? দরবারি পোশাক পরিধান করলেন না কেন?

কাজি সাহেব বললেন, সুলতান! এই সময় আমি যে পোশাকে আছি, সে পোশাকেই সালাত পড়ি। আর তা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হয়। আল্লাহর সামনে যখন এই পোশাকে যাওয়া যায়, তখন আপনার সামনে আসলে দোষ কোথায়? অবশ্য দস্তুর মুতাবিক আমার পোশাক দরবারি পোশাক নয়। তবে এর কারণ গোস্তাখি নয়। বরং আমি ভেবেছি, একটুখানি বিলম্বের অপরাধে ফেরেশতারা আমার নাম নাফরমানদের তালিকায় না লিখে ফেলে, এবং আমার থেকে বাদশাহর বিরোধিতার অপরাধ ঘটে যায়। তাই সে পোশাকে ছিলাম, সে পোশাকেই এসে পড়েছি।

সুলতান বললেন, শাসকের আনুগত্য যখন ইসলামে এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তখন আমার হুকুমের বিরুদ্ধে ঘোষণা দেওয়ার অর্থ কী?

কাজি সাহেব বললেন, যে-সব বিষয় সুলতানের নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোর আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। আর যেগুলো ফতোয়া সম্পর্কিত, সেগুলো বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ, আমাকে জিজ্ঞাসা করা চাই। কারণ, শরিয়তের নির্দেশ মুতাবিক আলেমদের ফতোয়া শাহি হুকুমের সমতুল্য। ইমাম সাহেবের এ কথা শোনার পর সুলতানের রাগ পানি হয়ে গেল। তার সাহসিকতা ও সততার কারণে তিনি তার ওপর খুশি হলেন। ঘোষণা করিয়ে দিলেন, আমার হুকুম মূলত ভুল ছিল। প্রধান কাজি ইমামুল হারামাইনের ফয়সালা সঠিক।

আজও যদি আলেমরা সত্যকথনকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে নেন, তা হলে শাসকরা তাদের সম্মান করতে বাধ্য হবে। আর এভাবে কাজ করতে থাকলে দুনিয়ায় ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।[১২৭]

---

১২৭. নিজামুল মুলক তুসি : ১/১৩৩

বাদশাহর সামনে নির্ভীক বিধবা

সুলতান মালেক শাহ সলজুকি একবার স্পেনের জঙ্গলে শিকার করছিলেন। এক গ্রামে অবস্থান করলেন। সেখানে এক গরিব বিধবা ছিল। তার একটি গাভী ছিল। সে গাভীর দুধ দ্বারা তার তিন বাচ্চার প্রতিপালন হত। সুলতানের লশকররা সে গাভীটি জবাই করে বেশ ধুমধামে ভূরিভোজন করল। গরিব বিধবা তো হতভম্ব হয়ে পড়ল। লশকরদের এই অন্যায়-অত্যাচারে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে এই গরিব বিধবার ফরিয়াদ শোনারও কেউ ছিল না। এই অস্থিরতার মধ্যে তার রাত কাটল।

ভোর হল। তার মনে জাগল, আর কেউ শুনুক বা না শুনুক, বাদশাহ নিশ্চয়ই শুনবেন। জালেমদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই তো আল্লাহ ﷻ এত বড় রাজত্ব তাকে দিয়েছেন। বাদশাহ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু হতাশ হতে হল। পরে জানা গেল, অমুক রাস্তা দিয়ে বাদশাহ শিকারে বেরোবেন। বিধবা পথে একটি পুলের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। বাদশাহ পুলের ওপর এলে বিধবা বৃদ্ধা সাহস করে বলল–

আলেপ্প আরসালের পুত্র! আমার ইনসাফ এই নহরের ওপর করবে, না কি পুলসেরাতের ওপর?

তার এই নির্ভীকতা দেখে বাদশাহর সহচররা হতভম্ব হয়ে গেল। বাদশাহ ঘোড়া থেকে নামলেন। মনে হচ্ছিল, এই বিস্ময়কর ও আশ্চর্য প্রশ্নে বাদশাহ বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

পুলসেরাতের শক্তি আমার নেই। এখানেই আমি ফয়সালা করতে চাই। কী বলতে চাও, বলো!

বৃদ্ধা তার সব কথা শোনাল। লশকরদের এই অন্যায় আচরণে তিনি আফসোস প্রকাশ করলেন। একটি গাভীর পরিবর্তে সত্তুরটি গাভী দেইয়ে দিয়ে তাকে সম্পদশালী করে দিলেন। এরপর যখন বৃদ্ধা বলল যে, তোমার ন্যায়-বিচারে আমি খুশি, আমার আল্লাহও খুশি, তখন গিয়ে বাদশাহ ঘোড়ার উঠলেন।[১২৮]

আহ! কী যমানা ছিল তখন! অভিযোগকারী কত বড় সাহসী ছিল! শ্রবণকারীর মন কত মহান ছিল! আজ যদি কেউ এরূপ কোনও শাসকের সওয়ারি আটকে ফেলে, তার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে শুরু করে, তবে তাকে পাগলা গারদে পাঠানোও বিচিত্র নয়।

১২৮. 'না-কাবেলে ফরামুশ ওয়াকেআত' বইয়ের ২১০ পৃষ্ঠায় 'নিজামুল মুলক তুসি'র দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৮৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকে সামান্য পরিবর্তন করে এখানে উল্লেখ করা হল।

খলিফার জবরদস্তিতে কিছু হলনা

বাদশাহ কোনও সাক্ষী পেলেন না

একবার খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহ কাজি আবু হাজিমের[১২৯] নিকট সংবাদ পাঠালেন, অমুক ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে লোকজন দাবি করে তাদের মাল নিয়ে নিয়েছে, তার নিকট আমারও কিছু পাওনা আছে। আমাকে একজন বাদী ধরে নিয়ে আমার দাবির ওপর চিন্তা করে আমার অংশও আমাকে পাইয়ে দেওয়া হোক।

জবাবে কাজি বললেন, কাজির দায়িত্ব আমার মাথার ওপর রেখে আপনি বলছেন যে, সাক্ষী ছাড়াই আপনার দাবি মেনে নেব। এটা কীভাবে হতে পারে? আপনি সাক্ষী পেশ করুন!

খলিফা সংবাদ পাঠালেন, অমুক অমুক হল আমার দুজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। কাজি জবাব দিলেন, আপনার নিকট নির্ভরযোগ্য হতে পারে। তবু যে পর্যন্ত না আমি যাচাই করে দেখব যে, এরা সাক্ষী দেওয়ার যোগ্য কি না, সে পর্যন্ত আপনার দাবি মানতে পারছি না, এবং তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে পারছি না। খতিবে বাগদাদি এবং ইবনে আসাকের তার কথাটা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন–

'ওরা দুজন আমার নিকট আসুক। আমি অনুসন্ধান করে দেখব। যদি তারা সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হয়, তা হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেব। অন্যথায় আমার নিকট যা প্রমাণিত, তদানুসারে ফয়সালা করব।'

১২৯. আবু হাজেম আহমদ বিন মুহাম্মদ কাজি বাগদাদের হাউজ দাউদ মহল্লায় থাকতেন। ৩১৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আবু হাজেম [তাবে'য়ি]-র সূত্রে আবু হুরায়রা ﵁ হতে হাদিস বর্ণনা করেন, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'জান্নাতের প্রতিটি গাছের শাখা হবে স্বর্ণের।' [তারিখে বাগদাদ : ৫/১০৮]

খলিফার সাক্ষীরা যখন শুনল—আদালতে আমাদেরকে খুব জেরা করা হবে, তখন তারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে বসল। কাজি আবু হাজেম খলিফার মুকাদ্দমা খারিজ করে দিলেন। খলিফা কিছুই পেলেন না।[১৩০]

[১৩০] তারিখুল খুলাফা, জালালুদ্দিন সুয়ুতি : ৩২৩

ইনসাফের একটি বিস্ময়কর ঘটনা

সুলতান আজদুদ্দৌলাকে[১৩১] এক গোয়েন্দা পুলিশ সংবাদ দিল, প্রধান কাজির নিকট এক ব্যক্তি বিশ হাজার দিনার আমানত রেখেছিল। সে ব্যক্তি হজ্জের পর রোমীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়েছিল। সেখানে সে আহত হয়ে বন্দী হয়েছিল। চার বছর পর সে মুক্তি পেয়েছিল। আর দশ বছর পর যখন সে শহরে ফিরে এল এবং কাজি থেকে তার আমানত ফেরত চাইল, তখন কাজি তাকে চিনতেই অস্বীকার করে বসল। শুধু তা-ই নয়, বরং বলেছে, বেশি বিরক্ত করলে পাগল সাব্যস্ত করে পাগলা গারদে ফেলে রাখব। সারা জীবন সেখানেই বসে বসে পঁচবে।

ওই ব্যক্তিকে ডেকে এনে সুলতান সব কথা শুনলেন। তার খরচের জন্য দু'শ দিনার দিয়ে বললেন, যখন তোমাকে ডাকব, তখন যেখানে এবং যে অবস্থায়ই থাকবে, সাথে সাথে চলে আসবে।

তার যাওয়ার পর সুলতান আজদুদ্দৌলা কাজিকে পরীক্ষার জন্য একদিন নির্জনে ডাকলেন। রাজপুত্র এবং রাজকন্যাদের আলোচনা

[১৩১] হিজরির চতুর্থ শতাব্দীতে আব্বাসি খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এল্লা-আশারিয়ার বুওয়াইয়া পরিবারের সদস্য নায়েবুসসুলতানাত এবং সুলতান হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। ৩৬৪ হিজরিতে আজদুদ্দৌলা বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলিফা তায়েউ'লিল্লাহকে [৩৬৩ হি.-৩৮১ হি.] বাগদাদ ফিরিয়ে এনে বাইয়াত করেন। ৩৬৬ হিজরিতে তার পিতা রুকনুদ্দৌলার মৃত্যুর পর [যিনি তখন খোরাসানে অবস্থান করছিলেন,] তার জায়গায় বসেন। বাগদাদে তার নামে খুতবা পড়া হত। ৩৭২ হিজরিতে আজদুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। [দেখুন, তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/১১১২-১১১৪]

তুললেন। বললেন, জীবনের তো কোনও ভরসা নেই। রাজপুত্রদের ব্যাপারে আমি ভয় করছি, তারা হয়ত তাদের বোনের নির্ধারিত অংশ দেবে না। তাই আমার ইচ্ছা, আপনার মত মুত্তাকি এবং দীনদারের নিকট কিছু হীরা-জহরত এবং নগদ অর্থ আমানত রাখি। যেন আমার মৃত্যুর পর, রাজপুত্ররা যদি তাদের বোনদের নির্ধারিত অংশ না দেয়, আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন, এবং তাদেরকে এই আমানত দিতে পারেন। এর জন্য আপনি মাটির নীচে একটি গর্ত করুন। বিষয়টি আমি, আপনি এবং একমাত্র আল্লাহই জানবেন, যিনি মানুষের মনের খবর জানেন।

মাটির নীচে গর্ত করার জন্য তাকে দু'শ দেরহাম দিয়ে বিদায় করলেন।

মনে মনে খুশি হয়ে কাজি সাহেব বিদায় হলেন—বুড়োকালে আল্লাহ ﷻ আমার কথা শুনলেন। এত বিশাল সম্পদ বিনা শ্রমে লাভ হতে যাচ্ছে, যার আশাও মনে ছিল না। বিশ হাজার দিনারও ঘরে বসে বসে পাওয়া গেছে। আর আজদুদ্দৌলা মারা যাওয়ার পর এই জাওহার ও খাজানা, সবই আমার। এর কোনও কাগজ হবে না, কোনও সাক্ষীও থাকবে না।

মাটির নীচে গর্ত করে কাজি সাহেব সুলতান আজদুদ্দৌলাকে সংবাদ দিলেন। সুলতান দিনার দিয়ে একশ' চল্লিশটি সিন্দুক পূর্ণ করলেন। কয়েকটির মধ্যে ইয়াকুত ও ফিরোজা ভরে আগে থেকেই খাজানায় রেখে দিয়েছিলেন। কাজিকে ডেকে এনে সেগুলো দেখালেন। সেগুলো দেখে তো কাজি বেহাল। সুলতান বললেন, আজ রাতের মধ্যে এগুলো আপনার নিকট পৌঁছে যাবে। এ কথা বলে তাকে বিদায় দিলেন।

এরপর ওই মজলুমকে ডেকে বললেন, আজ কাজির নিকট যাও। তার থেকে শক্তভাবে তোমার দিনার দাবি করো। না দিলে বলবে, আমি সুলতানের নিকট অভিযোগ করব। তিনি আপনার ইজ্জত ধূলোয় মিশিয়ে আমার অর্থ আমাকে পাইয়ে দেবেন।

সে ব্যক্তি কাজির নিকট গিয়ে সুলতানের পরামর্শমত শক্তভাবে তার আমানত দাবি করল। কাজি ভাবল, যদি এই দুর্ভাগা শোরগোল বাঁধিয়ে

দেয়, তা হলে তো বাদশাহর কানে কথাটা যাবে। অথচ আজই সুলতানের অর্থ আমার হাতে আসছে। বিশ হাজার দিনারের কারণে লাখ লাখ দিনার মূল্যের অলংকার এবং নগদ অর্থ আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। অবিশ্বাস-অপমান তো সাথে আছেই।

এ ভেবে কাজি তার সব অর্থ তাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তা তোমার লাভের জন্যই ছিল। এখন যখন তুমি ধৈর্য ধরতে পারছ, তখন তোমার অর্থ তুমি নিয়ে যাও। মাল তো তোমারই।

সে ব্যক্তি দিনার নিয়ে সোজা আজদুদ্দৌলার নিকট গেল।

আজদুদ্দৌলার জানা হয়ে গেল—আসলেই কাজি খেয়ানত করেছে। যদি তার এসব হীরা জাওহারের লোভ না হত, তা হলে মোটেই আমানত ফিরিয়ে দিত না। তিনি কাজির সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন। কাজির পদ থেকে তাকে অপসারণ করে দিলেন। তার বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তাকে ততটা শাস্তি দেননি।[১৩২]

---

১৩২. দেখুন, নিজামুল মুলক তুসি : ২/২৬২

হকপন্থী দরবারি

খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহর জন্ম ২৪২ হিজরিতে। আর ক্ষমতার লাগাম হাতে নেন ২৭৯ হিজরিতে। রাগের সময় তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারতেন না। কাউকে ক্ষমা করতেন না। বরং অপরাধীদের জীবিত অবস্থায় প্রাচীরের সাথে সেঁটে দিতেন। তাই তার ভয়ে তার শাসনকালের দশ বছরে কোনও ফিতনা মাথা চাড়া দিতে করেনি। রাজ্যে পুরো শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল।

২৮৪ হিজরিতে খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহ ইচ্ছা করলেন–মিম্বরের ওপর বসে আমির মুআবিয়াকে লা'নত করা যাক। তার উজির আব্দুল্লাহ নিষেধ করলেন। বললেন, ঘুমিয়ে থাকা ফিতনা জাগিয়ে তোলা ঠিক হবে না। মানুষের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। তখন তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু খলিফা উজিরের কথায় কর্ণপাত করলেন না। হুকুম জারি করে দিলেন, যতটুকু সম্ভব, আলী রাযি.র গুণকীর্তন গাওয়া হোক, এবং মুআবিয়ার নিন্দা করা হোক।

কাজি ইউসুফ যখন শুনলেন তখন দৌড়ে এলেন। যদিও জানতেন, খলিফা যখন উজিরের কথাই শুনলেন না, তখন তার কথাও রাখবেন না। কিন্তু যেহেতু এই নির্দেশের ফল দেশ ও জনগণের জন্য মন্দ হবে, তাই তিনি খলিফাকে বলেই দিলেন, আপনি এমন একটা ভুল করছেন, যার সংশোধন পরে আর সম্ভব হবে না। চারিদিকে আগুন লেগে যাবে, কিন্তু নেভানো যাবে না। খলিফা বললেন–

জনগণের মধ্যে যদি আগুন লেগে যায়, তা হলে তলোয়ারের পানি ঢেলে দেব।

কাজি ইউসুফ আবারও বললেন, উত্তেজনা, ক্রোধ এবং জিদের সময় এটা নয়। অযথাই সুলতানতকে বিপদে ফেলা হচ্ছে।

এ কথা শুনে খলিফা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, এবং নিজের জারিকৃত হুকুম রহিত করে দিলেন।[১৩৩]

---

১৩৩. দেখুন, তারিখুল খুলাফা, ইমাম সুয়ুতি : ৩২০-৩২২

-ঘুষখোর কাজির শাস্তি প্রদান

ঘুষখোর কাজির শাস্তি

মুতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ ছিলেন আব্বাসি শাসক। তার শাসনকাল ছিল ২৩২ হিজরি হতে ২৪৭ হিজরি পর্যন্ত। তার নাম ছিল জাফর আবুল ফজল বিন মু'তাসিম বিন হারুন রশিদ। তার মায়ের নাম ছিল সুজা'। তার জন্ম ২০৫ কিংবা ২০৭ হিজরিতে। খেলাফত পাওয়ার পর তিনি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে উদারহস্তে তাদের সাহায্য করতে থাকেন। মুহাদ্দেসিনে কিরামের সম্মান-প্রদর্শনে কোনওরূপ ত্রুটি রাখেননি। এমনকি, ইতিহাসে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে যে, তিনজন খলিফার অমর কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত।

একজন হলেন আবু বকর ﵁। তিনি মুরতাদদের দমন করেন।

দ্বিতীয়জন হলেন উমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি জুলুম-অত্যাচার দূর করেন।

আর তৃতীয়জন হলেন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ। তিনি জাহমিয়্যাদের প্রভাব দূর করে সুন্নাত জিন্দা করেন।

২৩৪ হিজরি সালে দামেশকে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এতে বিশাল বিশাল প্রাসাদও ভেঙ্গে মাটিতে মিশে যায়। পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা যায়। ২৩৬ হিজরি সালে তিনি হুসাইন রাযি.র আলীশান কবর এবং তার আশপাশের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেন। এর যিয়ারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

মুতাওয়াক্কিলের কালে মিশরের প্রধান কাজি ছিল আবু বকর মুহাম্মদ বিন আবুল্লাইস। বড়ই জালেম এবং কঠোর ছিল। ঘুষখোরও ছিল। ইনসাফ না পেয়ে জনসাধারণ তার থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। মিশরের শাসকের নিকট এ অভিযোগ তোলা হলে তিনি তা ভ্রুক্ষেপ

করলেন না। শাসকের অবহেলা এবং কাজির জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কয়েকজন লোক খলিফার দরবারে গেল। খলিফা মনোযোগ দিয়ে তাদের সব কথা শুনলেন। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে, লোকজন আসলেই তার থেকে অতিষ্ট, তখন তিনি কাজিকে এমন কঠোর শাস্তি দিলেন যে, বহু বছর ধরে তা একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে আলোচিত ছিল। কাজির দাড়ি মুণ্ডন করে তাকে গাধার ওপর সওয়ার করানো হল। এরপর সারা শহরে ঘুরিয়ে আনা হল। আর প্রতিদিন বিশটি করে বেত্রাঘাত করা হল। আর তার জায়গায় হারেস বিন সিক্কিন মালেকিকে মিশরের কাজি নিয়োগ করা হল।[১৩৪]

১৩৪. দেখুন, তারিখুল খুলাফা, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি : ৩০১-৩০২

এক কয়েদির সত্যকথন

খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহ হারুন বিন মু'তাসিম বিল্লাহর জন্ম হয় ১৯৬ হিজরিতে। তিনি ২২৭ হিজরি থেকে ২৩২ হিজরি পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সে-কালের সবচেয়ে বড় ফিতনা ছিল খলকে-কুরআনের মাসয়ালা। এটাকে খলিফা তার আমিত্বের মাসয়ালা বানিয়ে রেখেছিলেন। এর জন্য অসংখ্য আলেমকে শহিদ করা হয়েছিল এবং অসংখ্য লোক কয়েদ হয়েছিল।

২৩১ হিজরিতে তিনি মিশরের গভর্নরকে নির্দেশ লিখে পাঠালেন যে, মসজিদের ইমাম-মুআয্যিনদের পরীক্ষা নাও–খলকে কুরআনের ব্যাপারে তারা কী বলে। ওই বছর ওয়াসেক বিল্লাহ ষোল শ' কয়েদিকে রোমের কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে আনেন। হুকুম দিলেন, যে কয়েদি খলকে কুরআনের মাসয়ালা মেনে নেবে, তাকে দু' দিনার দিয়ে বিদায় করো। আর যে মানবে না, তাকে যিন্দানখানায় রাখো।

খলিফার পক্ষ থেকে এ কাজের দায়িত্বে ছিল আহমদ বিন আবু দাউদ। খলকে কুরআনের বিষয়টি মানতে নরমে-গরমে সে লোকদের উৎসাহী করবে। যারা মানবে তারা পুরস্কৃত হবে। আর যারা মানবে না, তারা শাস্তি ভুগবে।

সে লোকদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করল, তারা যেন তা মেনে নেয়।

রোমের জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়া এক কয়েদি এলেন। পায়ে জিঞ্জির। খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহর দরবারে তাকে উপস্থিত করা হল। ইনি খলকে-কুরআন মানতেন না। আহমদ বিন আবু দাউদও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাকে লক্ষ করে কয়েদি বললেন–

'এই মতের ব্যাপারে আমাকে বলো [যা তোমাদের মত যে, কুরআন মাখলুক,] যার দিকে তোমরা লোকদের [জোর করে এবং লোভ দেখিয়ে] ডাকছ, রাসুল ﷺ-ও কি তা জানতেন? আর জেনেও কি তিনি লোকদের এদিকে ডেকেছেন? না কি এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর জানাই ছিল না?'

আহমদ বিন আবু দাউদ বলল, রাসুল ﷺ তা জানতেন। কয়েদি বললেন, যে কাজ রাসুল ﷺ করেননি, সেকাজ তোমরা কেন জায়েয মনে করছ? [লোকদের ওপর জবরদস্তি করছ।]

এ কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহ হাসতে লাগলেন। মুখের ওপর হাত রেখে মহলের ভেতর চলে গেলেন। বিছানার ওপর শুয়ে বললেন, যে কাজ রাসুল ﷺ নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন, সেটাকে আমরা জায়েয বলছি। আর যে বিষয়ে রাসুল ﷺ নীরব ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা কঠোরতা করছি।

কয়েদিকে তিন শ' দিনার দিয়ে তাকে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এর পর থেকে এ ব্যাপারে তিনি কাউকে কষ্ট দেননি। বরং ওই দিন থেকে আহমদ বিন আবু দাউদের ওপর তার অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

যে কয়েদির কথা বলা হল, তার নাম আবু আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ আযরমি। ইনি ছিলেন ইমাম আবু দাউদ رحمه الله এবং ইমাম নাসাঈ رحمه الله-র উস্তাদ।[১৩৫]

---

১৩৫. দেখুন, তারিখুল খুলাফা, ইমাম সুয়ুতি রহ. : ২৯৭

উমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে আবু বকর (রা.)-ফয়সালা দেন

উমর (রা.)-র বিরুদ্ধে আবু বকর (রা.)-র ফয়সালা

উমর (রা.)-র এক স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা। তার আগের নাম ছিল আছিয়া। আছিয়া শব্দের অর্থ হল অবাধ্য; নাফরমান। রাসুল ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যে নামের অর্থ ভাল নয়, এমন নামের কোনও পুরুষ বা নারী তার নিকট এলে তিনি তার নাম পাল্টে রাখতেন। তাই আছিয়া নামটি বদল করে তিনি তার নাম রাখলেন জামিলা। উমর (রা.)-র পুত্র আসেম ছিলেন তারই গর্ভের। কোনও কারণে এই স্ত্রীকে তিনি তালাক দেন। তখন আসেম ছোট ছিলেন।

তখন ছিল আবু বকর (রা.)-র খেলাফতের যুগ। আগে উমর (রা.) কোবায় বসবাস করতেন। পরে মদিনায় স্থানান্তর হন। একদিন তিনি কোবার দিকে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন, তার পুত্র আসেম বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছে। পুত্রকে দেখে পিতার স্নেহ জেগে উঠল। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। ঘোড়ার ওপর উঠিয়ে নিলেন। সাথে নিয়ে যাবেন। এদিকে কোনওভাবে জামিলা তা জানতে পারলেন। দৌড়ে এসে উমর (রা.)-র ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। বললেন, আসেম আমার কলিজর টুকরো। একে আমি আমার সাথেই রাখব। আপনি তাকে নিতে পারেন না।

কিন্তু উমর (রা.) ছাড়তে রাজি নন—আসেমকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। কথা কাটাকাটি হল। অবশেষে আবু বকর (রা.)-র নিকট মামলাটি গেল। উভয়পক্ষই নিজ নিজ সমর্থনে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন

করল। আমিরুল মুমেনিন মনোযোগ দিয়ে তা শুনলেন। ফয়সালা শোনালেন, আসেম তার মায়ের সাথেই থাকবে।

উমর (রা.) ফয়সালা শুনলেন। তার বিরুদ্ধে ফয়সালা হয়েছে। তিনি নতশিরে তা মেনে নিলেন। আসেমকে তার মায়ের নিকট ছেড়ে দিলেন।[১৩৬]

---

১৩৬. আল-ফারুক উমর ইবনুল খাত্তাব সানিল খুলাফায়িররাশেদিন, মুহাম্মদ রেজা : ১২

জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঝলসে দিত

বদরি সাহাবি আবু মাসউদ رضي الله عنه-র বর্ণনা। তিনি বলেন, একবার রাগে এসে আমি আমার গোলামকে কোড়া দিয়ে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছন থেকে আওয়াজ এল–

'আবু মাসউদ! জেনে রাখো, তুমি তোমার গোলামের ওপর যতটা শক্তি রাখো, তোমার ওপর আল্লাহ ﷻ তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখেন।'

রাগের মাথায় ছিলাম। তাই আওয়াজটা কার ছিল, ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। পিছন দিকে ফিরে দেখলাম–রাসুল ﷺ। কথাটা তারই ছিল। তাকে কাছে আসতে দেখে আমি হাত থেকে কোড়া ফেলে দিলাম। আরজ করলাম– 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর ওয়াস্তে সে আমার পক্ষ থেকে আজাদ।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসুল ﷺ-এর সামনে আবু মাসউদ রাযি. এ ওয়াদাও করেছিলেন– 'আজকের পর আমি আর কোনও গোলামকে প্রহার করব না।'

রাসুল ﷺ বললেন– 'তুমি যদি তোমার গোলামকে আজাদ না করতে, তা হলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঝলসে দিত। [কিংবা বলেছেন,] স্পর্শ করত।'

এর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, গোলামদের আজাদ করার জন্য রাসুল ﷺ কতটা উত্তম আহকাম শুনিয়েছেন।[১৩৭]

---

১৩৭. মুসলিম : হাদিস ১৬৫৯

আমি তো ল্যাংড়া হয়ে গেলাম

আমর বিন শুআইব رحمه الله-র বর্ণনা। একব্যক্তির পায়ে তার এক সাথি বল্লম দিয়ে আঘাত করল। সে আহত হল। রাসুল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হল–হে আল্লাহর রাসুল! আমার ওপর যে জুলুম হয়েছে, আপনি সেটার বদলা দেইয়ে দিন। রাসুল ﷺ বললেন– 'তোমার ক্ষত ঠিক হওয়ার আগে বদলা নেওয়ার ব্যাপারে জলদি কোরো না।'

কিন্তু সে ব্যক্তি বদলা নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার পীড়াপীড়ি দেখে রাসুল ﷺ তার থেকে বদলা নেওয়ার অনুমতি দিলেন। সে-ব্যক্তি তার সাথি থেকে বদলা নিতে চেষ্টা করল। ঘটনাক্রমে তার সাথি সুস্থ-সবল থাকল। কিন্তু এ ব্যক্তি ল্যাংড়া হয়ে গেল। [যে বদলা নিতে চেয়েছিল, উল্টো তারই ক্ষতি হল।] সে আবার রাসুল ﷺ-এর দরবারে হাজির হল। বলল– 'আমি তো ল্যাংড়া হয়ে গেলাম; কিন্তু আমার সাথি সম্পূর্ণ ঠিক আছে।'

তখন রাসুল ﷺ বললেন– 'আমি তোমাকে বলেছিলাম না, তোমার ক্ষত ঠিক হওয়ার আগে [তোমার সাথি থেকে] বদলা নিয়ো না। কিন্তু তুমি তো আমার কথা শুনতে চাইলে না। তাই আল্লাহ ﷻ তোমার সঠিক বদলা নেওয়া থেকে তোমাকে দূরে রেখেছেন, এবং তোমার হক নষ্ট হয়ে গেছে।'

এ ঘটনার পর রাসুল ﷺ ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন যে, যতক্ষণ না আহত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রতিপক্ষ থেকে বদলা নেবে না।[১৩৮]

---

১৩৮. ঘটনাটি মুসান্নাফে আব্দিররাজ্জাক : ৯/৪৫৪, দার কুতনি : ২/৮৮, মুসনাদে আহমদ : ২/১৭, মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ : ৬/২৯৬ প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। দেখুন, আকযিয়াতুররাসুল : ১/১৫০

ইয়াহুদিদের কূটচাল এবং রাসুল ﷺ- এর ফয়সালা

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা ؓ। ইয়াহুদিদের এক পুরুষ এক নারীর সাথে ব্যভিচার করল। ইয়াহুদিরা পরামর্শ করল, এর ফয়সালা আমরা ওই নবীর [মুহাম্মদ ﷺ] দ্বারা করাই না কেন? কারণ, তাকে তো দয়ালু ও স্নেহ-পরায়ণ করে পাঠানো হয়েছে। তিনি যদি প্রস্তারাঘাতের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি নির্ধারণ করে দেন, তা হলে আমরা তা মেনে নেব। আর আল্লাহ ﷻ-র নিকট প্রমাণ হিসেবে বলব যে, তোমার এক নবীর ফয়সালাই তো আমরা কার্যকর করেছি। [তা হলে আমরা আল্লাহ ﷻ-র আযাব থেকে বেঁচে যাব।]

তারা তাদের হিলাবাহানার চক্রান্ত নিয়ে রাসুল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল। তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। তারা নবীজি ﷺ-র নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল—'হে আবুল কাসেম! ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কী?'

রাসুল ﷺ তাদের কথার কোনও জবাব দিলেন না। তাদের কিছু না বলে তাদেরই একটি পাঠকেন্দ্রে গেলেন। সেখানে তাওরাতের তালিম হত। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি তাদের লক্ষ করে বললেন—

'আমি তোমাদের সেই আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মুসা (আ.)-র ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন, বিবাহিত নর-নারী যদি ব্যভিচার করে, তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাওরাতে কী লেখা আছে?'

ইয়াহুদি আলেমরা জবাব দিল, যিনাকারের মুখে কালি মেখে দেওয়া হবে; তাদেরকে গাধার ওপর উঠিয়ে একজনকে আরেকজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বেঁধে পুরো শহরে চক্কর দেওয়া হবে, এবং কোড়া মারা হবে।

ইয়াহুদি আলেমদের থেকে এক যুবক নীরবে সব শুনছিল। তাকে নীরব দেখে রাসুল ﷺ শক্তভাবে তাকে কসম দিয়ে ব্যভিচারের শাস্তি জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, তাই বলছি। প্রকৃত ব্যাপারটা হল, তাওরাতে আমরা তাদের ব্যাপারে রজমের [প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর] বিধান পাচ্ছি।

যুবকের কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন—

'কখন থেকে তোমরা আল্লাহ ﷻ-র বিধানকে সহজ করে দিয়েছ?'

জবাবে যুবক বলল—

'আমাদের বাদশাহদের এক আপনজন ব্যভিচার করল। বাদশাহ তাকে রজম করেননি। পরে প্রজাদের থেকে একজন এই পাপে লিপ্ত হল। তখন বাদশাহ তাকে রজম করতে চাইলেন। এতে এই ব্যক্তির গোত্রের লোকজন বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল, তুমি আমাদের লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত রজম করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার আত্মীয়কে রজম করো। তার উভয়পক্ষ পরস্পরে মিলে এই শাস্তির ওপর একমত হয়।'

এ কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন—

'তাওরাত অনুযায়ীই আমি ফয়সালা করব।'

এরপর তিনিও ওই দুইজনকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তার নির্দেশে তাদের প্রস্তারাঘাতে মারা হয়।[১৩৯]

এক বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে উমর ؓ বলেন—

'[যখন রাসুল ﷺ রজম করার নির্দেশ দিলেন, তখন] দেখতে পেলাম, ওই পুরুষটি মহিলাটির সামনে ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষা করছে।'[১৪০]

---

১৩৯. আবু দাউদ : হাদিস ৪৪৫০

১৪০. বুখারি : হাদিস ১৩২৯, ১৩৩৫ ; মুসলিম : হাদিস ১৬৯৯ ; আবু দাউদ : ৪৪৪৬

কাউকে উপহাস কোরো না

বাদশাহ হারুন রশিদের নিকট একবার ইমাম কাসাঈ ﷬ এবং ইয়াজিদ একসাথে বসা ছিলেন। মাগরিবের সালাতের সময় হলে তারা ইমাম কাসাঈ ﷬-কে সালাত পড়ানোর জন্য এগিয়ে দিলেন। ইমাম কাসাঈ ﷬ ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ সাত ক্বারীর একজন। সালাত শুরু করলেন। কিন্তু কী কারণে যেন তার ওপর আতঙ্ক ভর করল। সূরা কাফেরুন পড়তে গিয়ে ভুল করে বসলেন। সালাম ফেরানোর পর ইয়াজিদ বললেন, আর্শ্চর্য্যের ব্যাপার! কূফার শ্রেষ্ঠ ক্বারী এবং ইমাম থেকে সূরা কাফেরুনে ভুল হয়ে গেল! এই সূরাটিও তিনি ঠিকভাবে পড়তে পারলেন না!

কিছুক্ষণ পর ইশার সালাতের আজান হল। এবার ইমামতির জন্য দাঁড়ালেন ইয়াজিদ। তার ওপরও কেন যেন আতঙ্ক ভর করে বসল। তিনি সূরা ফাতেহা ভুল করে বসলেন। কিছুটা ভুলেও গেলেন; আর যের-যবরের ভুল করলেন কিছুটা।

সালাম ফেরানোর পর ইমাম কাসাঈ ﷬ বলে উঠলেন–

'জিহ্বা সামলে রেখো! এমন কথা বের করো না, যার ফলে পরীক্ষার সম্মুখীন হও। মানুষের পরীক্ষার সম্পর্ক জিহ্বার সাথে।'

মিথ্যা মুকাদ্দমা

মারওয়ান বিন হাকামের শাসনকালের ঘটনা। আরওয়া বিনতে উয়াইস নামের এক মহিলা সাঈদ বিন যায়দ ﷺ-র বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করল। সাঈদ বিন যায়দ ﷺ ছিলেন আশারায়ে-মুবাশ্শারার একজন। মুকাদ্দমাটি ছিল, সাঈদ ﷺ নাকি ওই নারীর একটি জমিন অন্যায়ভাবে কব্জা করে নিয়েছেন। মুকাদ্দমা মারওয়ানের সামনে পেশ হল। তিনি যথাযথ সম্মান সহকারে সাঈদ ﷺ-র ডেকে পাঠালেন। তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। মুকাদ্দমা উপস্থাপন হলে তিনি বললেন–

'আমি তার জমিন অন্যায়ভাবে কব্জা করব, অথচ আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি।'

মারওয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসুলের সাহাবি! বলুন, আপনি রাসুল ﷺ থেকে কী শুনেছেন?

তিনি বললেন, রাসুর ﷺ ইরশাদ করেছেন–

'যে ব্যক্তি অন্য কারও এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও অন্যায়ভাবে কব্জা করে নেয়, কিয়ামতের দিন সাত জমিনককে বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'[১৪১]

মারওয়ান বললেন, এই হাদিস শোনার পর কোনও দলিল বা সাক্ষী-প্রমাণের দরকার নেই। মুকাদ্দমা খারিজ করে দিলেন। ফয়সালা দিলেন, সাঈদ বিন যায়দ ﷺ-র ওপর মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

---

১৪১. বুখারি : ৩১৯৮

সাঈদ বিন যায়দ ؓ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সাহাবি। তার জীবনের শেষপ্রান্তে তাকে অবমাননা করা হয়েছে–তাকে আদালতে তলব করা হয়েছে। আসমানের দিকে হাত তুলে তিনি দোয়া করলেন–

'হে আল্লাহ! এই মহিলা যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, তা হলে তাকে অন্ধ করে দাও, আর তাকে তারই জমিনে ধ্বংস করে দাও।'

মৃত্যুর আগে ওই মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন নিজের জমিনের ওপর চলছিল। হঠাৎ একটি কুয়োয় পড়ে সেখানেই মারা গেল।

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা

ঘটনাটি ইবনে আব্বাস[১৪২] ؓ হতে বর্ণিত। একব্যক্তি উমর ؓ-র দরবারের অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিলেন। সে-ব্যক্তি বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে দান করেন না। আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ করেন না। এ কথা শুনতেই উমর ؓ প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন। তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হুরর বিন কায়স বললেন, আমিরুল মুমেনিন! আল্লাহ ﷻ তার নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে বলেছেন–

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

'তুমি ক্ষমার গুণ গ্রহণ করো; ভাল কাজের তালিম দাও, এবং জাহেলদের থেকে দূরে থাকো।' [সূরা আরাফ : ১৯৯]

আর এ হল জাহেল। তার কথা শুনে উমর ؓ-র ক্রোধ কমল।

---

১৪২. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ ছিলেন নবীজি ﷺ-এর চাচাত ভাই এবং খালেদ বিন ওলিদ ؓ-র খালাত ভাই। শো'আবে আবু তালেবে তার জন্ম হয়। তার মুখে সর্বপ্রথম নবীজি ﷺ-র মুখেল লালা দেওয়া হয়। নবীজি ﷺ-র পাশে তিনি হযরত জিবরাইল ؑ-কে দেখতে পান। ইবনে আব্বাস ؓ ছিলেন তাফসির-বিশারদ, হাদিসের রাবি, খলিফাত্রয়ের বিচারের রহস্যবিদ, ফকিহ, কবিতা ও সাহিত্য-পারদর্শী, অংকশাস্ত্র, ফরায়েজশাস্ত্র এবং আরবদের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানী। এই কারণে তাকে 'হিবরুল উম্মাহ' বলা হয়। হযরত আলী ؓ তাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। সিফফিনের যুদ্ধের সময় তিনি চতুর্থ খলিফার সঙ্গী ছিলেন। ৬৮ হিজরিতে তিনি তায়েফ মৃত্যুবরণ করেন। [উসদুল গাবা : ৩/২৯০-২৯৪]

ফয়সালা শোনাতে জলদি কোরো না

ইমাম শা'বি[১৪৩] ﷺ বলেন–

আমি কাজি শুরাইহ-র নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল। স্বামী ছিল ঘরের বাইরে। মহিলাটি অজোরে কাঁদছিল। আমি কাজি শুরাইহকে বললাম– আল্লাহ ﷻ আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন! আমার ধারণা, এই মহিলার ওপর জুলুম হয়েছে। তার অধিকার লুণ্ঠিত হয়েছে।

কাজি শুরাইহ জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দলিলের ভিত্তিতে তুমি এই মহিলাকে মজলুম বলে ধারণা করছ?

আমি বললাম, তার অজোরে ক্রন্দন এবং তার চোখের পানি দেখে।

কাজি শুরাইহ বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত বিষয় উদ্‌ঘাটন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফয়সালা শুনিয়ো না। কারণ, ইউসুফ ﷺ-র ভায়েরা যখন তাদের পিতার নিকট গিয়েছিল, তখন তারাও অজোরে কাঁদছিল। তাদের চোখ থেকেও পানি ঝরছিল। অথচ তারা ইউসুফ ﷺ-র ওপর জুলুম করেছিল।

১৪৩.আবু আমর আমের বিন শুরাহিল আশ্‌শা'বি ছিলেন দক্ষিণ আরবের গোত্র হামদানের শাখা গোত্র শা'বের। তিনি ১৯ হিজরি মুতাবিক ৬৪০ ঈশাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্দুর রহমান বিন আশ'আসের বিদ্রোহে অংশ নেন। এরপর হাজ্জাজের প্রতিশোধ থেকে বাঁচার জন্য কুতাইবা বিন মুসলিমের নিকট ফারগানায় চলে যান। হাজ্জাজ থেকে ক্ষমা পেলে খলিফা আব্দুল মালেক তাকে দামেশকে ডেকে পাঠান এবং তাকে দূত হিসেবে কুস্তুন্তুনিয়া প্রেরণ করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। ১১০ হিজরি মুতাবিক ৭২৮ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [উর্দু দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া : ১১/৭৩৯-৭৪১]

মালে- ফিদাকের মুকাদ্দমা সাফফাহ- র দরবারে

সাফ্‌ফাহ[১৪৪] ছিলেন খেলাফতে আব্বাসির প্রথম খলিফা। তার জন্ম ১০৮ হিজরিতে। তার হাতে বায়আত হয় কূফায়। মুসনাদে আহমদ-সহ অন্যান্য কিতাবে আবু সাঈদ খুদরি ﷺ-র সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত আছে–

'কিছু কাল পর যখন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তখন আমার আহলে-বাইতে এক ব্যক্তির জন্ম হবে। তার নাম হবে সাফ্‌ফাহ। সে লোকদের অঢেল পরিমাণে দান করবে। [অর্থাৎ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে।]'[১৪৫]

ইবনে আরাবি ﷺ বলেন, খলিফা সাফ্‌ফাহ তার খেলাফতকালের প্রথম খুতবা দিয়েছিল আব্বাসিয়া নামক একটি গ্রামে। খুতবা দেওয়ার

---

১৪৪. আবু আব্বাস আব্দুল্লাহ সাফ্‌ফাহ বিন মুহাম্মদ বিন আলী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.র প্রপৌত্র। উমাইয়্যা শেষ খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের হত্যার পর ১৩২ হিজরি মুতাবিক ৭৫০ খৃস্টাব্দে আব্বাসির খেলাফতের সূত্রপাত হয়। আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান কৃতিত্ব ছিল আবু মুসলিম খোরাসানির। ফরগানা এবং শাশে আক্রমণকারী চীনের এক লক্ষ সৈনিকের মুকাবিলা করার জন্য তিনি যিয়াদ বিন সালেহকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার চীনা সৈন্য মারা যায় এবং বিশ হাজার বন্দী হয়। ১৩৬ হিজরির যিলহজ্জ মাস মুতাবিক ৭৫৪ খৃস্টাব্দে সাফ্‌ফাহ মৃত্যুবরণ করেন। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ৮৪৭-৮৫৩]

১৪৫.মুসনাদে আহমদ : ৩/৮০ ; দালায়েলুন্নাবুওয়্যাহ, বায়হাকি : ৬/৫১৪ ; তারিখে বাগদাদ : ১০/৪৮ ; কানজুল উম্মাল : হাদিস ৩১০৩৯

সময় আবু তালেবের সন্তানদের থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তার গলায় কুরআন ঝুলানো ছিল। 'তারিখুল খুলাফা' অনুসারে তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন হাসান। সে উঠে খলিফাকে লক্ষ করে বলল–

'আপনি যে আল্লাহ ﷻ-র কথা বলছেন, আমি সেই আল্লাহ ﷻ-র কথাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি–আমার মুকাদ্দমাটি আপনি ইনসাফ মুতাবিক সমাধান করুন, এবং এই কুরআন মুতাবিক ফয়সালা করুন!'

খলিফা সাফ্ফাহ জিজ্ঞাসা করলেন– 'কে তোমার ওপর জুলুম করেছে?'

সে বলল– 'সেই আবু বকর, যিনি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ-কে মালে-ফিদাক[১৪৬] থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।'

সাফ্ফাহ জিজ্ঞাসা করলেন–

'আবু বকরের পরও কি কোনও খলিফা ছিলেন?'

---

১৪৬. 'ফিদাক' হিজাজের একটি গ্রামের নাম। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এটি দুই-তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। সপ্তম হিজরিতে নবীজি ﷺ খায়বার জয় করেন। সেখান থেকে ফেরত এসে তিনি হযরত মুহাইয়্যাছা বিন মাসউদ رضي الله عنه-কে দূত বানিয়ে ফিদাকে প্রেরণ করেন। তখন সেখানকার প্রধান ছিল ইউশা' বিন নুন নামক এক ইয়াহুদি। খায়বর বিজয়ের সংবাদে ফিদাকবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের ভয় তাদের অন্তরে চেপে বসে ছিল। রাসুল ﷺ-এর দূত যখন তাদের বলল, মুসলমান হয়ে যাও; নচেৎ কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের ফসলের অর্ধেক দিতে রাজি হয়ে গেল। বিনা যুদ্ধে এই সম্পদ পাওয়ার কারণে রাসুল ﷺ তা নিজের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। রাসুল ﷺ-এর ওফাতের পর এই সম্পদই আবু বকর رضي الله عنه-র নিকট ফাতেমা رضي الله عنها চেয়েছিলেন। তিনি হযরত ফাতেমা رضي الله عنها-কে তিনি বলেছিলেন, হে রাসুলকন্যা! আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَنِيهَا اللهُ تَعَالَى حَيَاتِي فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

'এই ফিদাকের সম্পদ হল খাবার, যা আল্লাহ আমাকে আমার জীবদ্দশায় খাইয়েছেন। আমি মারা গেলে ফেদাকের এই মাল মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।' [দেখুন, মু'জামুল বুলদান : ৪/২৭২]

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, হ্যাঁ।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه।

খলিফা বললেন–

'তারপর উমরও তাদের ওপর জুলুম বহাল রেখেছেন?'

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, হ্যাঁ।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, উমর رضي الله عنه-র পর কোনও খলিফা ছিলেন?

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, হ্যাঁ।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, উসমান বিন আফ্ফান رضي الله عنه।

খলিফা সাফ্ফাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও তোমাদের ওপর জুলুম বহাল রেখেছেন, আর তোমরা ইনসাফ থেকে বঞ্চিত থেকেছ?

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, হ্যাঁ।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, উসমান বিন আফ্ফান رضي الله عنه-র পরও কি কোনও মুসলমান খলিফা ছিলেন?

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, হ্যাঁ।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলল, আমিরুল মুমেনিন আলী বিন আবু তালেব رضي الله عنه।

খলিফা সাফ্ফাহ বললেন, আর আলী رضي الله عنه ও তোমাদের ওপর জুলুম বহাল রেখেছেন, এবং ফিদাকের মাল মুসলমানদের থেকে এনে তোমাদের দেননি?

এরপর তিনি বললেন–

‘তোমাদের দাদা আলী বিন আবু তালেব আমার থেকে উত্তম ছিলেন, এবং আমার থেকে বেশি ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। খেলাফতের দায়িত্ব তারও হাতে এসেছিল। তিনি কি তার সন্তান হাসান-হুসাইন -কে মালে-ফিদাকের কিছু দিয়েছিলেন? অথচ তারা দুজন তোমার থেকে উত্তম ছিলেন?’

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন হাসান হতভম্ব হয়ে গেল। একেবারে চুপ হয়ে গেল। পিছনের দিকে তাকাতে থাকল। ভাবখানা, এখান থেকে পালিয়ে বাঁচে।

এদিকে খলিফা সাফফাহ বলে যাচ্ছিলেন–

‘সে আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোনও মাবুদ নেই, যদি এটা আমার প্রথম খুতবা না হত, এবং আমার আগে এ বিষয়ে [অন্য খলিফাদের] জিজ্ঞাসাবাদ না হত, তা হলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করে ফেলতাম। বসে পড়!’

পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে তাকে ধমকিয়ে বসিয়ে দিলেন। এরপর নিজের খুতবা বলে গেলেন।[১৪৭]

---

১৪৭. দেখুন, আখবারুল আযকিয়া, ইবনুল জাওযি : ৬৮ ; তারিখুল খুলাফা : ২০০

কোড়া খেতে রাজি কাজির পদ নিতে নয়

ইমাম আবু হানিফা[১৪৮] -কে ইবনে হুবাইরা কাজির পদে বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তার অস্বীকারের কারণে ইবনে হুবাইরা কসম করল, যদি ইমাম সাহেব কাজির পদ গ্রহণ না করেন, তা হলে তাকে অবশ্যই কোড়া মারবে এবং কয়েদখানায় ফেলে রাখবে।

তার বার বার চেস্টা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফা কাজির পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে ইবনে হুবাইরা ইমাম আবু হানিফা -কে এত বেশি কোড়ার আঘাত করে যে, তার চেহারা এবং মাথা ফুলে যায়। ইমাম আবু হানিফা বললেন–

‘পরকালের লোহার হাতুড়ির আঘাত হতে দুনিয়ার কোড়ার আঘাত আমার জন্য অনেক সহজ।’

---

১৪৮. ইমাম আবু হানিফা নু’মান বিন সাবেত ছিলেন অনেক বড় আলেমে দীন ও ফকিহ। ৮০ হিজরি মুতাবিক ৬৯৯ খৃস্টাব্দে ‘হুদুদ’-এ তার জন্ম হয়। কূফায় তিনি রেশমি কাপড় বানাতেন এবং এর ব্যবসা করতেন। ইমাম আবু হানিফা ছিলেন ইমাম হাম্মাদ -র শাগরেদ। ইবনে হুবাইরার পর খলিফা মনসুর তাকে কাজির পদে আসীন করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। তাই খলিফা মনসুর তাকে ১৪৬ হিজরিতে বন্দী করেন। বাগদাদে বন্দী থাকা অবস্থায়ই তিনি ১৫০ হিজরি মুতাবিক ৭৬৭ ঈসাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ , ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং ইমাম যুফার ছিলেন তার প্রসিদ্ধ শাগরেদ। [উর্দু দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া : ১/৭৮৩-৭৮৪]

আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বের প্রমাণ শাহতুতে

কয়েকজন লোক ইমাম শাফে'য়ি[১৪৯] رحمه الله-র নিকট গিয়ে বলল, আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পেশ করুন! একটুখানি ভেবে ইমাম শাফে'য়ি রহ. বললেন, আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য এই শাহতুতের পাতাই যথেষ্ট। তারা সবিস্ময়ে বলল, আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বের প্রমাণে শাহতুতের পাতা? আপনি বলছেন কী!?

ইমাম শাফে'য়ি رحمه الله বললেন, শাহতুতের পাতার স্বাদ তো একটাই। কিন্তু যখন তা রেশমের পোকায় খায়, তখন তার থেকে রেশম বের হয়; যখন মৌমাছি খায়, তখন মধু বের হয়; আর যখন হরিণ খায় তখন তার মিশক থেকে সুঘ্রাণ বের হয়। তা হলে সে কোন সত্তা, যিনি একই জিনিস থেকে বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন স্বাদ বের করেন? নিশ্চয় সে সত্তা আল্লাহ ﷻ, যিনি এই বিশাল জগত সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম শাফে'য়ি رحمه الله-র এই জবাব শুনে তারা বিস্মিত হল। শাহতুতের পাতায় তারা আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে গেছে।

---

১৪৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদরিস বিন উসমান বিন শাফে' বিন সায়েব رحمه الله-র বংশ-পরম্পরা আব্দে মানাফে গিয়ে নবীজির ﷺ বংশের সাথে মিলিত হয়। ১৫০ হিজরি মুতাবিক ৭৬৭ ঈসাব্দে গাজা হাশেমে [ফিলিস্তিনে] তার জন্ম হয়। তার মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে উবাইদুল্লাহ বিন হাসান বিন হুসাইন বিন আলী رضي الله عنه। দশ বছর বয়সে তিনি যথারীতি মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। তেরো বছরের সময় তিনি মদিনায় গিয়ে ইমাম মালেক رحمه الله-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার মৃত্যু পর্যন্ত তার নিকট মুয়াত্তা কিতাব পড়তে থাকেন। এর পর মক্কা ফিরে এসে সুফয়ান বিন উয়াইনা رحمه الله এবং অন্যান্য হাদিস বিশারদদের থেকে ইলম অর্জন করেন। বাইতুল্লাহ শরিফে তিনি হাদিসের দরস প্রদান করেন।

যার পিতা তুমি, সে আসলেই ইয়াতিম

যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহর নিকট খলিফা মনসুর[১৫০] ফরমান পাঠালেন, কাওয়ায়েদ, [সে-সব মহিলা, যাদের হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, কিংবা যাদের বিবাহের প্রতি আগ্রহ নেই।] অন্ধ এবং ইয়াতিমদের মধ্যে মাল বণ্টন করে দাও।

খলিফার নির্দেশ মুতাবিক সম্পূর্ণ ন্যায়ভাবে মাল বণ্টন করা প্রয়োজন। তাই যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ একটি তালিকা তৈরী করলেন, এবং তদানুসারে তাদের মধ্যে মাল বণ্টন করতে লাগলেন। এ সময় আবু যিয়াদ তমিমি এল। একেবারেই বোকা ধরনের লোক ছিল সে।

যিয়াদকে বলল, আমাকেও কাওয়ায়েদদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিন এবং মাল দিন।

---

১৫০. আবু জাফর মনসুরকে আব্বাসি খেলাফতের মূল-প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়। তার ভাই সাফ্ফাহর পর ১৩৬ হিজরি মুতাবিক ৭৫৪ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। মনসুরের চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলী শামে বিদ্রোহ করলে আবু মুসলিম খোরাসানি তাকে দমন করেন। ৭৫৪ সালেই আবু মুসলিমের বিদ্রোহীসূলভ আচরণের কারণে মনসুরের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। রোমীদের ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিহত করে খলিফা মনসুর কেপাডোশিয়া [আনাতোলিয়া] পুনরায় কব্জা করেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নফসে যাকিয়্যা এবং তার ছোট ভাই সাইয়্যেদ ইবরাহিম কূফায় বিদ্রোহ করলে তাদের দুজনকেই হত্যা করা হয়। খলিফা মনসুর ৭৬২ খৃস্টাব্দে রাজধানী বাগদাদের ভিত্তি রাখেন, এবং ১৫৮ হিজরি মুতাবিক ৭৭৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। [ইনসাইক্লোপেডিয়া তারিখে আলম : ১/২৫]

যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ বললেন, আল্লাহ ﷻ তোমার মঙ্গল করুক! কাওয়ায়েদ তো সে-সব নারীদের বলা হয়, যাদের হায়েয আসে না, বা বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা হয় না। আর তুমি তো পুরুষ। তা হলে কাওয়ায়েদদের তালিকায় তোমার নাম যাবে কীভাবে?

আবু যিয়াদ তমিমি বলল, তা হলে আমাকে অন্ধদের অর্ন্তভুক্ত করে নিন।

যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ বললেন–

একে অন্ধদের অর্ন্তভুক্ত করে নাও। কারণ, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

'কারণ, মানুষের চোখ অন্ধ হয় না। বরং বুকের মধ্যে যে অন্তর আছে, সেটা অন্ধ হয়।' [সূরা হজ : ৪৬]

আবু যিয়াদ আবার বলল–

জনাব! আমার সন্তানদেরকে ইয়াতিমদের তালিকাভুক্ত করে নিন।

যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ বললেন,

হ্যাঁ; তুমি যার পিতা, সে আসলেই ইয়াতিম।

বসরার শাসককে অপসারণ

আমিরুল মুমেনিন উসমান ﵁-র খেলাফতের চতুর্থ বছর। এ বছরের শুরুতেই কয়েকটি গোত্র তার আনুগত্য হতে সরে যায়। তাদের শায়েস্তা করার জন্য বসরার শাসক আবু মুসা আশআরি[১৫১] ﵁-কে দায়িত্ব দেওয়া হল। খলিফার নির্দেশে পুরো দেশে জিহাদের ফযিলত প্রচার করা হল।

ইসলামি বাহিনী প্রস্তুত হলে আবু মুসা আশআরি ﵁ চল্লিশটি খচ্চরের ওপর সফরের পাথেয় রাখলেন। নিজেও একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলেন। পদাতিক বাহিনী যখন তাকে ঘোড়ার ওপর দেখতে পেল, তারা তার ঘোড়ার লাগাম ধরল। বলল, আমাদেরকেও সওয়ারি দিন; নচেৎ আপনিও পায়ে হেঁটে আমাদের সাথে চলুন–যেমনটা পায়ে হেঁটে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু মুসা আশআরি ﵁ তাদের শাসালেন এবং কয়েকজনকে কোড়ারও মারলেন। উসমান ﵁-র নিকট ফরিয়াদ করা হল। তিনি পুরোপুরি অনুসন্ধান নিলেন। আবু মুসা ﵁-কে দোষী পেয়ে তার পদ থেকে তাকে অপসারণ করে দিলেন।

১৫১. আবু মুসা আব্দুল্লাহ বিন কায়স আশআরি ﵁ মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরত করেন। এরপর খায়বরে এসে নবীজির ﷺ সাথে মিলিত হন। উমর ﵁ তাকে মুগিরা বিন শো'বার পর বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। উসমান ﵁ তাকে অপসারণ করেন। কিন্তু কূফাবাসীদের ইচ্ছার দিকে লক্ষ করে তাকে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। জঙ্গে জামালের সময় কূফাবাসীদের তিনি যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিলে আলী ﵁ তাকে অপসারণ করেন। এরপর সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় তিনি হযরত আলী রাযি.র পক্ষ থেকে সালিস নিযুক্ত হন। এর পর তিনি মক্কা চলে আসেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৪২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়েছে বলেও একটি উক্তি রয়েছে। [উসদুল গাবা ৬/২৯৯-৩০০]

প্রজার মঙ্গলের জন্য নিজের সন্তান
কোরবান করেন

প্রজার মঙ্গলের জন্য পুত্র কুরবানি

আব্দুল্লাহর পর তার পৌত্র তৃতীয় আব্দুর রহমান[১৫২] ৯১২ খৃস্টাব্দে স্পেনের শাসক হন। তার দুই পুত্র ছিল—আলহাকাম ও আব্দুল্লাহ। দুজনই যোগ্য ছিল। তবে আলহাকামকে যুবরাজ ঘোষণা করলেন।

আব্দুল্লাহর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ইবনে আব্দুদ্দার। খলিফা তাকে প্রধান কাজির পদ দেননি—এ ক্ষোভ ছিল তার মনে। সে আব্দুল্লাহকে উস্কে দিয়ে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করল। একটি অশুভ সময় খলিফা

---

[১৫২]. খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান আন্নাসের লি-দীনিল্লাহ বিন মুহাম্মদ [৩০০ হিজরি–৩৫০ হিজরি] ছিলেন উন্দুলুসের প্রথম শাসক, যাকে খলিফা বলা হয়েছে। বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়-পরায়ণতা, বীরত্ব এবং চরিত্র মাধুরীতে তিনি ছিলেন অনন্য। ক্ষমতায় এসেই তিনি অবৈধ কর বন্ধ করে দেন, এবং ঈসায়িদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। তা ছাড়া ফাতেমিদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য মারাকেশকে [মরোক্কো] তার সাম্রাজ্যে যোগ করে নেন। ৩৪৭ হিজরিতে নওয়ারের ঈসায়ি রানি তোতা তার পুত্র শাহে নওয়ার এবং পৌত্রকে নিয়ে আব্দুর রহমানের দরবারে এ আশা নিয়ে উপস্থিত হন যে, তার পৌত্রের ছিনিয়ে নেওয়া রিয়াসত তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে খলিফার সাহায্য পাওয়া যায়। শাসক আব্দুর রহমানের প্রভাব ও প্রতাপ দেখে তারা তিনজনই হতভম্ব হয়ে যান। খলিফা আব্দুর রহমানের শাসনকাল ছিল উন্দুলুসে ইসলামি শাসনের একটি সোনালি অধ্যায়। শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আরাম-আয়েশে তা ছিল অনন্য। ইউরোপের সকল দেশের আয়ও খলিফা আব্দুর রহমানের আয়ের সমান ছিল না। রাজধানী কর্ডোভার বাসিন্দা ছিল দশ লাখ। ওয়াদিল কবিরের পাড়ে চব্বিশ মাইল বিস্তৃত ছিল এই শহরটি। [তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/১৫০-১৭০]

এবং আলহাকাম—দুজনকেই হত্যা করার পরিকল্পনা করল। খলিফা আব্দুর রহমান তা জানতে পারলেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত সরদারকে পাঠালেন। সাথে পর্যাপ্ত সৈন্য দিলেন। রাজপুত্রকে তার বন্ধু ইবনে আব্দুদ্দার-সহ গ্রেফতার করা হল। খলিফার সামনে পেশ করা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

তুমি কি এ কারণেই দুঃখী যে, তুমি খলিফা নও?

রাজপুত্রের কোনও জবাব ছিল না। তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। বাদশাহর নির্দেশে দুজনকে আলাদা আলাদা কামরায় বন্দী করে রাখা হল। ইবনে আব্দুদ্দার রাতেই আত্মহত্যা করে।

শাহযাদা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুররহমান সম্বন্ধে তার পিতার ফয়সালা হল, তাকে হত্যা করা হবে।

ভাইকে অনেক ভালবাসত যুবরাজ আলহাকাম। তাকে হত্যা করার ফয়সালা শুনে সে পিতার নিকট এসে দয়ার সুপারিশ করল। বাদশাহ সুপারিশ নামঞ্জুর করলেন। তার ঐতিহাসিক ফয়সালা এ রকম ছিল—

তোমার সুপারিশ ও আবেদন যথাস্থানে ঠিক আছে। আমিও এটাই চাই। ঠাণ্ডা হৃদয় নিয়ে তার মৃত্যুর দৃশ্য সহ্য করতে পারব না। কিন্তু আমি খলিফা। ভবিষ্যতের খেয়াল রাখতে হবে আমাকে। তার মনে যে আক্রোশ আছে, তা কখনও শেষ হবে না। আমার পরে তোমরা দুজন লড়তে থাকবে। তোমাদের পরিণতি যা হওয়ার হবে। কিন্তু এতে প্রজা ধ্বংস হয়ে যাবে। কত মা তাদের সন্তানের জন্য কাঁদবে; কত নারী বিধবা হবে; কত সন্তান ইয়াতিম হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। স্থায়ী অনিরাপত্তা সৃষ্টি হবে। এসব বিষয়ের কথা মনে এলে আমি কেঁপে উঠি। তাই হাজারো মানুষকে মারার, হাজারো নারীকে বিধবা বানানোর এবং হাজারো শিশুকে ইয়াতিম বানানোর পরিবর্তে একজনকেই, যে কিনা ফ্যাসাদের মূল, তাকে শেষ করে দেওয়া যাক।

আমি আমার এই যুবক সন্তানের জন্য অনেক কাঁদব; যতদিন বেঁচে থাকব, কাঁদতে থাকব। কিন্তু আলহাকাম! তোমার অশ্রু বা আমার অশ্রু,

কিংবা আমার পুরো পরিবারের সুপারিশ আমার দুর্ভাগা সন্তানকে তার স্পষ্ট অপরাধের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

ওই রাতেই আব্দুল্লাহকে হত্যা করা হয়। পরের দিন পারিবারিক কবরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। এটা ৯৪৯ খৃস্টাব্দের ঘটনা।

খলিফা আব্দুর রহমান পুত্রের শোক ভুলতে পারেননি। দিন দিন তা বেড়েই চলছিল। মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি নিভৃত্যে থাকা শুরু করেন। অবশেষে এই ন্যায়-পরায়ণ শাসক পঞ্চাশ বছর শাসন করে ৯৬১ খৃস্টাব্দে তিহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[১৫৩]

---

১৫৩. দেখুন, 'না-কাবেলে ফরামুশ ওয়াকেআত' : ২৩৪ [ঈষৎ পরিবর্তিত]

কাজি মুনযিরের অনন্য ফয়সালা

খলিফা আব্দুর রহমান নাসের কর্ডোভায় একটি বাড়ি কেনার ইচ্ছা করলেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই কিনবেন। যে বাড়িটি কিনতে চেয়েছিলেন, সেটা ছিল কয়েকজন ইয়াতিমের। কাজি মুনযির বিন সাঈদ বালুতির তত্ত্বাবধানে ছিল বাড়িটি। এই বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তাব এলে কাজি সাহেব তা প্রত্যাখ্যান করলেন। খলিফার নিকট সংবাদ পাঠালেন, ইয়াতিমদের সম্পত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানান্তর হতে পারে না, যতক্ষণ না এই তিনটি শর্তের একটি পাওয়া যায়–

১. বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে;
২. সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে; এবং
৩. এমন মূল্য যাওয়া গেলে, যাতে ইয়াতিমদের ভবিষ্যতের লাভ দেখা যায়।

এ মুহূর্তে এই তিনটি একটিও পাওয়া যাচ্ছে না। আর সরকারি কর্মচারীরা যে দাম বলেছে, তা খুবই কম। এ পয়গাম শুনে খলিফা চুপ হয়ে গেলেন। বুঝলেন, দাম না বাড়ালে কাজি মানবেন না। এদিকে কাজি মুনযিরের ভয় হল–খলিফা না আবার তা জোর করে নিয়ে যান। তাই তৎক্ষণাৎ বাড়িটি গুঁড়িয়ে দিলেন। এরপর বাদশাহর কর্মচারীরা দ্বিগুণ দাম দিয়ে ওই জায়গাটা কিনে নিল। খলিফা যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন কাজিকে ডেকে বাড়ি গুঁড়িয়ে ফেলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কাজি মুনযির বললেন, যখন আমি বাড়িটি ভাঙ্গার নির্দেশ দিই, তখন কুরআনের এই আয়াতটি আমার সামনে ছিল–

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا.

'নৌকা তো মিসকিনদের, যারা নদীতে কাজ করত। আমি এটাকে ভাঙ্গার ইচ্ছা করেছি। কারণ, তাদের সামনে এক বাদশাহ ছিল, যে প্রতিটি ভাল নৌকা জোরপূর্বক নিয়ে যেত।'

এটা শুনে খলিফা চুপ হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তিনি কাজিকে আরও বেশি সম্মান করতে শুরু করেন। এই ঘটনা থেকে কাজি এবং খলিফা, দুজনের মনের পবিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজি মুনযির ৩৫৫ হিজরিতে, খলিফা নাসেরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, মারা যান।[১৫৪]

[১৫৪] তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ খাঁ নজিবাবাদি : ১/১৫০-১৭০

চার ধরনের লোক

আব্বাসি খলিফা মনসুর একদিন দরবারে উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন, আমার দরবারে যদি চার ধরনের লোক থাকে, তা হলে তাদের ছাড়া অন্য কারও আমার দরকার হবে না।

উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমিরুল মুমেনিন! সেই চার ধরনের লোক কারা?

খলিফা মনসুর বলতে শুরু করলেন, আসলে এই চার ধরনের লোকই হল রাজ্যের খুঁটি। তাদের উপেক্ষা করে কোনও রাজ্যই মজবুত হতে পারে না। তাদের গুরুত্ব ঠিক চৌকির চারটি পায়ার মত–একটিও যদি নিজ জায়গা থেকে পড়ে যায়, তা হলে চৌকি স্থির থাকে না। সেই চার ব্যক্তির একজন হলেন কাজি, যিনি সঠিক ফয়সালা করেন। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে তিনি কারও ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি সব সময় হক অনুসারে তার ফয়সালা করেন।

দ্বিতীয়জন হল পুলিশ অফিসার। সে শক্তিশালীদের থেকে দুর্বলদের ইনসাফ দেইয়ে দেয়। পুরো বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করে। তৃতীয়জন হল কর আদায়কারী। প্রজার ওপর জুলুম না করেই যে তার দায়িত্ব পালন করে। এ কথা বলে খলিফা মনসুর তর্জনি বের করে দাঁত দিয়ে তিনবার কাটলেন। প্রত্যেকবার আহ্ আহ্ করে উঠলেন। দরবারিরা জিজ্ঞাসা করল, চতুর্থজন কে?

খলিফা জবাব দিলেন, চতুর্থজন হল গোয়েন্দা বিভাগের সেই কর্মকর্তা, যে উল্লিখিত তিন ব্যক্তির রিপোর্টের সত্যায়নের জন্য শেষ মোহর হিসেবে কাজ করে।[১৫৫]

[১৫৫] তারিখে তবারি : ৫৭

তোমার মত কাউকে আরব জন্ম দেয়নি

আসমা'য়ির[১৫৬] বর্ণনা। তিনি বলেন, একদিন আমি একব্যক্তির বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। সেখানে গেলে কিছু পাওয়ার আশা আছে। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, দরজায় এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। ভেতরে যেতে বাধা দিল সে। বলল–

আসমা'য়ি! আল্লাহ ﷻ-র কসম, আমি দরজায় এজন্যই দাঁড়িয়েছি, যেন আপনার মত লোকদের তার নিকট যেতে বাধা দিতে পারি। কারণ, তার আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আসমা'য়ি বর্ণনা করেন–

ওই ব্যক্তি আমাকে বাধা দিলে একটি কাগজের টুকরোয় একটি কবিতা লিখে তার হাতে দিয়ে বললাম, ঘরে যে আছে, তার নিকট এটা পৌঁছিয়ে দাও। কবিতাটি ছিল–

إِذَا كَانَ الْكَرِيْمُ لَهُ حِجَابٌ * فَمَا فَضْلُ الْكَرِيْمِ عَلَى اللَّئِيْمِ

'উদার লোকদের দরজায় যখন বাধা সৃষ্টি করা হয়, তখন উদার আর ইতর লোকদের মধ্যে কী তফাৎ?'

---

১৫৬. তার নাম আবু সাঈদ আব্দুল মালেক বিন কুরাইব বিন আব্দুল মালেক বিন আলী বিন আসমা' বসরি। আরবি ভাষায় তার পান্ডিত্যের কারণে তাকে ভাষার ইমাম বলা হয়। ১২০ হিজরির দিকে তার জন্ম হয় এবং ২১৫ হিজরিতে মৃত্যু হয়। তার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তার উক্তি মতে তার ১৬ হাজার কবিতা মুখস্থ ছিল। [সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ১০/১৭৫-১৮১]

দরজায় দাঁড়ানো লোকটা কাগজের টুকরোটা নিয়ে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পর ওই কাগজটা নিয়েই ফিরে এল। কাগজের অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল–

'যখন উদার লোকদের হাতে অর্থ থাকে না, তখন বাধা সৃষ্টি করে ঋণদাতাদের থেকে চুপ থাকাকে তারা নিরাপদ মনে করে।'

ঘরের মালিক কাগজের টুকরোর সাথে একটি থলেও পাঠালেন। তাতে পাঁচ শ' দিনার ছিল। দিনারগুলো দেখেই আমি বললাম–

আল্লাহর কসম! বিষয়টি আমি আমিরুল মুমেনিনকে অবহিত করব।

আমি আমিরুল মুমেনিনের নিকট গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, ভাল আছ তো আসমা'য়ি! কোত্থেকে আসা হল?

আমি বললাম–

আমি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, আমিরুল মুমেনিনের পর যিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল ও অভিজাত।

আমিরুল মুমেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, সেই অভিজাত ব্যক্তিটি কে?

আমিরুল মুমেনিনের নিকট কাগজের টুকরো এবং থলেটি দিয়ে পুরো ঘটনা জানালাম। থলেটি দেখেই তার মুখ মলিন হয়ে গেল। বললেন, মোহরের এ থলে তো আমার বাইতুল মালের। যে ব্যক্তি এ থলেটি তোমাকে দিয়েছে, তাকে আমার সামনে উপস্থিত করো।

আমি আরজ করলাম, আমিরুল মুমেনিন! এতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আমিরুল মুমেনিন তার এক খাস ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি আসমা'য়ির সাথে অমুক ব্যক্তির নিকট যাবে। তাকে বলবে, আমিরুল মুমেনিন তোমাকে স্মরণ করেছেন। আর হ্যাঁ, এ কথাও বলবে, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

সে-ব্যক্তিকে আমিরুল মুমেনিনের নিকট আনা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

তুমি কি গত কাল আমার নিকট এসে এ কথা বলোনি যে, তোমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ? তুমি খুব অভাব-অনটনে আছ? তাই আমি তোমাকে এই থলে ভরে অর্থ দিয়েছিলাম, যেন তোমার করুণ অবস্থা না থাকে। তা হলে এটা কী ব্যাপার যে, মাত্র একটি কবিতার কারণে আসমা'য়িকে অর্থে ভরা পুরো থলে দিয়ে দিলে?

জবাবে ওই ব্যক্তি বলল–

আমিরুল মুমেনিন! আল্লাহর কসম! আমার করুণ অবস্থার যে কথা আপনাকে বলেছি, তাতে মিথ্যার গন্ধও নেই। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র থেকে আমার লজ্জা লাগল [তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম], যে ব্যক্তি আমার নিকট আশা নিয়ে এসেছে, তাকে আমি সেভাবেই ফিরিয়ে দেব, যেভাবে আমিরুল মুমেনিন আমাকে আমার আশা পূরণ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এ কথা শুনে আমিরুল মুমেনিন বললেন–

আল্লাহর কসম! তোমার মত আরেকজনকে আরব জন্ম দেয়নি।'

এরপর আমিরুল মুমেনিন তাকে এক হাজার দিনার দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আসমা'য়ি বর্ণনা করেন, আমিরুল মুমেনিনের উদারতা দেখে আমি বললাম,

আমিরুল মুমেনিন! আমার দিকেও একটু মনোযোগ দিন!

এ কথা শুনে আমিরুল মুমেনিনের হাসি এল। আমাকেও এক হাজার দিনার দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এরপর আমিরুল মুমেনিন তাকে তার খাসদের মধ্যে শামিল করে নিলেন।

সমাপ্ত